স্বদেশী আন্দোলন
ও
বাংলা সাহিত্য

সৌম্যেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

বসুধারা প্রকাশনী
৪২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট
কলিকাতা ৬

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন, এম্-এ., পি-এইচ্-ডি., এফ-এ-এস্

পূজ্যবরেষু

নিবেদন

স্বদেশী যুগের সূচনায় কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছিলেন—'বঙ্গ-ইতিহাসে আজ এল স্বর্ণ-যুগ'। এ যে কবির অত্যুক্তি বা অহৈতুক ভাবোচ্ছ্বাস নয় ইতিহাসের নিরপেক্ষ বিচারে সে সত্য স্বীকৃতি পেয়েছে। শুধু বাংলার ইতিহাসে নয়, ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে স্বদেশী যুগ একটি উজ্জ্বল অধ্যায়। এই সময়ে আত্মশক্তির ভিত্তিতে জাতীয় উন্নতিসাধন ও স্বাধীনতা লাভের ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষায় বাঙালী যে কর্মশক্তির পরিচয় দেয় তার প্রভাব বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও কম পড়ে নি, আবার সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের প্রভাবও এই যুগের প্রকৃতিগঠনের কাজে পূর্ণমাত্রায় সক্রিয় ছিল। ইতিহাসের সঙ্গে যোগসূত্র বজায় রেখে এই যুগের বাংলা সাহিত্যের সঠিক ও সামগ্রিক পরিচয় নির্ণয় করাই এই গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য।

বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষ্যে ১৩১২ সাল থেকে প্রকাশ্য ও প্রত্যক্ষভাবে স্বদেশী আন্দোলন সুরু হয়। কিন্তু কয়েক বছর আগে থেকেই এই আন্দোলনের জন্যে একটা প্রস্তুতি চলেছিল। তারপর ১৩১৮ সালে উভয় বঙ্গ পুনর্মিলিত হলে আন্দোলনের গতি অনেক কমে যায়। এই কারণে অনেকে ১৩১২ সাল থেকে ১৩১৮ সাল পর্যন্ত স্বদেশী যুগের সময়-সীমা নির্দিষ্ট করেছেন। কিন্তু আমার মনে হয় এই যুগ-বিভাগ যথার্থ নয়। কারণ বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়া সত্ত্বেও স্বদেশী আন্দোলন একেবারে বন্ধ হয় নি; ১৩২১ সালে প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধ সুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ক্ষীণ-গতি হলেও আন্দোলনের ধারাটি অনুসরণ করা যায়, যদিও শেষের দিকে এই আন্দোলনের সঙ্গে সাহিত্যের যোগসূত্রটি খুবই শিথিল হয়ে পড়ে। সুতরাং প্রকৃত স্বদেশী আন্দোলনের পর্বটি ১৩১২ সাল থেকে ১৩২১ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু এই সময়ের বাংলা সাহিত্যের যথার্থ পরিচয় নির্ণয় করতে হলে আন্দোলনের প্রস্তুতি-পর্বটিকেও নেপথ্যে রাখা চলে না। সাহিত্যে এই প্রস্তুতির স্পষ্ট পরিচয় ফুটে ওঠে ১৩০৮ সাল থেকে। তাই এই গ্রন্থে ১৩০৮ থেকে ১৩২১ সাল পর্যন্ত আলোচনার সময়-সীমা নির্দিষ্ট করে নেওয়া হয়েছে।

অবশ্য 'সঠিক' ও 'সামগ্রিক' শব্দ দুটিকে এখানে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করার কোন উপায় নেই। কারণ সে সময়ের অনেকগুলি পত্র-পত্রিকা এবং মুদ্রিত

গ্রন্থ এখন অপ্রাপ্য। অথচ এ ব্যাপারে পত্র-পত্রিকাগুলির ওপরেই বেশি নির্ভর করা দরকার; কারণ সরকারী বিধানের চাপে অনেক রচনা পরে আর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি। আন্দোলন-পর্বের দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলি এখন আর পাওয়া যায় না। কোন পত্রিকার দুএকটি খণ্ডাংশ হয়তো কোথাও পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু আলোচনাধারার মধ্যে সেগুলিকে নির্ভরযোগ্য উপাদান হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। এই অবস্থায় ছটি প্রথম পর্যায়ের মাসিকপত্র বেছে নিয়েছি; সেগুলি হল—বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়), ভারতী, প্রবাসী, ভাণ্ডার, নব্যভারত ও সাহিত্য। স্বদেশী আন্দোলনের ব্যাপারে এই মাসিকপত্রগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিক দায়িত্ব পালন করেছিল। সে সময়ের রাজনৈতিক অবস্থা এবং তার পরিবর্তনের সঙ্গে সংযোগ রেখে এগুলি থেকে অনেক দেশাত্মবোধক রচনা উদ্ধার করেছি। রচনাগুলির মধ্যে যে কটি পরবর্তীকালে লেখকদের যে সকল গ্রন্থে সংকলিত হয়েছিল প্রসঙ্গত তারও উল্লেখ করেছি। অনেকগুলি রচনা পরে আর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি; আর কিছু কিছু প্রকাশিত হলেও সে বইগুলি এখন দুষ্প্রাপ্য বা সম্পূর্ণ অপ্রাপ্য। সুতরাং এই জাতীয় রচনা থেকে বিস্তৃত অংশ উদ্ধৃতি হিসাবে গ্রহণ করতে হয়েছে। রচনাগুলিকে সাজানোর ব্যাপারে পত্রিকাগুলিকেই ভিত্তি করেছি; ফলে প্রতিটি পত্রিকার ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক পটভূমি প্রায় একই আছে এবং কয়েকজন লেখকের প্রসঙ্গও একাধিকবার এসে পড়েছে। কিন্তু একই লেখকের একই ধরনের লেখার পুনরুল্লেখ যাতে না ঘটে সে দিকে লক্ষ্য রেখেছি। প্রতিটি পত্রিকারই আবির্ভাব সম্বন্ধে প্রথমে সামান্য আলোচনা করা হয়েছে।

পত্রিকাগুলির প্রসঙ্গ শেষ করে এই সময়ে প্রকাশিত গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। এগুলিকে সাজানো হয়েছে সাহিত্য-ধারা অনুযায়ী, অর্থাৎ —কবিতা ও গান, নাটক, প্রবন্ধ এবং গল্প ও উপন্যাস। বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রেও সমস্ত গ্রন্থের উল্লেখ করা যায় নি। যেগুলির সন্ধান পেয়েছি এবং যেগুলি দেখার সৌভাগ্য হয়েছে আলোচনার মধ্যে সেগুলিকেই স্থান দিয়েছি। এই জাতীয় দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থগুলির মধ্যে স্বদেশী গানের কয়েকটি সংকলনগ্রন্থও আছে। এই গ্রন্থগুলি থেকে বত্রিশটি বিস্মৃতপ্রায় গান পরিশিষ্টে সংকলিত হয়েছে।

আর একটি কথা এখানে বলে রাখা দরকার। আলোচনাধারায় ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিই প্রাধান্য পেয়েছে। সমগ্র গ্রন্থটিকে তিনটি প্রধান অধ্যায়ে বিভক্ত

করা হয়েছে—পূর্ব-প্রসঙ্গ, প্রসঙ্গ এবং উত্তর-প্রসঙ্গ। জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ও বিকাশের সঙ্গে স্বদেশী আন্দোলনের সংযোগ, এই আন্দোলনের প্রকৃতি ও সমসাময়িক সাহিত্য-চিন্তার বৈশিষ্ট্য এই তিনটি বিষয়ে পূর্ব-প্রসঙ্গে তিনটি পৃথক প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে; কারণ এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা না নিয়ে এই সময়ের সাহিত্যধারার যথার্থ অনুস্মৃতি সম্ভব নয়। তারপর সুরু হয়েছে গ্রন্থের প্রধান অধ্যায়টি, অর্থাৎ ১৩০৮ সাল থেকে ১৩২১ সাল পর্যন্ত (আমাদের নির্দিষ্ট সময়-সীমার মধ্যে) বাংলা স্বাদেশিকতামূলক সাহিত্যের পরিচয়-প্রসঙ্গ। সর্বশেষে, উত্তর-প্রসঙ্গের 'শেষ কথা'-য়, স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে অসহযোগ আন্দোলনের আত্মিক সংযোগ-সূত্রটি নির্ণয় করার চেষ্টা করা হয়েছে; এবং এ চেষ্টাও ঐতিহাসিক প্রয়োজনে।

এই গ্রন্থরচনার কাজে পিতৃ-প্রতিম শ্রদ্ধাস্পদ ডাক্তার সুকুমার সেন মহাশয়ের অকৃত্রিম স্নেহ, প্রেরণা এবং উপদেশ-নির্দেশ যদি না পেতাম তা হলে এ কাজ শেষ করা আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হত না; বিভিন্ন ব্যক্তিগত অসুবিধা এবং প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়ে কাজের ব্যাপারে যখন সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে যাই তখন তিনিই আমাকে সেই নিরাশার নীরন্ধ্র গহ্বর থেকে টেনে তুলে পথ দেখিয়েছেন, সাহস দিয়েছেন এগিয়ে চলার। তাঁর কাছে আমার ঋণ অপরিশোধ্য। শ্রদ্ধাস্পদ ডাক্তার নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ মহাশয়ের কাছ থেকেও যথেষ্ট উৎসাহ ও সাহায্য পেয়েছি। তাঁকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। কয়েকজন লেখক ও তাঁদের রচনা সম্বন্ধে সুপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে কয়েকটি মূল্যবান তথ্য জানিয়েছেন; এ ব্যাপারে শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেন মহাশয়ের সাহায্যের কথাও মনে পড়ে। প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় পরম স্নেহে ও সহজ বিশ্বাসে তাঁর ব্যক্তিগত পুরানো ফাইলটি আমাকে দেখতে দেন এবং স্বদেশী যুগে প্রকাশিত তাঁর কবিতাগুলি সম্বন্ধেও কয়েকটি তথ্য আমাকে জানান। এই গ্রন্থরচনার কাজে কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার থেকেই আমি সর্বাধিক উপকরণ সংগ্রহ করেছি। এ ব্যাপারে শ্রীযুক্ত বি. এস্. কেশভান্ এবং শ্রীযুক্ত কান্তিভূষণ রায়চৌধুরীর কাছ থেকে আন্তরিক সাহায্য পেয়েছি। কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের ফটো নেওয়ার অনুমতি দিয়ে শ্রীযুক্ত কেশভান্ আমার যথেষ্ট

উপকার করেছেন। এঁরা সকলেই আমার শ্রদ্ধাভাজন এবং এঁদের সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পরিমলকুমার দত্ত, শ্রীযুক্ত পীযূষকান্তি চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য এবং কল্যাণীয় শ্রীমান্ পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকেও আমি নানাভাবে সাহায্য লাভ করেছি। আর একজনের উৎসাহদানের কথা আমার আজীবন মনে থাকবে যাঁর কাছে ঋণ-স্বীকারের কোন প্রশ্নই ওঠে না, তিনি আমার পূজনীয় পিতৃদেব শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

দুঃখের বিষয়, শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ প্রুফ সংশোধনের ক্লান্তিকর কাজের ভার যথাযথভাবে বহন করতে পারি নি; ফলে কিছু কিছু দোষত্রুটি থেকে গেছে। ২২ পৃষ্ঠার পাদটীকায় 'ব্রাহ্ম' শব্দটি 'ব্রহ্ম' হয়ে গেছে, ২৯ পৃষ্ঠায় 'happens' শব্দটির স্থলে 'happen' হয়েছে এবং ২১৭ পৃষ্ঠায় 'মস্তফী'-র বদলে হয়েছে 'মুস্তাফী'। এ ছাড়া আরো দুএকটি অশুদ্ধি আছে। কিন্তু আশা করি সহৃদয় পাঠকের কাছে সেগুলি অমার্জনীয় বলে মনে হবে না।

৪৩/৩ বি, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড
কলকাতা-১৪
২০শে আষাঢ় ১৩৬৭

সৌম্যেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

বিষয়সূচী

পূর্ব-প্রসঙ্গ

প্রসঙ্গ : ১৩০৮—১৩২১

মাসিকপত্রে সমসাময়িক রচনাবলী

প্রকাশিত গ্রন্থ

উত্তর-প্রসঙ্গ

চিত্রসূচী

স্বদেশী আন্দোলন
ও
বাংলা সাহিত্য

পূর্ব-প্রসঙ্গ

জাতীয়তাবোধের উন্মেষ হতে স্বদেশী আন্দোলন

La Rinascita বা পুনর্জন্ম : য়ুরোপীয় নব-জাগরণের ক্ষেত্রে ইতালী একটা বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ইতালীয়দের ভাষায় এ জাগরণ হল la Rinascita বা পুনর্জন্ম; দীর্ঘকালের পুঞ্জীভূত অজ্ঞানের কালো মাটি ঠেলে নব-চেতনার উন্মেষ—সাহিত্যে, শিল্পে, সংগীতে—শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রতিটি বিভাগে। ফরাসীদের ভাষায় এই জাগরণই হল renaissance.

বহুকালের আপজাত্য (degeneration) দূর করে কোন জাতি যখন জেগে ওঠে তখন সে জাগরণই তার উজ্জীবন। উনিশ শতকের বাংলাও এই পুনর্জন্ম লাভ করেছিল। আর সে লাভ শুধু তার একার নয়, সমগ্র ভারতের। য়ুরোপীয় নব-জাগরণের ক্ষেত্রে ইতালী যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিল ভারতের ক্ষেত্রে বাংলার ভূমিকাও অনেকটা সেই রকম।

নব-জাগরণ ব্যাপারটা কোন জাতির জীবনেই আকস্মিক নয়। বিভিন্ন কারণের ভিত্তিতে গড়ে-ওঠা এ এক প্রাণ-ক্রিয়া, একটা 'united movement'। উনিশ শতকের বাংলার পরিচয় তার এই প্রাণ-ক্রিয়ার মধ্যে। স্বদেশী-যুগের বাংলার জাতীয়তাবোধের স্বরূপকে জানতে হলে তার এই পূর্ব-পরিচিতির প্রয়োজন আছে।

জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ও রামমোহন : ইংরেজ তার নিজের স্বার্থেই এ দেশে ইংরেজী শিক্ষা আমদানী করে। সে মনে করেছিল এই শিক্ষার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা হবে, আর শাসন-ক্রিয়া সরল হবে। তার উদ্দেশ্যও সার্থক হয়েছিল। এই শিক্ষার মধ্যে দিয়েই এমন একদল শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় গড়ে উঠল ইংরেজ রাজত্বের স্থায়িত্বে যাদের পোষকতা ছিল অপরিহার্য। চাকরী আর প্রতিপত্তির লোভে এই দলটি ইংরেজী-আনার অন্ধ অনুকরণ করতে সুরু করে। কিন্তু আর একদল বুদ্ধিজীবী বাঙালী ইংরেজী শিক্ষার আন্তর সত্যটির সন্ধান পেয়েছিলেন। এঁরা একটা জাতীয় গঠন-মূলক উদ্দেশ্যের প্রেরণাতেই ইংরেজী শিক্ষার প্রচলনে সহায়তা করেন। এঁরা বুঝেছিলেন, এ জাতির

বুদ্ধির জড়তাকে দূর করতে হলে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-দর্শন আর যুক্তি-চিন্তার আলোক-সম্পাতের প্রয়োজন আছে। এই আত্ম-সচেতন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। ব্যর্থ রক্ষণশীলতা আর অশিক্ষাজনিত কুসংস্কারের নাগপাশ থেকে তিনি স্বজাতির ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্র-চিন্তাকে মুক্তি দিতে চাইলেন। যে অসাধারণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ তাঁর চরিত্রকে বিশিষ্ট করে তুলেছিল সেটা সেই যুগের কাছ থেকেই তিনি লাভ করেছিলেন। আঠার শতকের শেষের দিক থেকে উনিশ শতকের প্রথম দিক পর্যন্ত আমেরিকা-য়ুরোপের ইতিহাস ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সুস্পষ্ট পরিচয়ে চিহ্নিত হয়ে আছে। আমেরিকায় স্বাধীনতা-সংগ্রাম, ফ্রান্সে গণ-বিপ্লব, ইংলণ্ডে শ্রমিক অভ্যুত্থান এ সবের অন্তরে যে একটা সাধারণ শক্তির ক্রিয়া চলেছিল রামমোহন তা সাগ্রহে লক্ষ্য করেছিলেন, উপলব্ধি করেছিলেন। ফরাসী বিপ্লবের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার কথা সর্বজনবিদিত। মোট কথা, তখন জগতে যেখানেই যে প্রগতিশীল ক্রিয়াকলাপ দেখা দিয়েছে রামমোহনের চিন্তা-তন্ত্রীতে তার সংবেদ জেগেছে।

এমনি একটা বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব আর মনোধর্মের অধিকারী ছিলেন বলেই স্বজাতির ও স্বসমাজের দৃঢ়-মূল অনাচার ও কুসংস্কারগুলির দিকে প্রথম থেকেই তাঁর দৃষ্টি পড়ে। এই পাপ দূর করার সংকল্প নিয়ে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'আত্মীয় সভা' (১৮১৫) এবং পরে 'ব্রহ্ম সভা' (১৮২৮)। 'ব্রহ্ম সভা' রীতিমতো সক্রিয় হয়ে ওঠে ১৮৩০ থেকে। এ দেশে শিক্ষা-পদ্ধতি সম্বন্ধে লর্ড আমহার্স্টের কাছে ১৮২৩ সালে তিনি যে প্রস্তাব করেন পরবর্তী সময়ে (১৮৩৫) উইলিয়াম্ বেন্টিঙ্ক ও লর্ড মেকলে তাকেই কার্যকরী করে তোলেন। স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রচলনের ব্যাপারেও রামমোহন কম সাহায্য করেন নি। এ সব কাজে বিরুদ্ধাচারীদের প্রবল বাধাকে তিনি জয় করেছিলেন। তাঁর সহযোগীদের মধ্যে ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর, ডেভিড্ হেয়ার, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি।

ইংরেজী শিক্ষা-দীক্ষাকে সমর্থন করলেও রামমোহন ইংরেজ-শাসনের দোষ-ত্রুটিকে কখনোই বরদাস্ত করতে পারেন নি। ১৮২৩ সালে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতায় সরকারী হস্তক্ষেপ, ১৮২৮ সালের রেগুলেশন্ আইন ইত্যাদির বিরুদ্ধে তিনি তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। আসল কথা, ভারতের উন্নতিকামী ইংরেজকে তিনি অভিনন্দন জানান, কিন্তু তার কোন স্বার্থবুদ্ধিকেই তিনি প্রশ্রয়

দেন নি। অন্যান্য স্বাধীনতার সঙ্গে রাজনৈতিক স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাও তাঁর মতবাদের মধ্যে সুস্পষ্ট। বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর সম্বন্ধে যথার্থই মন্তব্য করেছেন,

> Swaraj, even in the limited sense of complete political independence, was present in the mind of Raja Ram Mohan Roy. Ram Mohan Roy stands before us not only as the founder of the Brahmo Samaj, but really as the father of modern Indian Nationalism.[১]

ইয়ং বেঙ্গল : বাংলা দেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রথম প্রত্যক্ষ ফল 'ইয়ং বেঙ্গল'। হিন্দুকলেজের তদানীন্তন শিক্ষক হেনরি ভিভিয়ান্ ডিরোজিওকে মধ্যমণি করে যে স্বাধীন চিন্তাশীলের দলটি গড়ে ওঠে বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে তারা এই নামেই প্রসিদ্ধ। তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রামগোপাল ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাধানাথ শিকদার, রামতনু লাহিড়ী, হরচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি ছিলেন এই দলভুক্ত। দীক্ষাগুরু ডিরোজিওর কাছ থেকে এঁরা সকলেই লাভ করেছিলেন তীক্ষ্ণ যুক্তিশীল ও প্রাচীনতায় বিশ্বাস-বিমুখ মনোধর্ম। এঁরা ছিলেন প্রগতিশীল জীবনদর্শনের অনুরাগী বস্তুবাদ যে দর্শনের ভিত্তি। একদিকে এঁরা যেমন হিন্দুধর্মের বস্তু-নিরপেক্ষতাকে অস্বীকার করেছিলেন, তেমনি অপর দিকে খ্রীষ্টান ধর্মের গোঁড়ামীকেও বরদাস্ত করেন নি। সমাজ এবং ধর্মের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক স্বাধিকারবোধকে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল এঁদের উদ্দেশ্য। কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রেও এই দলটির স্বাধিকার-সচেতন মনোভাবের পরিচয় অস্পষ্ট নয়। ব্ল্যাক অ্যাক্ট্-এর বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিবাদ ধ্বনিত করে তোলার ব্যাপারে রামগোপাল ঘোষের সক্রিয়তার কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়। তা ছাড়া 'সোসাইটি ফর্ দি অ্যাকুইজিশন্ অব্ জেনারেল নলেজ্' (১৮৩৮) নামে যে সমিতিটি এই দলের দ্বারা পরিচালিত হত তারও অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল রাজনীতি চর্চা। ক্রমশ দেশের অর্থনীতি ও রাজনীতির আলোচনাই

---

১ *Brahmo Samaj and the battle of Swaraj in India*—Bipin Chandra Pal. p. 8.

দলটির কাছে সর্বাধিক প্রাধান্য পেল ; আত্মপ্রকাশ করল 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' (১৮৪২), জন্মলাভ করল 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' (১৮৪৩)। এ দুটির কোনটিই বেশিদিন স্থায়ী হয় নি। ১৮৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশন্' 'ইয়ং বেঙ্গলের' হাত থেকে রাজনীতিচর্চার দায়িত্বভার গ্রহণ করে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : 'ইয়ং বেঙ্গল' দল দেশের যেদিক থেকে যতটুকু উপকারই সাধন করুন না কেন বিদেশী শিক্ষা আর রীতি-নীতি তাঁদের যে অনেকটা আবিষ্ট করে ফেলেছিল তা অস্বীকার করা যায় না। তাঁদের মধ্যে ভাঙার জোর যতটা ছিল, গড়ার জোর ততটা ছিল না। অবশ্য সে সময়ে সমাজের ব্যাধিত অবস্থা একটা বড় রকমের আঘাতের অপেক্ষায় ছিল একথাও সত্য। কিন্তু ধ্বংসের মধ্যে দিয়ে সৃষ্টির বীজ যখন অঙ্কুরিত হয় তখন তাকে লালন পালনের দায়িত্ব গুরুতর। এই গুরুদায়িত্ব স্কন্ধে নিয়ে সেদিন যাঁরা বাংলার নবজাগরণকে সার্থক করে তোলার ব্রত নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তাঁর ভাবনায় পশ্চিমী ভাবধারার যথেষ্ট প্রভাব পড়েছিল ; কিন্তু সে প্রভাবে তিনি অভিভূত হন নি। যুগ-প্রবৃত্তির লক্ষণ বিচার করে তিনি রামমোহন সৃষ্ট সমন্বয়ের ভাবটিকেই সার্থকতার পথে এগিয়ে নিয়ে গেলেন। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মেও সমাজ ও ধর্মের ক্ষেত্রে তিনি যে বিপ্লবী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন তার মধ্যে দিয়েই তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের স্বরূপটি ফুটে উঠেছে।

জাতীয়তাবোধ ও ব্রাহ্ম সমাজ—১ : এই সময়ে ব্রাহ্ম সমাজের কর্ম-তৎপরতাও আন্দোলনের রূপ নিয়েছে। নেতাদের মধ্যে প্রধান হলেন দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর ও অক্ষয় কুমার দত্ত। রামমোহন প্রবর্তিত ভাবধারার অনুবর্তী হয়ে এঁরা নতুন করে সমাজ-সংস্কারে আত্মনিয়োগ করেন। দেবেন্দ্র নাথের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'তত্ত্ববোধিনী সভা' (১৮৩৯), তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' (১৮৪০) এবং 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (১৮৪৩)। উনিশ শতকের মধ্যভাগে বাঙালীর চিন্তা-ধারণার অন্যতম ধারক এই তত্ত্ববোধিনী গোষ্ঠী। সেযুগের কয়েকজন অ-ব্রাহ্ম মনীষীরও এই গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগ ছিল। তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মধুসূদন দত্ত।

চিন্তাধারণায় দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন কিছুটা রক্ষণশীল ; কিন্তু তাঁর সহযোগী

অক্ষয়কুমার ছিলেন প্রগতিশীল বাস্তববাদী। দেবেন্দ্রনাথের ধারণা ছিল বিশ্বাস ও ভক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত আর অক্ষয়কুমারের ধারণার ভিত্তি ছিল বিজ্ঞান ও যুক্তি। তাই তিনি ধর্ম, সমাজ আর রাজনীতির প্রচলিত তত্ত্ব-আদর্শের পুনর্বিচারের প্রয়োজনকে উপলব্ধি করেন। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে এ ব্যাপারে তাঁর নানা মতভেদ দেখা দেয়।

এই সময় থেকেই বাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ইংরেজ শাসনের স্বরূপ সম্বন্ধে কিছুটা সচেতন হয়ে ওঠেন। তবু ইংরেজ রাজত্বের উচ্ছেদ তাঁরা কামনা করেন নি; ইংরেজের দয়াই তাঁদের একান্ত কাম্য ছিল। তবে লক্ষ্য করার বিষয় এই, পূর্বের চেয়ে ইংরেজ-শাসনের সমালোচনার মধ্যে ক্রমশ একটা জোরালো মনোভাব গড়ে উঠছে।

জাতীয়তাবোধের বিকাশে উনিশ শতকের সাহিত্যিক দায়িত্ব: এই সময়ের সাহিত্য-ধারার মধ্যেও নব-চেতনার সার্থক প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের জয়-ঘোষণায় বাংলা সাহিত্য মুখরিত হয়ে ওঠে। জড়তা আর কুশ্রীতাকে সমাজের বুক থেকে দূর করার জন্যে যে কজন জীবন-নিষ্ঠ শিল্পীর আবির্ভাব ঘটে তাঁদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, দীনবন্ধু মিত্র, মধুসূদন দত্ত, কালীপ্রসন্ন সিংহ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবীনচন্দ্র সেনের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। প্রথম দিকে মধুসূদন ও দীনবন্ধুর লেখায় নতুন মানববাদের সার্থক প্রতিফলন লক্ষ্য করা গেল। তারপর এলেন যুগ-স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র।

পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার মোহভঙ্গের সূচনায় তাঁর আবির্ভাব। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চিন্তা-বুদ্ধি তখন নানা সমস্যা আর সংশয়ে আন্দোলিত। য়ুরোপের যে স্বাধীনতা-প্রিয়তার আদর্শে তাঁরা মুগ্ধ হয়েছিলেন, দেখলেন সেই আদর্শের মাটিতেই ক্রমশ স্বার্থবুদ্ধি আর সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের কাঁটাগাছ গজিয়ে উঠছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর স্বজাতিকে এই সংশয়ের হাত থেকে মুক্তি দিতে চাইলেন; সমাজ, ধর্ম আর রাজনীতির নানা বিভ্রান্তি থেকে তুলে ধরতে চাইলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভাও বহুলাংশে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-দীক্ষার ফল হলেও হিন্দু-দর্শনের প্রভাব তাঁর ওপর অনেকখানি এবং এই প্রভাবই তাঁর মধ্যে জয়ী হয়েছে। কিন্তু তাঁর মানস-প্রকৃতির উদার পরিমণ্ডলের মধ্যে তিনি সে সময়কার প্রগতিশীল পশ্চিমী ভাবচিন্তাকে সার্থকভাবেই ধারণ করেছিলেন। কোঁৎ, রুসো, মিল্, প্রুধোঁ প্রভৃতি তখনকার

য়ুরোপীয় চিন্তানায়কদের মতবাদের প্রভাব তাঁর ওপর যথেষ্ট। এই প্রভাবের নিদর্শন তাঁর 'সাম্য'।

সাম্যের উদারনীতি ও স্বাদেশিকতার বাণী তাঁর অনেকগুলি উপন্যাসের মধ্যে ধ্বনিত হয়েছে। কিন্তু এ বাণীর সঙ্গে হিন্দুত্বের যোগ ছিল অভিন্ন। পরবর্তীকালেও বহুদিন এই যোগ অক্ষুণ্ণ ছিল। এমন কি স্বদেশীযুগে রবীন্দ্রনাথ, ব্রহ্মবান্ধব, রামেন্দ্রসুন্দর প্রভৃতি মনীষীদের স্বদেশ-চেতনায় এই একান্ত হিন্দুরূপটিই প্রকট হয়ে উঠেছে।

বঙ্কিমচন্দ্র সন্তান-সেনাদের নিয়ে তাঁর 'আনন্দমঠে'র প্লট্ রচনা করেছেন। ইংরেজদের কাছে এদের কার্যকলাপ ছিল দস্যুতারই নামান্তর। আর বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁর উপন্যাসে যেভাবে এদের রূপ দিলেন ইতিহাসের সঙ্গে তার হয় তো কোনই সংযোগ নেই। কিন্তু তবু তাঁর এই কল্পনা-জাত সন্তানদের আবির্ভাবের সে সময় একটা বিশেষ প্রয়োজন ও গুরুত্ব ছিল। ডাঃ অরবিন্দ পোদ্দার এ সম্বন্ধে যথার্থ ই মন্তব্য করেছেন—

> বঙ্কিমচন্দ্রের এই অসত্য ইতিহাসের ভিতর দিয়া সত্য মানুষ প্রাণ পাইয়াছে। ···সন্তানদের এই সংগ্রাম, জয়লাভ এবং আদর্শ-প্রতিষ্ঠার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন মানুষ তাহাদের বাস্তব সংগ্রাম এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার সুস্পষ্ট প্রতিফলন দেখিতে পাইয়া বিস্মিত হইয়াছে।[২]

স্বদেশ-সাধকদের চিত্তে 'আনন্দমঠে'র প্রভাব স্বদেশীযুগে আরো প্রবল হয়ে ওঠে। সব রকম অত্যাচার অনাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ানর যে নির্দেশ তিনি এই উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে বাঙালীকে দিলেন ক্রমে তা সমগ্র ভারতবাসী সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করেছিল।

কিন্তু এখানে একটি কথা স্মরণ রাখা দরকার যে রাজরোষের কবল থেকে মুক্ত থাকবার জন্যে তিনি মাঝে মাঝে খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতেন। আর তখন ইংরেজকে তুষ্ট করার অভিপ্রায়ে স্বাদেশিকতা সম্বন্ধে পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিচয় দিতেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে 'আনন্দমঠে'র প্রথম সংস্করণের 'ইংরেজ' শব্দটি পরবর্তী সংস্করণে 'নেড়ে'তে রূপান্তরিত হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র চেয়েছিলেন বাঙালীর আত্মবিস্মৃতির ঘোর কাটিয়ে তাকে সচেতন করে তুলতে যে সচেতনতার অভাবে রাজনৈতিক কোন আন্দোলনই সার্থক হতে

২ 'বঙ্কিম-মানস', ডাঃ অরবিন্দ পোদ্দার, পৃ ৯১ ও ৯২।

পারে না। তাই তিনি 'দেবীচৌধুরাণী', 'রাজসিংহ', 'সীতারাম', 'কমলাকান্তের দপ্তর' প্রভৃতি গ্রন্থের মধ্যে দিয়ে নানাভাবে দেশবাসীকে জাগিয়ে তোলার অক্লান্ত চেষ্টা চালিয়ে গেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত বঙ্গদর্শন পত্রিকাকে কেন্দ্র করে এবং তাঁরই ভাব-চিন্তায় অনুপ্রাণিত হয়ে এই সময়ে একটি শক্তিশালী লেখক-গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। এঁদের মধ্যে ভূদেব মুখোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, চণ্ডীচরণ সেন প্রভৃতির নাম করা যায়।

এই সময়ের কাব্যধারাতেও একটা লক্ষণীয় পরিবর্তন সূচিত হল। সাধারণ-ভাবেই হোক বা ঐতিহাসিক পটভূমিতেই হোক, স্বদেশ-প্রেমই কাব্যের প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ল। এই প্রসঙ্গে তিনজন কবির নাম একই সঙ্গে করা যায়—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবীনচন্দ্র সেন। এঁদের বহু-পরিচিত স্বদেশ-প্রেমের কবিতা এবং কাব্যগ্রন্থগুলি বাঙালীর হৃদয়ে স্বদেশ-প্রেমের নতুন জোয়ার এনেছিল ; এঁদের লেখায় ইংরেজের প্রতি বাহ্যিক আনুগত্য যতই প্রকাশ পাক পরাধীনতার বন্ধন-মুক্তির কামনাধারা ছিল অন্তঃপ্রবাহী।

হিন্দুমেলা ঃ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জনচিত্তে দেশানুরাগ জাগিয়ে তোলার প্রচেষ্টায় বাঙালী এক নতুন কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করে। সভা-সমিতির আলোচনায় আর সাহিত্যের মধ্যে এতদিন যে প্রচেষ্টা গণ্ডিবদ্ধ ছিল তা বহুমুখী আর ব্যপক রূপ লাভ করল 'চৈত্রমেলা' বা 'হিন্দুমেলা'র প্রবর্তনে। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস' গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে নবগোপাল মিত্রের সাহায্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই মেলার সূত্রপাত করেন। অন্যান্য উদ্যোক্তাদের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রাজনারায়ণ বসু ছিলেন প্রধান। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'স্বদেশী মেলা' বলেই এর উল্লেখ করেছেন।[৩] ১২৭৩ সালের চৈত্র সংক্রান্তির দিন বেলগাছিয়ার ডন্‌কিন্ সাহেবের বাগানে এই মেলার উদ্বোধন হয়। গণেন্দ্রনাথ ছিলেন এর সম্পাদক এবং পরের বছর নবগোপাল হন সহ-সম্পাদক। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার আঠার বছর আগে বাঙালী এই মেলার অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে এক সর্বভারতীয় ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করে। স্বদেশী শিল্পের পুনরুজ্জীবন এবং জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে দেশবাসীর অন্তরে স্বদেশ-প্রেমের নতুন আবেগ সঞ্চার এই মেলার দুটি

৩ দ্রষ্টব্য—'আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস'—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ ৩৫-৩৬।

প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। গণেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, মনোমোহন বসু ও দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর অনেকগুলি বিখ্যাত কবিতা ও গান এই মেলা উপলক্ষ্যেই রচিত হয়। দেশের অর্থনৈতিক দুর্দশার কথা সে সময় মনোমোহন বসু স্পষ্ট ভাষাতেই প্রকাশ করেন—

ছুঁই সূতা পর্যন্ত আসে তুঙ্গ হতে
দীয়াশলাই কাটী, তাও আসে পোতে ;
প্রদীপটি জ্বালিতে খেতে শুতে যেতে
কিছুতেই লোক নয় স্বাধীন।

তখনকার তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠেও সেদিন শোনা গিয়েছিল,

ব্রিটিশ বিজয় করিয়া ঘোষণা
যে গায় গাক আমরা গাব না
আমরা গাব না হরষ গান,
এসো গো আমরা যে কজন আছি
আমরা ধরিব আর এক তান।[৪]

জাতীয় ভাবধারায় সে সময় দেশবাসী কি পরিমাণ অনুপ্রাণিত হয় তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত 'ন্যাশনাল' নবগোপাল।

এই সময়ে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা বাঙালীর হৃদয়ে এত প্রবল হয়ে ওঠে যে ইংরেজ শাসনের মধ্যে ভারতের যে আর মঙ্গলের কোন আশা নেই এ কথা অনেকেই স্পষ্ট উপলব্ধি করেন। শুধু উপলব্ধিই নয়, প্রকাশ্যে ব্যক্ত করতেও দ্বিধা করলেন না তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ১১ই মার্চ বেথুন সোসাইটির একটি সভায় তিনি মুক্ত-কণ্ঠেই ঘোষণা করেন, "যতদিন পর্যন্ত ইংরেজরা ভ্রাতৃভাবে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে গমন না করিবেন ততদিন আমাদিগের মন প্রকৃত স্বাধীনতা অবলম্বন করিতে পারিবে না ও আমাদিগের স্থায়ী ও প্রকৃত মঙ্গল হইবে না।"[৫] অমৃতবাজার পত্রিকায় তখন যে ধরণের লেখা ছাপা হত তাতে ইংরেজ ও ভারতবাসীর জাতীয় স্বার্থের মূলগত বৈষম্যকেই

৪ 'বৃটিশের' স্থলে 'মোগল' বসিয়ে কবিতাটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'স্বপ্নময়ী' নাটকে সন্নিবেশিত করেন।

৫ 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ২৬শে মার্চ, ১৮৬৮। যোগেশচন্দ্র বাগলের 'বিদ্রোহ ও বৈরিতা' গ্রন্থে উদ্ধৃত। পৃ-১২১

প্রকট করে তোলা হত, এবং ইংরেজ-শাসনের অবসান যাতে ত্বরান্বিত হয় এমন মনোভাবের ইঙ্গিতও প্রচ্ছন্ন থাকত। ১৮৭৪ সালে 'হিন্দুমেলা' উপলক্ষ্যে অমৃতবাজার পত্রিকায় একটি লেখা ছাপা হয়। এখানে সেটি উদ্ধৃত হল। এর থেকে বোঝা যাবে ইংরেজের কু-শাসনের বিরুদ্ধে একটা শক্তিশালী প্রতিরোধ সৃষ্টির ব্যাপারে অনেকেই তখন কোন্ আঙ্গিকে চিন্তা করছেন।

> এক্ষণে আমাদের মধুরস ছাড়িয়া তিক্ত রসাস্বাদ করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। আমরা যখন দেখিব হিন্দুমেলার সুবিস্তীর্ণ রঙ্গভূমি মল্লবেশধারী হিন্দুসন্তানগণে পরিপূর্ণ, বাঙালীরা তেজস্বী অশ্ব অবলীলাক্রমে ও অশেষ কৌশলে সঞ্চালিত করিয়া দর্শকগণকে বিমোহিত করিতেছেন, যখন দেখিব হিন্দুসন্তান বন্দুক তলোয়ার প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া উদ্যমের সহিত উৎসাহপূর্বক দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরস্পর প্রবৃত্ত হইতেছেন, এবং পরস্পর পরস্পরের আঘাতে আঘাতিত হইয়া, রক্তাক্ত কলেবরে, কেহ আহত পদে কেহ বা আহত হস্তে কেহ বা আহত মস্তকে রঙ্গস্থান পরিত্যাগ করিতেছেন, এবং তদুপলক্ষ্যে পুলিশ আসিয়া নবগোপালবাবুর হস্ত ধারণ করিয়া টানাটানি করিতেছে, সেইবার জানিব হিন্দুমেলার মহৎ উদ্দেশ্য অনেকাংশে সুসিদ্ধ ও সফল হইয়াছে।[৬]

ইংরেজ-শাসনের প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করার কোন ইচ্ছা বা কর্ম-পন্থা 'হিন্দুমেলা'র ছিল না। আত্মশক্তি এবং আত্মচেষ্টা যে জাতীয় দুঃখ-দারিদ্র্য দূরীকরণের শ্রেষ্ঠ উপায়, এ কথা স্বদেশী আন্দোলনের সময় দেশবাসী মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে। 'হিন্দুমেলা'য় সেই সত্যেরই পূর্বাভাস—সেই কর্ম-বীজেরই অঙ্কুরোদ্গম।

সাধারণী পত্রিকায় স্বাদেশিকতা : স্বাদেশিকতার মর্মবাণী প্রচারে এই সময়ের দুটি পত্রিকা যথেষ্ট সহায়তা করেছিল। একটি বঙ্কিমচন্দ্রের মাসিক বঙ্গদর্শন (১২৭৯) এবং অপরটি অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সাপ্তাহিক সাধারণী (১২৮০)। বঙ্গদর্শনের পরিচয় সর্বজনবিদিত। এখানে সাধারণীর পৃষ্ঠাগুলির সাহায্যে বাংলায় সমসাময়িক জাতীয়তাবোধের স্বরূপ বিশ্লেষণের সামান্য চেষ্টা করা যাক। বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সেকালের

৬ সাধারণী পত্রিকায় উদ্ধৃত—২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৪। 'হিন্দুমেলা' নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ অনেক সাহিত্যিক এতে লিখতেন; এবং বিশেষ করে দেশের নানা সমস্যা ও রাজনৈতিক ঘটনামূলক রচনাবলী এতে প্রকাশিত হত।

শারীরিক শক্তিবৃদ্ধি না করতে পারলে বিদেশীদের অত্যাচারের প্রতিবিধান করা সম্ভব নয়, 'অস্ত্রশিক্ষা' নামক প্রবন্ধটির মধ্যে এই কথাই স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হল—

> এই কলঙ্ক অপনয়ন করিবার নিমিত্ত সকলে অগ্রসর হও, হে স্বদেশ-হিতৈষিগণ, সকল কার্য ছাড়িয়া যাহাতে বঙ্গবাসীদিগের শারীরিক বলবিধান হয় তদ্বিষয়ে যত্নশীল হও, যাহাতে পদে পদে বিদেশীদিগের পদলেহন না করিতে হয়, এরূপ করিতে সচেষ্ট থাক। (২৩শে কার্তিক ১২৮১)

এইভাবে উত্তেজিত করে তোলার সুফলও যে কিছুটা ফলেছিল তা সহজেই বোঝা যায় যখন দেখি মাত্র চার বছর পরেই 'আরম্‌স্ অ্যাক্‌ট্' বা 'অস্ত্র আইন' বিধিবদ্ধ হয়।

আত্মশক্তির ওপর দেশবাসী যে তখন যথেষ্ট নির্ভর করতে সুরু করেছে এবং সে নির্ভরতা তার অন্তরে যে বেশ সাহস সঞ্চারিত করেছে তার প্রমাণ পাই ইংরেজ শাসকদের প্রতি এই সাবধান-বাণীতে—

> যাহা হউক, ইংরাজ বণিকদিগের তোষামোদে চিরকাল নিযুক্ত থাকুন। আমাদের অধিক অমঙ্গলের আশঙ্কা নাই। আমরা অন্ধ। আমাদের রাত্রিদিবা তুই সমান। কিন্তু ইংরাজ বাহাদুর যেন স্মরণ রাখেন অতিশয় স্বার্থপরতাই গর্বখর্বকরণের মূল। ('লর্ড সালিসবারি ও ম্যাঞ্চেষ্টার বণিক সম্প্রদায়'—২০শে পৌষ, ১২৮১)।

১৮৭৫ সালে প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্-এর ভারত আগমন উপলক্ষ্যে সাধারণীতে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। বিদেশী শোষণ-যন্ত্রের নির্মমতা আর নিজেদের নিদারুণ শোষিত অবস্থা বাঙালীকে যে তখন কতখানি বাস্তব-সচেতন ও বিদেশী-বিমুখ করে তুলেছে 'মহারাজ্ঞীপুত্রের শুভাগমন' নামক এই প্রবন্ধটি থেকে তার কিছু নিদর্শন গ্রহণ করা যাক্।

> আমাদের বর্তমান দয়াশীলা মহারাণীর রাজ্যশাসন সম্পূর্ণরূপে সুশাসন বলিতে পারি না। কেন না মধ্যে মধ্যে উৎপীড়ন করিতে তাঁহার প্রাণ কাঁদে না।··· এই ভারতভূমি এত শোষিত হইয়াছে যে, ইহার আর রস মাত্র নাই। এদিকে ভীষণ দুর্ভিক্ষোৎপীড়িত, ওদিকে কঠিন নিয়মে ও

অন্যায় শুল্কে উৎপীড়িত ; কাজেকাজেই প্রজাপুঞ্জের কোমল হৃদয় কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।...এবার প্রিন্স্ অব্ ওয়েল্সের মান কিসে থাকে? ইঁহার শুভাগমনে সমুদয় রাজধানীর বড় বড় অট্টালিকা সকলে অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত না হইলে আর তদপেক্ষা অধিকতর রূপে সম্মান করা যায় না। (৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১২৮২)।

ইংরেজী শিক্ষার মধ্যে দিয়েই বাঙালীর অন্তরে তখন জাতীয় অভাব-বোধ তীব্র হয়ে ওঠে। এই শিক্ষার মোহ এবং পাশ্চাত্ত্য-সভ্যতার অন্ধ অনুকরণ-জনিত চারিত্রিক ত্রুটিগুলি সম্বন্ধেও শিক্ষিত বাঙালী তখন থেকেই সজাগ হতে আরম্ভ করেছে।

ইংরাজ আমাদিগকে ইতিহাস পড়াইয়াছেন, আমাদের নিজের ইতিহাস নাই, এই দিব্যজ্ঞান আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন। তাহাতে আমরা বুঝিয়াছি যে সিরাজুদ্দৌলা পামর, পাষণ্ড, পাপিষ্ঠের শিরোমণি, তাহার পূর্ববর্তী বঙ্গরাজগণ—ভারতাধিপতিমাত্রেই—অল্প ইতরবিশেষ, সিরাজুদ্দৌলারই অনুরূপ ; তাহাতেই আবার বুঝিয়াছি যে ক্লাইভ সংস্কৃত নাটকের ধীরোদাত্ত নায়ক,— সুধীর, মহাবীর, পরোপকারী, পরম ধার্মিক ; তাঁহার পরবর্তী শ্বেতকায় কোট-হ্যাটধারী মাত্রেই তদ্রূপ।... কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা কি কিছু শিখিয়াছি? কৈ, কিছুই ত দেখি না। ('কি হবে?'—২৯শে কার্তিক, ১২৮২)।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় বিদেশী-বর্জন বা বয়কটের যে প্রস্তাব গৃহীত হয় সে সময়ে তার একটা বিশিষ্ট রূপ থাকলেও, স্বদেশী আন্দোলনের বহুকাল আগে, এমন কি কংগ্রেস প্রতিষ্ঠারও প্রায় নবছর আগে বাংলা দেশে এই বয়কটেরই পূর্বরূপ আমরা লক্ষ্য করি। সাধারণীর পৃষ্ঠায় 'দেশীয় বস্ত্র' নামে যে রচনাটি প্রকাশিত হয় তার অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করলেই এই ধারণার সত্যতা প্রমাণিত হবে।

বোধহয় অনেকেই অবগত আছেন যে ঢাকা নগরীতে কয়েকজন উন্নত যুবা 'বিলাতীয় বস্ত্র যত পারি কম ব্যবহার করিব'—বলিয়া প্রতিজ্ঞা করণান্তর একটি সভা স্থাপিত করিয়াছেন। আমাদের দেশ, বস্ত্রের নিমিত্ত দিন দিন যেরূপ ম্যাঞ্চেষ্টারের গলগ্রহ হইয়া পড়িতেছে, দেশের তন্তুবয়ন দিন দিন যেরূপ লোপ পাইতেছে এমন সময় এইরূপ প্রতিজ্ঞা অতি প্রশংসনীয়। (৭ই চৈত্র, ১২৮২)।

সরকারী চাকরী লাভের জন্যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে তখন যে প্রচেষ্টা দেখা দেয় তা যে কতটা আত্মমর্যাদা এবং আত্মজ্ঞানহীন ছিল 'দিল্লীর দরবার' নামক প্রবন্ধে তা চমৎকারভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। ভারতের অদৃষ্ট-বাষ্পীয়-শকটের যাত্রী ভারতবাসীরা চলেছে—কোথায় চলেছে তা নিজেদেরই অজানা।—

> কেবল ষ্টেশনে পৌছিলে একবার চটকা ভাঙে। বাতায়ন হইতে গ্রীবা বাহির করিয়া একবার জিজ্ঞাসা করে যে কোথায় আসিল ও রাত্রি কত? কেহ বা সেই সময়ে একটু জল চাহিয়া লইয়া মুখ হাত ধুইয়া একবার দুইদিকে দৃষ্টিপাত করে। দেখে বা শুনে যে ঘোর তমস্বিনী কেবল গভীরে সাঁই সাঁই রব করিতেছে, আর দূরে পালে পালে উল্কামুখী মুখব্যাদন করিয়া সেই অন্ধকার বিচ্ছিন্ন করিতেছে; যে বড় সাহসী সে হয় ত একবার গার্ডকে জিজ্ঞাসা করিল 'হুজুর, District Judgeship Station কেত্তা দূর হ্যায়?' সাহেব ভ্রূকুটি নিক্ষেপে বলিলেন, 'আভি বহুৎ দের হ্যায়, চুপচাপ ঘুম যাও।' হয়ত আর একজন জিজ্ঞাসা করিল, 'হুজুর, Military Service Station কেত্তা দূর হ্যায়?' সাহেবের অসহ্য হইল; তিনি চক্ষু পাকল করিয়া বলিলেন, 'অভি বহুৎ দের হ্যায়, চিল্লাও মৎ।' (২১শে কার্তিক, ১২৮৩)।

এই আত্মমর্যাদাবোধের উদ্বোধনই সে যুগের জাতীয় চেতনার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। ইংরেজের গোলামী করে যে কোন লাভ নেই বরং সেই গোলামীই যে ব্যক্তি ও জাতির অধঃপতনের প্রধান কারণ এ চেতনা অনেকের মধ্যেই তখন একটা বলিষ্ঠ আকার ধারণ করেছে। 'উপদেশ' নামক কবিতায় এই মনোভাবেরই সুস্পষ্ট প্রকাশ দেখা যায়। স্মরণ রাখা দরকার অল্পকাল পরেই সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের নেতারা ইংরেজের দাসত্ব না করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন। কবিতাটির কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত হল—

> চাকুরীর মুখে ছাই, সে আশা না কর ভাই
> স্বাধীন হইতে শিক্ষা কর সর্বজন হে।
> বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী—দেখ বেদ বিধি সাক্ষী—
> বাণিজ্যে তৎপর হও ঘুচিবে বেদন হে।

বলি না ইংরেজ দলে খেদাইতে বাহুবলে—
পারিবে না যেই কাজ কি কাজ তাহায় হে ?
স্বাধীন ব্যবসা কর স্বাধীন বসন পর
চাকুরী না কর করি মিনতি সবায় হে। (১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৪)

ইংরেজের কুশাসন-জনিত দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্তিলাভের বাসনা বাঙালীর হৃদয়কে এই সময় প্রবলভাবে নাড়া দিলেও ইংরেজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ শত্রুতা সুরু করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না; আর সরকারও বাঙালীর আত্ম-সচেতনতার পরিচয় পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, 'আরম্‌স্ অ্যাক্ট্', 'প্রেস্ অ্যাক্ট্' প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে তার জাতীয় শক্তিবৃদ্ধির পথে প্রবল অন্তরায় সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেন। অবশ্য বাধা পেয়ে এই শক্তি ক্রমশ স্বাভাবিক নিয়মেই সঞ্চিত হতে থাকে, তারপর বঙ্গভঙ্গকে উপলক্ষ্য করে প্রচণ্ড উদ্দামতায় প্রকাশ পায়।

জাতীয়তাবোধ ও ব্রাহ্মসমাজ—২ঃ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা দেশে স্বাদেশিকতার নবরূপায়ণের ক্ষেত্রটি গড়ে ওঠে বিশেষ ভাবে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা আর ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে। ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক রূপটি ছিল পুরোপুরি সংস্কারমূলক। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রক্ষণশীলতাকে সমর্থন করতে না পেরে কেশবচন্দ্র সেন এবং তাঁর অনুগামী দল নতুন পথ ধরেন। এঁরা জাতিভেদ অস্বীকার করেন, উপবীত পরিত্যাগ করেন এবং পৌত্তলিকতার ঘোর বিরোধী হয়ে দাঁড়ান। সমাজে গণতান্ত্রিক অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল এঁদের উদ্দেশ্য। ব্রাহ্ম মহিলারাও পর্দার অন্তরালে তাঁদের পৃথক আসন ত্যাগ করে উপাসনা সভায় পুরুষদের পাশেই আসন গ্রহণ করলেন। এই সমাজ-সংস্কারের উদ্দেশ্যেই ১৮৭০ সালে প্রতিষ্ঠিত হল 'ভারত-সংস্কার সভা'। এই সভার কার্যক্রমের মধ্যে স্ত্রী-শিক্ষা এবং শ্রমিক-শিক্ষা ছিল অন্যতম। শ্রমিকদের জন্যে নৈশবিদ্যালয়ও স্থাপিত হয়েছিল। শিক্ষা-বিস্তারকে সহজ করার জন্যে প্রকাশিত হল এক পয়সা দামের 'সুলভ সমাচার' পত্রিকা।

কেশবচন্দ্র যতটা প্রগতিশীল মনোভাব নিয়ে ব্রাহ্মসমাজকে নতুন করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন শেষ পর্যন্ত সে ভাব বজায় রাখতে পারেন নি; অথবা এ কথাও সত্য হতে পারে যে, তিনি যা চেয়েছিলেন তাঁর অনুগামী নব্য-ব্রাহ্মদের প্রত্যাশা ছিল তার চেয়ে বেশি। তাই তাঁর সঙ্গে এই যুবক ব্রাহ্মদের আদর্শগত

একটা বিরোধ দেখা দিল যার ফলে স্থাপিত হল 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' (১৮৭৮)। এই নব-প্রতিষ্ঠিত সমাজের কর্ম-কর্তাদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন,—শিবনাথ শাস্ত্রী, দুর্গামোহন দাস, আনন্দমোহন বসু, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি। শুধু ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারই নয় রাজনীতি-চর্চা ও স্বাদেশিকতা প্রচারও এই নতুন সমাজের প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। দুটি মুখপত্রও প্রকাশিত হল—'ব্রাহ্ম-পাবলিক্ ওপিনিয়ন্' এবং 'তত্ত্ব-কৌমুদী'।

এই সমাজের নেতা শিবনাথ শাস্ত্রী এবং আনন্দমোহন বসুর নাম বাঙলার জাতীয় জাগরণের ইতিহাসের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হবার আগের বছর (১৮৭৭) শিবনাথ কয়েকজন একনিষ্ঠ ব্রাহ্মযুবককে নিয়ে 'ইনার্ সার্কল্' গড়ে তোলেন। এর মধ্যে ছিলেন বিপিন-চন্দ্র পাল, আনন্দচন্দ্র মিত্র, সুন্দরীমোহন দাস প্রভৃতি। শিবনাথের সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বিপিনচন্দ্র লিখেছেন,

> তিনিই আমাদের স্বাধীনতার সাধনার ও স্বদেশ-চর্যার প্রথম দীক্ষাগুরু হইয়াছিলেন। তাঁহার নায়কত্বে আমরা ক'জন মিলিয়া একটি ছোট দল গড়িবার চেষ্টা করি। আমাদের প্রতিজ্ঞা-পত্রের প্রথম কথা ছিল—'স্বায়ত্ত-শাসনই (তখনও স্বরাজ শব্দের প্রচার হয় নাই) আমরা একমাত্র বিধাতৃ-নির্দিষ্ট শাসন বলিয়া স্বীকার করি।···তবে দেশের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ মঙ্গলের মুখ চাহিয়া আমরা বর্তমান গভর্ণমেণ্টের আইনকানুন মানিয়া চলিব—কিন্তু দুঃখ, দারিদ্র্য, দুর্দশার দ্বারা নিপীড়িত হইলেও কখনও এই গভর্ণমেণ্টের অধীনে দাসত্ব করিব না।'[৭]

ভারতের প্রথম 'র‍্যাঙ্লার' আনন্দমোহন বসু ইংরেজী শিক্ষাদীক্ষায় ভরপুর হলেও মনে-প্রাণে ছিলেন স্বদেশী এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। শিশিরকুমার ঘোষ ও শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের যুগ্ম প্রচেষ্টায় ১৮৭৫ সালে যে 'ইণ্ডিয়ান লীগ' স্থাপিত হয় তার আয়ু বেশিদিন ছিল না। ১৮৭৬ সালেই সুরেন্দ্রনাথ এবং তাঁর অনুগামীরা প্রতিষ্ঠা করেন 'ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশন্'। এই দলের মধ্যে ছিলেন আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী প্রভৃতি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নেতারা। ছাত্রদের জন্যে প্রধানত আনন্দমোহনের নেতৃত্বেই এই সময় গড়ে ওঠে 'স্টুডেণ্টস্ এসোসিয়েশন' বা ছাত্র-সভা। জাতীয়

৭ 'নবযুগের বাংলা', বিপিনচন্দ্র পাল—পৃ ১২২-২৩।

জাগরণের ব্যাপারে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যে গুরুতর দায়িত্বভার বহন করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। এই প্রসঙ্গে আলোচনায় বিপিনচন্দ্র পাল আনন্দমোহন বসুর সম্বন্ধে লিখেছেন,

> While Surendranath Banerjee was preaching a new gospel of political freedom, and organising political associations all over Upper India, Ananda Mohan as a leader of the new Sadharan Brahmo Samaj was engaged in framing a constitution for his church which was meant to be a model for the future constitution of a free and democratic India.[৮]

এই সময়ে আর একজন মহাপুরুষের অধ্যাত্ম-সাধনায় বাংলা দেশে নতুন সাড়া জাগে। সাধক শ্রীরামকৃষ্ণের উদার-নীতিক ধর্মমত তখন অনেক চিন্তাশীল মনীষীর মনকে প্রভাবিত করেছিল; এবং আরো কিছুকাল পরে স্বামী বিবেকানন্দের কর্মাদর্শে যুবক-বাংলা নবশক্তিতে স্বদেশ-সেবায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে।

কংগ্রেসের জন্ম ও তার প্রকৃতি : কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার (১৮৮৫) আগে 'ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশন্' বা 'ভারত-সভা'ই রাজনৈতিক স্বার্থে সর্বভারতীয় ঐক্য সৃষ্টির কাজে একটা পরিকল্পিত কর্মসূচী গ্রহণ করে। সফলতার অন্যতম উপায় হিসাবে mass contact বা গণ-সংযোগের প্রয়োজনও এই প্রতিষ্ঠান উপলব্ধি করেছিল। এই প্রয়োজনেই 'রায়ত-সভা'র প্রতিষ্ঠা। এ ব্যাপারেও সুরেন্দ্রনাথ ও আনন্দমোহনের কৃতিত্বই সর্বাধিক। কিন্তু আসলে এই প্রতিষ্ঠান শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের ভাবনা-সমস্যাকেই প্রাধান্য দিয়েছিল। তাই গণ-সংযোগের জন্যে সামান্য চেষ্টা সুরু হলেও কোন সুনির্দিষ্ট কার্য-ক্রম গ্রহণ করা হয় নি।

এই সময়কার একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা 'ইলবার্ট বিল্' আন্দোলন (১৮৮৩)। দেশীয় বিচারকদের দ্বারায় ইংরেজ আসামীদের বিচারকে আইন-সিদ্ধ করার জন্যে তদানীন্তন আইন সচিব ইল্‌বার্ট এই বিলটি প্রস্তুত করেন। এর সমর্থনে ভারত সভার সভ্যরা আন্দোলন সুরু করলে ইংরেজরাও এর বিরুদ্ধে তুমুল প্রতি-আন্দোলন গড়ে তোলে। তারাই হয় জয়যুক্ত, আর সুরেন্দ্রনাথের হয় কারাদণ্ড।

---

৮ *Brahmo Samaj and the battle of Swaraj in India*—Bipin Chandra Pal, pp. 66-67.

'ইলবার্ট বিল্' আন্দোলনের ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে নেতারা নিজেদের শক্তির একটা হিসেব করে নিলেন। বুঝলেন ভারতব্যাপী একটা সুষ্ঠু সংগঠন গড়ে তুলতে না পারলে তাঁদের জয়ের আশা সুদূরপরাহত। এই উদ্দেশ্যেই ১৮৮৩ সালে ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় তিন দিন ব্যাপী 'ন্যাশনাল কন্ফারেন্স' অনুষ্ঠিত হয়। ১৮৮৫ সালে আবার এই কন্ফারেন্স আহূত হয়; আর এই বছরেই হিউম সাহেবের নেতৃত্বে বোম্বাই প্রদেশে কংগ্রেসের জন্ম হওয়ায় ন্যাশনাল কন্ফারেন্সের প্রয়োজন শেষ হয়।

শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের সঙ্গে দেশের নিম্নস্তরের সাধারণ মানুষের ক্রমবর্ধমান সংযোগ কয়েকজন চিন্তাশীল কূটনৈতিক ইংরেজকে খুবই ভাবিয়ে তুলেছিল। এই সংযোগের ফলে ইংরেজ রাজত্বের একটা ভবিষ্যৎ দুর্যোগের দুঃস্বপ্নও তাঁরা দেখে থাকবেন। তাই বিশেষ করে হিউমের প্রচেষ্টায় শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের অসন্তোষ সংযত হল কংগ্রেসের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যে। গণ-সংযোগের চেষ্টাও সুরুতেই শেষ হল।

কংগ্রেসের নেতাবা রাজনৈতিক আন্দোলনকে যে রূপ দিলেন তা গোড়া থেকেই ছিল ইংরেজের অনুগ্রহের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। সরকারী চাকরীর নানা ক্ষেত্রে অধিকার আদায়, ইংরেজের সঙ্গে দেশ শাসনে অংশগ্রহণের সুযোগ, সামরিক খাতে ব্যয়-সংকোচের দাবি, দেশে শিক্ষার প্রসার এই ধরণের কয়েকটি বিষয়ের মধ্যেই তখন কংগ্রেসের আন্দোলন সীমিত ছিল। অর্থাৎ একমাত্র শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সমস্যা নিয়েই তাঁরা মাথা ঘামাতেন।

কিন্তু কংগ্রেসের এই প্রকৃতিকে বাঙালী অন্তরের সঙ্গে মেনে নিতে পারে নি। কারণ শ্রমজীবী সাধারণ মানুষকে টেনে তুলতে না পারলে দেশের যে কোন প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হতে পারে না এ কথা বাংলার অনেক নেতাই বিশ্বাস করতেন। এই সময়ে প্রকাশিত বাংলা দেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার পাতা ওল্টালেই দেখা যাবে, কংগ্রেসের কর্ম-পদ্ধতিকে বাঙালী সম্পূর্ণ অনুমোদন করে নি। এই সমস্ত পত্রিকার লেখাতে ইংরেজ আনুগত্যের পরিচয় সুস্পষ্ট থাকলেও দেখা যাবে কংগ্রেসের প্রকৃতির যথার্থ বিশ্লেষণ করতে বাঙালীর দেরি হয় নি। ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের (১৮৫১-১৯০৩) একটি সমসাময়িক প্রবন্ধ থেকে এর একটি প্রমাণ দেওয়া হল—

কোন কোন প্রেসিডেন্টের মুখে ব্যক্ত হইয়াছে 'কংগ্রেস ইংরাজী

শিক্ষিতদের সভা'। ইহা সত্য এবং প্রকৃত। অতঃপর যে সত্য ও প্রকৃত কথা বাক্যে (কার্যে হইয়াছে ও হইতেছে) ব্যক্ত ও ঘোষিত হওয়া উচিত, তাহা এই—'কংগ্রেস শিক্ষিত ও ধনীদিগের বৈষয়িক স্বার্থের প্রতিনিধি।' 'কংগ্রেস কৃষিজীবী রায়তের জমিজমা সম্বন্ধীয় স্বার্থের প্রতিনিধি নহে।' এই একটিমাত্র কথা কংগ্রেস কর্তৃক স্বীকৃত এবং প্রকাশ্য ও বিশ্বস্তভাবে ব্যক্ত হইলে, অনেক গোল মিটিয়া যায়।[৯]

যাই হোক, সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশার স্বর কংগ্রেসের আন্দোলনে ধ্বনিত হয় নি বলে সেই অবস্থাজনিত একটা চাপা অসন্তোষ তাদের মধ্যে ক্রমশ দানা বেঁধে ওঠে। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার সময় থেকে উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার দ্রুত অধঃপতন দেখা দেয়। মহামারী আর দুর্ভিক্ষের সংখ্যা এই সময়েই সবচেয়ে বেশি। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় ১৮ বার। শেষ দশ বছরের দুর্ভিক্ষে প্রায় দু কোটি প্রজার প্রাণনাশ ঘটে।[১০] আর এই সময়েই ইংরেজ সরকার ভারত-সীমান্তে, বেশির ভাগই ভারতের টাকায়, বিভিন্ন যুদ্ধ আর সামরিক অভিযানের মধ্যে লিপ্ত থাকে। এই যুদ্ধ আর অভিযানগুলির সংখ্যা 'বিভিন্ন' শব্দটি দিয়ে মোটেই বোঝান যায় না বলে এখানে এই উদ্ধৃতিটির প্রয়োজন হল,

> A lurid light is thrown upon all this (that is on the way Britain has given India peace) by a Parliamentary Report made in 1899 in the British House of Commons, on the demand of John Morley, showing just how many of these border wars there have been, in what localities and their exact nature. The Parliamentary Report revealed the amazing fact that during the 19th century Great Britain actually carried on, in connection with India, mainly on its borders, not fewer than one hundred and

৯ নব্য-ভারত—মাঘ, ১৩০৩।

১০ দ্রষ্টব্য—'ভারতের রাজা ও প্রজা,' ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, নব্য ভারত—পৌষ, ১৩১১

eleven wars, raids, military expeditions and military campaigns.[১১]

দেশের সাধারণ মানুষের বোধশক্তিকে পঙ্গু করে দেবার জন্যে ইংরেজ সরকার আর একটি সাংঘাতিক অস্ত্র প্রয়োগ করে। মদ এবং অন্যান্য মাদক দ্রব্যের ব্যবহারে সরকার দেশের লোককে উৎসাহিত করে তোলে। শুঁড়ীখানা আর ভাঁটিখানার সংখ্যা চারিদিকে ক্রমশ অগণিত হয়ে ওঠে; আর,

In this way began that odious business of poisoning the peoples, not only of India, but of the whole Orient, with the liquors of the supposed more civilized and 'Christian' West.[১২]

এই সব নানা কারণে কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদন-মূলক মনোভাবের প্রতিকূল একটা অসন্তোষ শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে ধূমায়িত হয়ে ওঠে। তাঁরা বোঝেন এই অবস্থার প্রতিকারের জন্যে জাতীয় শিল্পবাণিজ্য চাই, জাতীয় শিক্ষা চাই। ইংরেজের ইতিহাস পড়ে ক্লাইভকে 'সংস্কৃত নাটকের ধীরোদাত্ত নায়ক' জানলে আর চলবে না।

উনিশ শতকের শেষ দশকের কয়েকটি ঘটনা: উনিশ শতকের শেষ দশকের কয়েকটি ঘটনা ভারতবাসীকে আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠতে প্রেরণা দেয়। বোম্বাই অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ ও প্লেগের প্রচণ্ড আক্রমণের সময় ইংরেজ সরকারের নিষ্ঠুর আচরণে কংগ্রেসেরও কয়েকজন নেতার মনে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। ফলে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকেই মহারাষ্ট্রে গুপ্ত সমিতি সক্রিয় হয়ে ওঠে। 'শিবাজী উৎসব' ও 'গণপতি মেলা'র প্রচলন হয় এই সময়েই। এ-সব আন্দোলনের নেতা হিসেবে সন্দেহ করে সরকার লোকমান্য তিলককে দুবছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন এবং দামোদর চাপেকার ও বালকৃষ্ণ চাপেকারের ফাঁসি হয়। স্বামী বিবেকানন্দও এই সময়ে (১৮৯৭) ভারতে প্রত্যাবর্তন করে বিপুল খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর প্রগতিশীল জীবনাদর্শের প্রেরণায় বহু বাঙালী যুবক জনসেবায় আত্মনিয়োগ করে।

১১ *India in Bondage*—J. T. Sunderland, p. 131.

১২ ঐ—পৃ ১৫৭।

মুস্‌লিম চেতনা ঃ জাতীয়-জাগরণের ইতিহাসের সঙ্গে মুসলমান সম্প্রদায়ের একটা সম্বন্ধ থাকলেও সে সম্বন্ধ খুব সবল নয়। কয়েকজন মুসলমান মনীষী কংগ্রেসের মধ্যে ছিলেন বটে এবং তাঁরা দায়িত্বশীল ভূমিকাও গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু অন্য অনেকের কাছ থেকে জাতীয় অগ্রগতির পথে বাধাও কম আসেনি। সাধারণভাবে এর দুটো কারণ নির্দেশ করা যায়; প্রথমত, মুসলমান সম্প্রদায় শিক্ষায়-দীক্ষায় হিন্দুদের চেয়ে অনেকটা পিছিয়ে থাকায় আন্দোলন সম্বন্ধে তাঁদের মধ্যে অনেক ভুল ধারণা জন্মেছিল এবং দ্বিতীয়ত, আমাদের দেশাত্ম-বোধের মধ্যে দীর্ঘকাল হিন্দুত্বের পরিমাণ ছিল বেশি। মনে হয়, এই দুটি কারণের সুযোগ নিয়েই স্বদেশী আন্দোলনের সময় ইংরেজ সরকার হিন্দু-মুসল-মানের বিচ্ছেদটাকে পাকাপাকি করে তুলতে চেষ্টা করে।

বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন ঃ বাঙালীর বলিষ্ঠ জাতীয়তাবোধের ওপর ইংরেজ সরকারের বরাবরই নজর ছিল। ১৮৯৯ সালে লর্ড কার্জন এদেশে এসেই জাতীয়তাবোধকে দমিয়ে রাখার জন্যে উঠে পড়ে লাগলেন। ১৯০১ সালে শিক্ষা বিভাগের ইংরেজ কর্মচারীদের নিয়ে সিমলায় এক সভা হল, আর তার পরেই বসল 'য়ুনিভার্সিটি কমিশন'। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও এর সদস্য মনোনীত হন। কিন্তু সুফল কিছুই দেখা গেল না। তদানীন্তন ভাইস চ্যান্সেলার পেড্‌লার সাহেব আর চ্যান্সেলার লর্ড কার্জনের অভিসন্ধিই শেষ পর্যন্ত জয়যুক্ত হল। 'য়ুনিভার্সিটি বিল্' পাশ করে তাঁরা বাঙালীর উচ্চ শিক্ষা অর্জনের পথে বিরাট অন্তরায় সৃষ্টি করলেন। ১৯০২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে প্রাচ্য দেশবাসীর স্বভাব সম্বন্ধে কার্জন যা বলেছিলেন তাতে সেদিনের শিক্ষিত বাঙালী-সমাজ ক্ষোভে অধীর হয়ে তার উপযুক্ত প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত দেশের অবস্থার কথা একটুও চিন্তা না করে ১৯০৩ সালে দিল্লীতে দরবার বসল। ভারতবাসীর অজস্র টাকার অপব্যয় হল। এই বছরেই ৩রা ডিসেম্বর 'ক্যাল্‌কাটা গেজেটে' বঙ্গভঙ্গের সরকারী প্রস্তাব প্রকাশিত হয়। বিহার, উড়িষ্যা এবং অখণ্ড বাংলাকে নিয়ে ছিল তখনকার বাংলাদেশ। শাসনকার্যের সুবিধার অজুহাত দেখিয়ে সরকার প্রস্তাব করলেন, আসামের সঙ্গে ঢাকা, রাজসাহী ও চট্টগ্রাম যুক্ত করে একজন পৃথক ছোটলাটের অধীনে 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' নামে নতুন প্রদেশ তৈরী করা হোক, তার রাজধানী হোক ঢাকা; আর বর্দ্ধমান ও প্রেসিডেন্সি

বিভাগ, বিহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুরকে যুক্ত করে তৈরী হোক নতুন বাংলা।

বঙ্গভঙ্গ ইংরেজ-সরকারের divide and rule policy-র একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে একটা স্থায়ী বিরোধ সৃষ্টি করে সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক প্রচেষ্টাকে দমিয়ে দেওয়াই ছিল এর প্রধান উদ্দেশ্য। লর্ড কার্জন নিজেও ঢাকায় গিয়ে মুসলমানদের নানা লোভ দেখিয়ে দলে টানতে চেষ্টা করেছিলেন এবং কিছুটা সফলও হয়েছিলেন।

কিন্তু কার্জনের কূটনীতির চেয়ে শিক্ষিত বাঙালীর সচেতনতা তখন অনেক বেশি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। তাই এই প্রস্তাব প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে কার্জনের গূঢ় অভিসন্ধি বাঙালীর কাছে ধরা পড়ে গেল এবং চারিদিকে তুমুল প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দেই সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় বিখ্যাত 'ডন সোসাইটি'। এই সভায় দেশের বড় বড় মনীষী বক্তৃতা দিতেন।[১৩] কিন্তু জাতীয় জাগরণের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ আন্দোলনটি সুরু হতে তখনো একটু দেরি ছিল।

১৯০৫ সালের ৭ই আগষ্ট বঙ্গবিভাগ কার্যকরী করার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে টাউন হলে এক বিরাট সভা হয়। এই সভায় বিলাতী বর্জনের প্রতিজ্ঞা নেওয়ার পর থেকেই স্বদেশী-আন্দোলনের আরম্ভ।

> Immediately after the official announcement of the Partition Scheme on August 7th. the Hono'ble Maharaja Sir Manindra Chandra Nandi of Kasimbazar presiding over an enormous gathering of the citizens of Calcutta, inaugurated the movement for the boycott of all foreign goods as a measure of retaliation. This movement came to be known in later days as the great Swadeshi movement.[১৪]

---

১৩ এই সভাতেই সমবেত ছাত্রদের কাছে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী আন্দোলন প্রসঙ্গে তাঁর দুটি বিখ্যাত বক্তৃতা দেন। ভাণ্ডার-পত্রিকার আলোচনা দ্রষ্টব্য।

১৪ *Life and Times of C. R. Das*—Prithwis Chandra Roy—p. 39.

আশুতোষ চৌধুরী, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, বিপিনচন্দ্র পাল, নরেন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতি অনেকেই এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। বয়কট বা বিলাতী বর্জনের ওপরেই এই সভায় জোর দেওয়া হলেও মনে রাখা দরকার যে স্বদেশী গ্রহণের ব্যাপারটা তাঁদের কাছে এত প্রয়োজনীয় ছিল এবং সে সম্বন্ধে আগে থেকে দেশবাসীকে সচেতন করে তোলার যে চেষ্টা হয়েছে তাতে আর এর ওপর পৃথক গুরুত্ব আরোপের দরকার হয় নি। অবশ্য বয়কটও 'a measure of retaliation' কিনা সে সম্বন্ধেও পরবর্তী কালে নেতাদের মধ্যে প্রবল মতভেদ দেখা দিয়েছিল।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর (৩০শে আশ্বিন, ১৩১২) সমস্ত বাঙালীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বঙ্গভঙ্গ কার্যকরী করা হয়। কিন্তু বাঙালী তার সমস্ত প্রাণশক্তি দিয়ে এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করল। এই দিনই রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর পরিকল্পনায় 'রাখী-বন্ধন' উৎসবের আরম্ভ। সমস্ত বাঙালী স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে এই উৎসবে যোগদান করে। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং গঙ্গার ঘাটে গিয়ে স্নান করে রাখী বন্ধন করেছিলেন। সে দিনকার এই উৎসবের একটি চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন অবনীন্দ্রনাথ তাঁর 'ঘরোয়া' গ্রন্থে। এখানে সেই বর্ণনার কিছুটা অংশ উদ্ধৃত করার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না,—

> রওনা হলুম সবাই গঙ্গাস্নানের উদ্দেশ্যে, রাস্তার দু'ধারে বাড়ির ছাদ থেকে আরম্ভ ক'রে ফুটপাথ অবধি লোক দাঁড়িয়ে গেছে—মেয়েরা খৈ ছড়াচ্ছে, শাঁক বাজাচ্ছে, মহা ধুমধাম—যেন একটা শোভাযাত্রা। দিনুও ছিল সঙ্গে—গান গাইতে গাইতে রাস্তা দিয়ে মিছিল চল্‌ল—
>
> বাঙলার মাটি বাংলার জল
> বাঙলার বায়ু বাংলার ফল
> পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান্‌।
>
> এই গানটি সে সময়েই তৈরি হয়েছিল। ঘাটে সকাল থেকে লোকে লোকারণ্য। রবিকাকাকে দেখবার জন্য আমাদের চারিদিকে ভিড় জমে গেল। স্নান সারা হলো—সঙ্গে নেওয়া হয়েছিল একগাদা রাখী, সবাই এ ওর হাতে রাখী পরালুম। অন্যরা যারা কাছাকাছি ছিল, তাদেরও রাখী পরানো হলো। হাতের কাছে ছেলে মেয়ে যাকে পাওয়া যাচ্ছে, কেউ

বাদ পড়ছে না, সবাইকে রাখী পরানো হচ্ছে। গঙ্গার ঘাটে সে এক ব্যাপার। পাথুরেঘাটা দিয়ে আসছি, দেখি বীরু মল্লিকের আস্তাবলে কতকগুলো সহিস ঘোড়া মল্‌ছে, হঠাৎ রবিকাকারা ধাঁ ক'রে বেঁকে গিয়ে ওদের হাতে রাখী পরিয়ে দিলেন। ভাবলুম, রবিকাকারা করলেন কী, ওরা যে মুসলমান, মুসলমানকে রাখী পরালে—এইবার একটা মারপিট হবে। মারপিট আর হবে কী। রাখী পরিয়ে আবার কোলাকুলি, সহিসগুলো তো হতভম্ব, কাণ্ড দেখে। আসছি, হঠাৎ রবিকাকার খেয়াল গেল চীৎপুরের বড় মসজিদে গিয়ে সবাইকে রাখী পরাবেন। হুকুম হল চলো সব। এইবারে বেগতিক—আমি ভাবলুম, গেলুম রে বাবা, মসজিদের ভিতরে গিয়ে মুসলমানদের রাখী পরালে একটা রক্তারক্তি ব্যাপার না হয়ে যায় না।···আমরা সব বসে ভাবছি—এক ঘণ্টা কি দেড় ঘণ্টা বাদে রবিকাকারা সবাই ফিরে এলেন। আমরা সুরেনকে দৌড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলুম, কী, কী হলো সব তোমাদের। সুরেন যেমন কেটে কেটে কথা বলে,—বল্‌লে, কী আর হবে, গেলুম মসজিদের ভিতর, মৌলবী-টৌলবী যাদের পেলুম, হাতে রাখী পরিয়ে দিলুম। আমি বললুম, আর মারামারি! সুরেন বললে, মারামারি কেন হবে, ওরা একটু হাসলে মাত্র। যাক্, বাঁচা গেল।[১৫]

এই উৎসব প্রসঙ্গে লিয়াকৎ হোসেনের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রতি বৎসরেই, এমন কি ভাঙা বাংলা মিলিত হয়ে যাবার পরও ইনি অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণায় রাখী-বন্ধন উৎসব পালন করেছিলেন।

১৬ই অক্টোবর তারিখেই 'ফেডারেশন্ হল্' বা মিলন-মন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হয়।[১৬] এই উপলক্ষ্যে এখানে সেদিন যে বিরাট সভা হয়েছিল বাঙালীর স্মৃতিপটে তার ছবি চিরউজ্জ্বল হয়ে আছে। রোগে শয্যাশায়ী, চলৎশক্তিরহিত আনন্দমোহন বসু স্ট্রেচারে করে এসে এই মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেন। সেদিন এই সভায় এক অপূর্ব মনীষী সম্মিলন ঘটেছিল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অম্বিকাচরণ মজুমদার, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল সকলেই উপস্থিত ছিলেন। আনন্দমোহন সেদিন বলেছিলেন,

কু হইতে সু হয়। আজ যে ঐ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ভীষণ মেঘসঞ্চার দেখা

---

১৫ 'ঘরোয়া'-অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাণী চন্দ। পৃ—২৫-২৬।

১৬ বর্তমান আপার সার্কুলার রোডে ব্রহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের উত্তরে।

যাইতেছে, উহার মধ্যে উজ্জ্বল স্বর্ণদীপ্তিও দেখিতে পাইতেছি। আজ বঙ্গে দৃঢ়তর ও গাঢ়তর জাতীয় একতার সূচনা দেখিতে পাইতেছি। আজ আনন্দ ও উল্লাসের দিন।[১৭]

এই দিনেই বাগবাজারে পশুপতি বসুর বাড়িতে আর একটি সভা করে জাতীয় ধন ভাণ্ডার খোলা হয়।

দেহে-মনে দেশবাসীকে শক্ত করে তোলার উদ্দেশ্যে এই সময়েই সরলা দেবী 'বীরাষ্টমী' অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন আর সখারাম গণেশ দেউস্করের উদ্যোগে সুরু হয় 'শিবাজী উৎসব'। আন্দোলন জোরাল হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ সরকারের দমননীতিও ক্রমশ কঠোর হয়ে উঠল। ছাত্ররাই ছিল এই আন্দোলনের আসল কর্মী। তাদের দমন করার জন্যে জারী হল 'কার্লাইল সার্কুলার'; অমৃত বাজার পত্রিকায় তখন এর নাম দেওয়া হয়—'অ্যান্টি স্বদেশী সার্কুলার'।[১৮] সুরু হল জরিমানা, বেত্রদণ্ড আর বহিষ্কার। বর্তমান কর্ণোয়ালিশ ষ্ট্রীটে সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ গৃহের সামনে তখন ছিল 'ফিল্ড্ এণ্ড অ্যাকাডেমি'র বাড়ী। ২৪শে অক্টোবর সেখানে এক সভায় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বিপিনচন্দ্র পাল জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন আবদুল রসুল। কিছুদিন পরে ডন্ সোসাইটিতে এক সভায় রবীন্দ্রনাথও জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেন। এ দিকে সরকারী নির্দেশ অমান্য করার সংকল্প নিয়ে ছাত্ররা গড়ে তোলে 'অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি'। তখন জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটির ওপর নেতাদের আরো গুরুত্ব দিতে হয়। ১৯০৬ সালের ১৫ই আগষ্ট 'ন্যাশনাল কাউন্সিল্ অব্ এডুকেশন্' বা জাতীয় শিক্ষা পরিষদের উদ্বোধন;[১৯] কিন্তু এই পরিষৎ কর্তৃক কলকাতায় জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবার আগেই রংপুরে প্রথম জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয় (২০শে ডিসেম্বর, ১৯০৫)। এ ব্যাপারে সেদিন যাঁরা অক্লান্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রাসবিহারী ঘোষ

১৭ 'ভারতের জাতীয় কংগ্রেস'-গ্রন্থে উদ্ধৃত। হেমেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত, ২য় খণ্ড, পৃ—৩৪।

১৮ দ্রষ্টব্য—*Amrita Bazar Patrika*—27th October, 1905.

১৯ এই পরিষৎ গঠিত হয় ১১ই মার্চ, ১৯০৬ সালে। দ্রষ্টব্য—
Calender : National Council of Education, 1906—08, p. 2.

প্রভৃতির সঙ্গে অরবিন্দ ঘোষের নামও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। যে ত্যাগ-ব্রত গ্রহণ করে ইনি সেদিন স্বদেশ-সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন তার দৃষ্টান্ত বিরল। এই নবভাবের প্রেরণায় বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ১৯০৮ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ১৯টি জাতীয় বিদ্যালয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অনুমোদন লাভ করে[২০]। অবশ্য নানা কারণে পরবর্তীকালে এই সংখ্যা অনেক কমে যায়। অন্যান্য গঠন-মূলক কাজেও বাঙালী এই সময় মেতে ওঠে; চারিদিকে স্বদেশী কাপড়ের কল, জীবন-বীমা কোম্পানী, ব্যাঙ্ক, নানা রকম শিল্প-প্রতিষ্ঠান বাঙালীর উদ্যমে আর পরিচালনায় গড়ে উঠতে থাকে। 'বঙ্গলক্ষ্মী' কাপড়ের কল ও 'বেঙ্গল-কেমিকেলের' জন্ম এই সময়েই। এ ব্যাপারে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের কথা অবিস্মরণীয়।

কংগ্রেসের প্রাচীন-পন্থী নেতারা আবেদন-নিবেদনকেই কর্মসিদ্ধির উপায় বলে গ্রহণ করেছিলেন। প্রগতিশীল নেতাদের সঙ্গে এই উপায় নিয়েই তাঁদের মতবিরোধ দেখা দিল। গড়ে উঠল দুটি দল—Moderate বা নরম-পন্থী আর Extremist বা চরম-পন্থী। বাংলা দেশে দ্বিতীয় দলেরই প্রাধান্য ছিল। কংগ্রেসের দুজন বিখ্যাত চরম-পন্থী নেতা, লালা লাজপৎ রায় এবং লোকমান্য তিলক, ছিলেন এই নয়া বাংলার আদর্শ ও কর্ম-পদ্ধতির সমর্থক। ১৯০৫ সালে কংগ্রেসের বারাণসী অধিবেশনে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গৃহীত হল কিন্তু বয়কটকে পরিষ্কার ভাবে সমর্থন করা হল না, "perhaps the only constitutional and effective means" বলে উল্লেখ করা হয়। প্রকৃতই এটা "a kind of academic opinion"[২১] ছাড়া আর কিছু নয়।

২০ "The following National Schools were affiliated to the Council during the year up to the Fifth Standard.

1. Jalpaiguri, 2. Giridih, 3. Kamargram, 4. Santipur, 5. Jessore, 6. Noakhali, 7. Rajshahi, 8. Sylhet, 9. Maldah.

These added to the National Schools at Dacca (which is affiliated up to the Seventh Standard) and those at *Rangpur, Dinajpur, Comilla, Mymensingh, Kishorgunj, Chandpur, Khulna, Magura, and Majpara* (*Dacca*) (all of which are affiliated up to the Fifth Standard) made the total number of affiliated institutions 19 on the 31st December 1908, of which the Giridih National School has been dissolved in January 1909."

Report of the National Council of Education, Bengal, 1908. pp. 3-4.

২১ *The History of the Indian National Congress*—Pattabi Sitaramayya, Vol. I, p. 43.

কিন্তু লালা লাজপৎ রায় এই প্রস্তাবের সমর্থনে সেদিনেই বলেছিলেন যে, আমরা যে ভিক্ষুক নই এ কথা প্রমাণ করার প্রয়োজন হয়েছে। ১৯০৬ সালে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে অবশ্য বয়কটকে মেনে নিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়,—

> ...Having regard to the fact that the people of this country have little or no voice in its administration and that their representations to the Government do not receive due consideration, this Congress is of opinion that the boycott movement inaugurated in Bengal by way of protest against the Partition of that Province, was and is, legitimate.[২২]

পরের বছর (১৯০৭) সুরাটে কংগ্রেস অধিবেশনে নরম ও চরম-পন্থীদের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ সৃষ্টি হয় এবং ভীষণ গণ্ডগোলের ফলে অধিবেশন পণ্ড হয়ে যায়। এই সময় থেকে কংগ্রেস আবার বয়কটকে অস্বীকার করেন, তবে স্বদেশী-গ্রহণের নীতিকে মেনে চলেন।

স্বদেশী-গ্রহণ ও বিদেশী-বর্জনের কাজে সারা বাংলা তখন চঞ্চল হয়ে উঠে। কলকাতায় 'বন্দেমাতরম্ সম্প্রদায়' 'স্বদেশ-সমিতি' পূর্ববঙ্গে 'সুহৃদ-সমিতি' প্রভৃতি নানা সংঘ গড়ে ওঠে এবং আন্দোলনকে চালিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে প্রচুর অর্থ সংগৃহীত হয়।

পূর্ববঙ্গে স্বদেশী আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। বরিশাল ছিল এই আন্দোলনের একটা বড় কেন্দ্র। ১৯০৬ সালে এখানে প্রাদেশিক সম্মেলনের আয়োজন হয়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অম্বিকাচরণ মজুমদার, বিপিনচন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাশ, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, মতিলাল ঘোষ, অরবিন্দ ঘোষ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, অশ্বিনীকুমার দত্ত, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, সুবোধ মল্লিক, কৃষ্ণকুমার মিত্র, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সে সময়ের স্বদেশী আন্দোলনের প্রধান পরিচালকেরা সকলেই এখানে সমবেত হন। সভাপতি হিসাবে মনোনীত হন আবদুল রসুল। এই সময় সরকার বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করা নিষিদ্ধ করে দেন, এই নিষেধ অমান্য করার ফলে

২২ *The Indian National Congress*—G. A. Natesan & Co., Madras. Part II, p. 123.

পুলিশ প্রচণ্ড লাঠি চালনা করে। মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার পুত্র চিত্তরঞ্জনকে একটা পুকুরের মধ্যে ফেলে দারুণ প্রহার করা হয়। মার খেতে খেতে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে, তবু শেষ পর্যন্ত তার মুখ থেকে পুলিশ বন্দেমাতরম্ ধ্বনি কেড়ে নিতে পারেনি। এই আন্দোলনের সময় থেকেই বন্দেমাতরম্ বাঙালীর কাছে শক্তিমন্ত্র হয়ে দাঁড়াল।

১৯০৬ সালে বরিশালে এই নিদারুণ পুলিশী অত্যাচারের ফলে অনেকের মনেই তীব্র ইংরেজ-বিদ্বেষ জেগে উঠল এবং বিলাতী-বর্জনের সঙ্গেও এই বিদ্বেষের কিছুটা মিশ্রণ ঘটল। তখন নেতাদের মধ্যে মতভেদটাও বেশ জোরাল হয়ে ওঠে। একদল এই নীতিকে সমর্থন করে বললেন, বয়কট্ মোটেই বিদ্বেষমূলক নয়, যদি এতে কিছু বিদ্বেষ এসেও থাকে তার জন্যে দায়ী ইংরেজ সরকার। কারণ অর্থনীতির দিক থেকে স্বদেশীর সঙ্গে বয়কট্ অপরিহার্য। আর একদল বললেন, বয়কটের জন্মই বিদ্বেষের মধ্যে আর স্বদেশী অর্থনীতির সঙ্গে এর যতটুকু যোগ তা বাদ দিয়েও আমরা স্বদেশী শিল্পকে গড়ে তুলতে পারি যদি কাজে আমাদের নিষ্ঠা থাকে।

স্বদেশী আন্দোলনের ফলে মুসলিম্ প্রতিক্রিয়া : স্বদেশী আন্দোলনের ফলে মুসলমানদের মধ্যে, বিশেষ করে পূর্ববঙ্গে, যে প্রতিক্রিয়া জাগে তাতে আন্দোলনের স্রোত অনেকখানি ব্যাহত হয়। ১৯০৬ সালে ঢাকার নবাবের নেতৃত্বে একদল মুসলমান মিলিত হয়ে বঙ্গভঙ্গের প্রতি তাঁদের সমর্থন জ্ঞাপন করেন; এবং এই বছরেই বড়লাট মিণ্টোর কাছে মুসলমানদের জন্যে স্বতন্ত্র নির্বাচন-ব্যবস্থার দাবিতে আগা খাঁ এক প্রস্তাব পাঠান। ১৯০৯ সালে মলি-মিণ্টো সংস্কারে এই প্রস্তাব গৃহীত ও কার্যকরী হয়। সরকার মুসলমানদের জন্যে স্বতন্ত্র নির্বাচনের ব্যবস্থা (Separate Electorate) করেও সাধারণ নির্বাচনের সুবিধাও তাঁদের ভোগ করতে দেন এবং এইভাবে সাম্প্রদায়িকতার চরম প্রশ্রয় দেওয়া হয়। ১৯০৬ সালে ঢাকায় মুসলমানদের সম্মিলনেই 'মুসলিম লীগের' জন্ম, কিন্তু এই লীগ সক্রিয় হয়ে ওঠে ১৯০৮ সাল থেকে। 'হিন্দুমহাসভা'ও স্থাপিত হয় ১৯০৬ সালে।

স্বদেশী আন্দোলনের পরিসমাপ্তি : ইংরেজী ও বাংলা অনেকগুলি পত্রিকা এই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে যথেষ্ট সাহায্য করে। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য—বন্দেমাতরম্, নিউ ইণ্ডিয়া, সঞ্জীবনী, বঙ্গবাসী, নবশক্তি,

নির্যাতিতে আশীর্ব্বাদ।

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অঙ্কিত মূল তৈল চিত্র হইতে।

KUNTALINE PRESS, CALCUTTA.

সন্ধ্যা, হিতবাদী ও যুগান্তর। মাসিক পত্রিকাগুলির মধ্যে নাম করা যায়—বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়), ভারতী, প্রবাসী, ভাণ্ডার, নব্যভারত ও সাহিত্য। সাধনা পত্রিকাটি এই আন্দোলনের জন্যে আগে থেকেই ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রাখে। এই পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত বিভিন্ন রচনা থেকে তৎকালীন সন্ত্রাসবাদ কিছুটা শক্তি সঞ্চয় করেছিল। অবশ্য বাংলা দেশে সন্ত্রাসবাদী ভাবধারার সূচনা বিশ শতকের সুরুতেই। অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, ব্যারিষ্টার প্রমথনাথ মিত্র, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি নেতাদের প্রচেষ্টায় ১৯০২ সাল থেকেই বাংলায় গুপ্ত-সমিতি সক্রিয় হয়ে ওঠে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সঞ্জীবনী সভা' যত হাস্যকর বা ব্যর্থই হোক, এ ব্যাপারে তখনকার সন্ত্রাসবাদী নেতাদের মধ্যে বাস্তব বুদ্ধি ও কর্ম-পরিকল্পনা গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। অবশ্য বিদেশী ভাবধারাই যে সন্ত্রাসবাদীদের মূল প্রেরণা ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সন্ত্রাসবাদ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠায় সরকারী দমন নীতিও প্রচণ্ড হয়ে ওঠে। একদিকে বোমা, ডাকাতি আর হত্যা, অন্যদিকে কারাদণ্ড, নির্বাসন ও ফাঁসি। আলিপুর, হাওড়া, খুলনা, ঢাকা, বরিশাল, প্রভৃতি স্থানের ষড়যন্ত্র মামলাগুলি বাংলা দেশে বিপ্লব-প্রচেষ্টার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে, আর সেই সঙ্গে এই সময়ের রাজনৈতিক ইতিহাসের পাতায় জীবন্ত হয়ে আছে কয়েকটি নাম—ক্ষুদিরাম বসু, প্রফুল্ল চাকী, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, কানাইলাল দত্ত, রাসবিহারী বসু ইত্যাদি। সন্ত্রাসবাদের চাপে পড়ে স্বদেশী আন্দোলন ক্রমশ স্তিমিত হয়ে আসে। ১৯১১ সালে উভয় বঙ্গ আবার মিলিত হয়ে গেলে স্বদেশী আন্দোলনের গতি আরো কমে যায়। ১৯১৪ সালে সুরু হল প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধ আর এই সময় থেকেই গান্ধীজীও ভারতের রাজনীতিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। সেই রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে স্বদেশী আন্দোলনের প্রকৃতিও মিশে এক হয়ে যায়।

স্বদেশী আন্দোলনের প্রকৃতি

"It was in 1905, then, that the Indian Revolution began."

A case for India: Will Durant. P—123.

১৯০৫ সালে এই বাংলার মাটিতেই ভারতীয় বিপ্লবের সূচনা। বঙ্গভঙ্গ-জনিত আলোড়ন সেদিন ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ে।[১] ফলে জাতীয় সংগ্রামের পদ্ধতি এবং দেশের অবস্থার মধ্যে কয়েকটি মৌলিক পরিবর্তন দেখা দেয়।

স্বদেশী আন্দোলন কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। এর পূর্ব-প্রস্তুতির কথা আগে আলোচিত হয়েছে। এখন এই আন্দোলনের প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার।

উনিশ শতকে যে-কটি আন্দোলন গড়ে উঠেছিল সেগুলির একটিও সুপরিকল্পিত নয়, এবং মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কোন বিশেষ সমস্যার মীমাংসাই ছিল সেগুলির উদ্দেশ্য। সাধারণভাবে দেশের সমাজ বা অর্থনীতির সঙ্গে সেগুলির বিশেষ কোন যোগ ছিল না। রামমোহন রায়ের সময় থেকে যে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের ধারাটি সুরু হয় কংগ্রেস সেই ধারাটিকেই এগিয়ে নিয়ে গেছেন। লক্ষ্য করার বিষয়, কংগ্রেসের অন্তর্গত অনেক বাঙালী নেতা বঙ্গভঙ্গের আগে থেকেই কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদনের নীতিকে সমর্থন করতে পারতেন না। বঙ্গভঙ্গকে উপলক্ষ্য করে তাঁরা তাদের নিজস্ব চিন্তা-ধারণাকে রূপ দিতে চাইলেন।

আত্মশক্তির ভিত্তিতে গড়ে-ওঠা স্বদেশী আন্দোলন ভারতের প্রথম ব্যাপক জাতীয় আন্দোলন। Dr. M. A. Buch, M. A. Ph. D. তাঁর *Rise and Growth of Indian Liberalism* গ্রন্থে স্বদেশী আন্দোলনের যে প্রকৃতি বিচার করেছেন তা খুবই যুক্তি-সংগত। আমরা এখানে তাঁরই মতের অনুসরণ করব।

১ দ্রষ্টব্য—*The History of the Indian National Congress*, Dr. Pattabi Sitaramayya, Vol. I, p. 43.

গঠনমূলক স্বাদেশিকতা : বিলাতী-হৃদয়ের স্বদেশ-প্রেম সম্বন্ধে বাঙালী সচেতন হতে সুরু করেছে স্বদেশী আন্দোলনের অনেক আগে থেকেই। কিন্তু এই সচেতনতা গঠন-মূলক কর্ম-পদ্ধতির মধ্যে সার্থক হয়েছে আন্দোলনের সময়ে। আগে যে স্বদেশ-প্রেম ছিল একটা আইডিয়া মাত্র আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে বাঙালী তাকেই কর্মে রূপ দিলে। প্রেমকে অন্তর্মুখী করে দোষে-গুণে অখণ্ড দেশটাকে হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করার সক্ষমতার মধ্যেই স্বাদেশিকতার সার্থকতা এ উপলব্ধি স্বদেশী আন্দোলন দেশবাসীকে দিয়েছে। বিজাতীয় সংস্কার-ধারণার বশবর্তী হয়ে বাইরে থেকে দেশের দুর্গতি দূর করার চেষ্টা শক্তির অর্থহীন অপচয় মাত্র। যদি সত্যই দেশের উন্নতিসাধন করতে হয় তবে তার সমস্ত দোষ-গুণের মধ্যে দাঁড়িয়েই তা করতে হবে। একপাশে সরে থেকে বা পশ্চিম-বিলাসী মনের অনুকম্পা নিয়ে সে উন্নতি কিছুতেই সম্ভব নয়। এই চেতনার মধ্যে দিয়ে স্বাদেশিকতা যে নতুন রূপ লাভ করল তার প্রকৃতি বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছেন,

> This new love is not as of old, a vague sentiment and a fairy fancy,...but something real and true, not merely a subjective attitude but something that yearns for an objective expression and realisation, through acts and symbols, as always happen with all real and true love.[২]

দেশপ্রেমের এই অনুভূতিতেই স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাঙালী শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য, সংগীত, ব্যবসা-বাণিজ্য, পল্লী-সংগঠন প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে নতুন করে দেশ গড়ার এক সর্বাত্মক প্রচেষ্টা সুরু করে ; সে কর্মাদর্শ অল্পদিনের মধ্যেই ভারতের অন্যান্য প্রদেশও তার কাছ থেকে গ্রহণ করেছিল। এইখানেই স্বদেশী আন্দোলনের প্রকৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। অবশ্য আবেদন-নিবেদন বা নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলনও বন্ধ হয় নি ; কারণ একদল নেতা মনে করতেন, দেশ গঠনের এই সমস্ত প্রচেষ্টার সঙ্গে সরকারকেও তার কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা চাই।

২ *Swadeshi and Swaraj,* Bipin Chandra Pal, pp. 18-19.

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, স্বদেশী আন্দোলনের সময় স্বাদেশিকতা আর শুধু উপলব্ধির বস্তু রইল না, কর্মে রূপায়িত হল; আইডিয়া হল অ্যাক্‌শন্‌। আন্দোলনের এই প্রকৃতিটি সম্বন্ধে Dr. Buch লিখেছেন,

> The Swadeshi movement, therefore, became the rallying cry of all India. It opened a field for the expression, in a practical form, of the patriotic spirit of every Indian—a form equally in the interests of all classes and castes. It marked, therefore, a turning point in history of the Indian national movement. The national struggle ceased to be merely a verbal agitation—a fight on the platform or in the press; it began to assume a practical form.[৩]

গণ-সংযোগ : স্বদেশী আন্দোলন শুধু শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না, দেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গেও এর একটা সংযোগ ছিল, অর্থাৎ আন্দোলনের রূপটি শ্রেণীগত নয়। তবে প্রকৃত গণ-আন্দোলনও একে বলা চলে না। কারণ, অশিক্ষিত সাধারণ মানুষ এতে কিছুটা অংশগ্রহণ করলেও সম্পূর্ণ সচেতনভাবে করে নি। বঙ্গভঙ্গের মধ্যে দিয়ে দেশে যে প্রচণ্ড আলোড়ন দেখা দেয় তা অনেক অশিক্ষিত পল্লীবাসীর হৃদয়কেও স্পর্শ করেছিল এ কথা ঠিক; আর এই স্পর্শগুণে সৃষ্ট আবেগের সুযোগ নিয়ে শিক্ষিত সম্প্রদায় দেশের সমস্যা সম্বন্ধে তাদের সচেতন করে তুলতে চান; এবং এ ব্যাপারে তাঁরা যে সামান্য পরিমাণে হলেও সফল হয়েছিলেন সে কথা অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং

> The Swadeshi movement was precisely an effort to interest the masses of the country actively in her problems.[৪]

আত্মশক্তির বিকাশ : কবি বিজয়চন্দ্র মজুমদার স্বদেশী আন্দোলনের সময় দেশবাসীকে ডাক দিয়ে বলেছিলেন,—"কর্মের 'পর, নির্ভর কর্, এজগতে

---

৩ *Rise and Growth of Indian Liberalism*—Dr. M. A. Buch, M.A., Ph.D., p. 227.

৪ ঐ—পৃ ঐ।

যদি বাঁচিবি।" বঙ্কিমচন্দ্র বিবেকানন্দ প্রমুখ মনীষীরা বাঙালীকে যে আত্মশক্তির বাণী শুনিয়েছিলেন স্বদেশী আন্দোলনের সময় তার প্রকৃত সার্থকতা আমরা লক্ষ্য করি। দেশপ্রেমের আবেগে এমন কর্ম-চাঞ্চল্য এর আগে আর দেখা যায় নি। দুঃখ-দুর্দশার হাত থেকে মুক্তিলাভের জন্য দেশবাসী আর সরকারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল না, দৃষ্টি ফেরাল নিজের দিকে। দেশবাসীর চিত্তে আত্মমর্যাদা আর আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে রবীন্দ্রনাথ সেদিন যে ক্লান্তিহীন প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন সে কথা স্মরণ করে পরবর্তীকালে তিনি বলেছিলেন—

> আবার সেযুগে ফিরে গিয়ে নিজেকে দেখতে পাচ্ছি। ওইখানেই পরিপূর্ণ আমি। পরিপূর্ণ আমাকে লোকেরা চেনে না—তারা আমাকে নানাদিক থেকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেখেছে। তখন বেঁচেছিলুম, আর এখন আধমরা হয়ে ঘাটে এসে পৌঁচেছি।[৫]

স্বদেশী আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথ নিজের শক্তিকেও যে কতখানি উপলব্ধি করেছিলেন এই উক্তিই তার প্রমাণ।

আত্মবিশ্বাসের ওপর নির্ভর করেই দেশবাসী সেদিন নানা ব্যবসা-বাণিজ্যের ভিতর দিয়ে দেশের অর্থনীতিকে স্বদেশী গড়ন দিতে চেষ্টা করেছিল। অবশ্য সে চেষ্টা যে আগে হয়নি এমন নয়, তবে স্বদেশীযুগে যেভাবে হয়েছে সেভাবে কখনো হয়নি। আগে এ চেষ্টার রূপ ছিল একান্তভাবে ব্যক্তিগত, বিচ্ছিন্ন ও অসার্থক; কিন্তু স্বদেশীযুগের এ চেষ্টা হল সমষ্টিগত, সংযুক্ত ও সার্থক। (এর সার্থকতা সম্বন্ধে আজ প্রশ্ন উঠতে পারে এবং সে প্রশ্ন খুব সংগতও হতে পারে, কিন্তু এই প্রচেষ্টার ফলে আমরা কিছুটা যে লাভবান হয়েছি তা অস্বীকার করা যায় না); স্বদেশী আন্দোলনের এই বৈশিষ্ট্যটি বিচার করতে গিয়ে Dr. Buch লিখেছেন,

> The Swadeshi movement was essentially a movement of self-reliance. It was the first serious attempt on the part of the Indians to take their economic destinies into their own hands.[৬]

৫ 'ঘরোয়া'—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাণী চন্দ, পৃ-৮

৬ *Rise and Growth of Indian Liberalism*—Dr. M. A. Buch, M.A., Ph.D., pp. 227-28.

স্বদেশী আন্দোলনের সময় দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্যে যে নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল তা সম্পূর্ণ অহিংস এবং দেশবাসীর সদিচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। এইদিক থেকেও এই নীতির একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। পৃথিবীর নানা দেশেই এই ধরণের জাতীয়-প্রচেষ্টা দেখা যায়। কিন্তু সে-সব প্রচেষ্টার সঙ্গে স্বদেশী যুগে আমাদের দেশের এই প্রচেষ্টার একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। দেশজ শিল্পকে গড়ে তোলার জন্যে প্রাথমিক অবস্থায় যে সংরক্ষণনীতির একান্ত প্রয়োজন থাকে, এবং সে সময় ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, আমেরিকা প্রভৃতি সমস্ত স্বাধীন দেশই নানা ভাবে যে নীতির আশ্রয় গ্রহণ করেছিল, পরাধীন দেশে তার কোন সুযোগ নেওয়া সম্ভব ছিল না। আর ছিল না বলেই স্বদেশী-গ্রহণের সঙ্গে বিদেশী-বর্জন বা বয়কটের প্রশ্ন খুব সংগতভাবেই এসে পড়েছিল। নানা প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে প্রাণপণে সংগ্রাম চালিয়ে এই কর্ম-প্রচেষ্টা সেদিন যে-পরিমাণে জয়যুক্ত হয়েছিল তার জন্যে শুধু বাঙালী নয়, সমগ্র ভারতবাসীই গৌরবান্বিত।

কিন্তু এই আন্দোলন যে সম্পূর্ণ সার্থকতা অর্জন করতে পারে নি তার একমাত্র কারণ হল এই গঠনমূলক কর্মসাধনার পথে এগিয়ে যাওয়ার অক্ষমতা। নেতাদের মধ্যে রাজনৈতিক মতানৈক্যই ছিল এই অগ্রগতির অন্তরায়। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী-সমাজ গড়ার কর্মসূচী সেদিন অনেকেরই মনঃপূত হয় নি। তাই দেখা গেল, সন্ত্রাসবাদী কার্য-কলাপ সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জাতীয় বিদ্যালয়গুলি তার এক একটি কেন্দ্র হয়ে উঠল—শিক্ষা-চর্চার স্থান নিল সন্ত্রাসবাদ-চর্চা। কিন্তু সন্ত্রাসবাদও যে সফল হতে পারল না, 'স্বদেশী'-র ব্যর্থতাই তার কারণ। সেই শক্তিরই বাহ্যিক প্রকাশ সার্থক হয় উৎস যার অন্তরে। সন্ত্রাসবাদীদের শক্তির সঙ্গে দেশের নাড়ীর কোন যোগ ছিল না। আয়ারল্যাণ্ডের জাতীয় জাগরণের যে আদর্শ তখন বাংলা দেশের অনেক নেতা গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের কাছে সে আদর্শের পরম সত্যটি উপেক্ষিত হয়েছিল। আয়ারল্যাণ্ডে একদিকে যেমন চলেছিল সিন্‌ফিন্‌ আন্দোলন অন্যদিকে তেমনি গঠনমূলক কাজও অব্যাহত ছিল—প্রতিটি গ্রামে, প্রতিটি পল্লীতে। কিন্তু বাংলা দেশে তা হয় নি, হয়তো তা সম্ভবও ছিল না।

স্বদেশী আন্দোলন ও সাহিত্য-চিন্তা

সাহিত্যিকের জীবন-সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যম হল সাহিত্য। বলা যায়, সাহিত্য তাঁর এই অভিজ্ঞতারই শিল্প-রূপ। জীবন গতিশীল, তাই পরিবর্তনধর্মী। নানা কারণের আন্তরক্রিয়ায় যখন দেশের অবস্থার রূপান্তর ঘটে, জীবনের রূপও তখন বদলে যায়। আর সেই সঙ্গে বদলায় সাহিত্যিকের অভিজ্ঞতা ও রস-চেতনা। তাই যুগে যুগে নতুন সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে।

সামাজিক, অর্থনীতিক বা রাজনীতিক অথবা এ তিনেরই সম্মিলিত কোন কারণে জাতির জীবনে যখন আলোড়ন জাগে তখন সেই বিক্ষেপ সাহিত্যিকের চিন্তাকেও গভীরভাবে স্পর্শ করে। দেশকালের সেই পরিবর্তিত রূপ থেকে তিনি লাভ করেন নতুন অভিজ্ঞতা, নতুন জীবনদর্শন। ফলে তাঁর চিন্তার আঙ্গিক যায় বদলে, আর তাঁর অনুভূতি আত্মপ্রকাশের নতুন পথ খোঁজে। এটা সাময়িক, একান্তভাবেই যুগধর্মী, তবু সাহিত্যে এর এক বিশেষ মূল্য আছে।

উনিশ শতকের বাংলায় যা ঘটেছিল সেটা বিপ্লব নয়, জাগরণ। সে শুধু ঘুম থেকে জেগে-ওঠা, আর জেগে উঠে এগিয়ে চলা। এ চলায় হিসাব আছে, বিচার-বিশ্লেষণ আছে, গ্রহণ-বর্জন আছে, অতীত ও বর্তমানকে মিলিয়ে নেবার চেষ্টা আছে। জন-চিত্তে জাতীয়তাবোধ সঞ্চারের ব্যাপারে তাই সে সময়ের সাহিত্যে ঐতিহ্য-চর্চার বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

কিন্তু বঙ্গভঙ্গের আঘাতে বাঙালীর জীবনে যখন একটা প্রচণ্ড সংক্ষোভ জাগল তখন তার ধাক্কায় সাহিত্যিকের চিন্তা-জগতেও ঘটল একটা পরিবর্তন। জাতির সংকট তাঁকে ভাবিয়ে তুলল। এ ভাবনা আর আগের মতো নয়। কারণ জাতির সংকটময় মুহূর্তে সংস্কারের চেয়ে সংগ্রামের প্রয়োজন গুরুতর। তাই এই সময়ের সাহিত্য-চিন্তা আত্মপ্রকাশের যে নতুন পথ ধরল তাতে ঐতিহ্য-চর্চার মধ্যে দিয়েও সাহিত্যিকের সংগ্রামী মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বিশেষ করে কবিতা, গান ও নাটকের মধ্যে এই সময়ের সাহিত্য- চিন্তার রূপটিকে পরিষ্কারভাবে ধরা যায়। দেশাত্মবোধের কবিতা ও গান আগেও লেখা হয়েছে, কিন্তু স্বদেশীযুগের লেখার সঙ্গে সেগুলির একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। এ পার্থক্য ধরা পড়ে বাচনভঙ্গি ও বিষয়-চিন্তায়। বিদ্রূপাত্মক কবিতা

ও গানগুলির কথাই এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নিছক হাসির কবিতা বা গান হিসাবে এগুলিকে গ্রহণ করা যায় না। দেশের অবস্থা বদলেছে, কবির অভিজ্ঞতা বদলেছে আর বদলেছে তাঁর চিন্তারীতি। স্বদেশের ভাবনা তাঁর হৃদয়ের মধ্যে এমন কঠিনভাবে দানা বেঁধে উঠেছে যে সেখানে আর হাল্‌কা হাসির জায়গা নেই। দেশবাসীর নির্বুদ্ধিতা, কাপুরুষতা আর মানসিক অসাড়তা-জনিত সহনশীলতাকে কবি আঘাত করতে চান। এই আঘাত করাটাই তাঁর উদ্দেশ্য। তাই হাস্যরসের প্রলেপ মাখিয়ে কবিতা-গানের তীর ছুঁড়েছেন। পাঠকও তাই প্রথমটা হেসে উঠেই ব্যথার মোচড় খায়। তার মন তখন গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসে।

পা-উঁচিয়ে কর রোষ
ঘন ঘন মার কিক্ ;
আইন খুলে তস্য দোষ
দেখাই মোরা তাকিক।

অথবা

বিপত্তিতে মাচার তলে খোকার মায়ের আঁচল।

এসব কবিতায় হাস্যরস থাকলেও হাসির আমেজ প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কেটে যায়। তখন ভাবতে হয়—এই তো অবস্থা।

এ যুগের সাহিত্যে বিশেষ লক্ষণীয় হল গান। সক্ষম অক্ষম অনেকেই সে সময় গান লেখায় হাত দিয়েছেন। কিন্তু এত গান কেন লেখা হল। এর একটা কারণ আছে। সাহিত্য মাত্রেই ক্রিয়াধর্মী। সমস্ত সাহিত্যের মধ্যে দিয়েই পাঠকের অন্তরে একটা মানস-ক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। না হলে সাহিত্যের কোন মূল্যই থাকত না। এ ক্রিয়ার প্রকৃতি সাহিত্যের প্রকৃতির ওপরেই নির্ভরশীল। কিন্তু সংগীতের মধ্যে এই ক্রিয়াধর্ম সবচেয়ে বেশি। প্রবন্ধ, গল্প আর উপন্যাস বসে পড়ার জিনিস। কিন্তু দরকার হলে গান গেয়ে নগরী আর পল্লীর পথে পথে ঘোরা যায়, পুরবাসী আর পল্লীবাসীর দরজায় গিয়ে আঘাত করা যায়, যে আঘাতে তাদের মনের দরজাও খুলে যেতে পারে। তাই স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে দেশে যে প্রক্ষোভ (emotion) জেগেছিল তাকে জনচিত্তে সঞ্চারিত করার সবচেয়ে সহজ ও শক্তিশালী মাধ্যম হিসাবে সংগীতের সাহায্য এত বেশি করে নেওয়া হয়েছে।

ঠিক এই কারণেই সাহিত্যিকরা তখন নতুন করে নাটক লেখাতেও হাত দিয়েছিলেন। নাটকও শুধু পড়ার জিনিস নয়, এর সঙ্গে আরো দুটো ক্রিয়ার যোগ আছে—করা এবং দেখা। আর শেষের ক্রিয়া দুটোই মুখ্য। অভিনয়ের জন্যেই নাটক লেখা হয়, পড়ার জন্যে নয়। জনচিত্তে সোজাসুজিভাবে প্রক্ষোভ সঞ্চারের এটাও একটা বড় উপায়।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় নতুন স্বদেশ-চেতনা নিয়ে আবির্ভূত হয় ঐতিহাসিক নাটকগুলি। ঐতিহাসিক নাটকের সে এক যুগান্তর। নাট্যকারেরা পুরাণচর্চা ছেড়ে সুরু করলেন ইতিহাসচর্চা। অবশ্য ইতিহাসের ভিত্তিতে দেশপ্রেম-মূলক নাটক আগেও লেখা হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পুরুবিক্রম' (১৮৭৪), 'সরোজিনী' (১৮৭৫) এবং 'অশ্রুমতী'র (১৮৭৯) কথা স্মরণ করা যায়। কিন্তু ইতিহাস-নিষ্ঠা, দেশপ্রেমের প্রকৃতি, নাটকীয় আঙ্গিক ও পরিবেশ রচনার দিক থেকে এগুলির সঙ্গে স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে লেখা নাটকগুলির গুরুতর পার্থক্য আছে। প্রসঙ্গের মধ্যে নাটক সম্বন্ধে আলোচনায় এই পার্থক্যটি ধরা পড়বে।

গল্প-উপন্যাসে এই আন্দোলনের প্রভাব নিতান্তই অল্প। আন্দোলনকে বিষয়-বস্তু করে মাত্র কয়েকটি গল্প ও দুএকটি উপন্যাস রচিত হয়। কারণ জনচিত্তে উত্তেজনা বা প্রক্ষোভ সঞ্চারের কাজে এই জাতীয় লেখা মোটেই উপযুক্ত মাধ্যম নয়। তাছাড়া শুধু আন্দোলনকে বিষয়-বস্তু করে ভালো গল্প-উপন্যাস লেখাও সম্ভব ছিল না। তাই দেখা যায়, দুএকটি ছাড়া, স্বদেশীযুগে রচিত নাটকগুলির উপাদান ঐতিহাসিক।

আর প্রবন্ধ যা লেখা হয়েছে সেগুলিও রাজনৈতিক আলোচনা জাতীয়। কিছু কিছু প্রবন্ধ প্রায় কর্মসূচীর মতো; দেশের তদানীন্তন অবস্থায় লেখক দেশবাসীকে যেন প্রোগ্রাম দিয়েছেন। তবে এই জাতীয় লেখাও কারো কারো হাতে অপূর্ব সাহিত্য-রূপ লাভ করেছে। তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন রবীন্দ্রনাথ।

এখানে আর একটা কথা বলে নেওয়া দরকার। স্বদেশী আন্দোলনের সময় উত্তেজনা-মূলক লেখার পরিমাণ নেহাত কম নয়। এই সমস্ত লেখা পড়লে মনে হয় দেশে একটা বৈপ্লবিক জাগরণ লেখক চাইছেন। ইংরেজের অত্যাচারে জর্জরিত দেশবাসীর অবস্থা দেখে কবি যখন সক্ষোভে প্রশ্ন করেন,

কৃষ্ণ হস্তে শাণিত অস্ত্র
ধরিবি কিনা ?
নাশিয়া অরির ঘৃণিত শরীর
মরিবি কিনা ?

তখন একথা স্পষ্টই বোঝা যায় একটা রক্তাক্ত বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানকে কবি স্বাগত জানাচ্ছেন। স্বদেশী আন্দোলনের গোড়ার দিকে বিভিন্ন পত্রিকায় গদ্যে-পদ্যে এই ধরণের মনোভাব বেশ প্রকট হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সন্ত্রাসবাদ ক্রমশ জোরাল হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই এই জাতীয় লেখার সংখ্যা অনেক কমে যায়। লক্ষ্য করার বিষয় যাঁরা আগে লেখার মধ্যে দিয়ে উত্তেজনার আগুন ছড়িয়েছিলেন তাঁরাই আবার শান্তিজল ছেটাতে স্থরু করলেন। অনেকগুলি মাসিকপত্রিকাও তখন স্থর পরিবর্তন করেছিল। এই পরিবর্তনটা ১৩১৪-১৫ সাল থেকে ধরা পড়ে— অর্থাৎ যে সময় থেকে চারিদিকে হত্যা, ডাকাতি, কারাদণ্ড আর ফাঁসি দেশের স্বাভাবিক অবস্থাকে একেবারে বিপর্যস্ত করে দিলে। এই স্থর পরিবর্তনের কারণ মনে হয় বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান সম্বন্ধে লেখকের ধারণার অস্পষ্টতা। সাময়িক উত্তেজনায় তাঁরা এত বেশি বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন যে সন্ত্রাসবাদ শক্তিশালী হয়ে উঠলে তার পরিণতি যে কি রকম হতে পারে, দেশের সাধারণ মানুষ এই অভ্যুত্থানের জন্যে প্রস্তুত হয়েছে কিনা, না হলে শুধু মুষ্টিমেয় শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সন্ত্রাসবাদী নেতৃত্ব কতটা সফল হবে, এ সব প্রশ্ন তাঁরা পরিষ্কার ভাবে চিন্তা করেন নি।

কিন্তু এখানে এই রাজনৈতিক বিচারের অবকাশ নেই। এ কথা সত্য যে, স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে যে নতুন স্বদেশ-চেতনা জন্মলাভ করেছিল তখনকার বাংলা সাহিত্য তার গৌরবোজ্জল পরিচয় বহন করছে।

প্রসঙ্গ ঃ ১৩০৮—১৩২১

মাসিক পত্রে সমসাময়িক রচনাবলী

বঙ্গদর্শন—নব পর্যায়

সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্র-প্রতিভার বিশ্বরূপের মধ্যে তাঁর এ পরিচয়টিও নেহাত তুচ্ছ নয় পত্রিকা সম্পাদনা ব্যাপারটি যে তাঁর সাহিত্যী-প্রতিভা বিকাশের পথে আনুকূল্য করেছিল এ-কথা অস্বীকার করা যায় না। এই কাজের মধ্যে দিয়েই অনেক সাহিত্যিকের জীবনে সৃষ্টি-শক্তির নতুন প্রেরণা এসেছে। রবীন্দ্রনাথের জীবনেও। বিভিন্ন সময়ে পাঁচটি পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে তাঁর নাম পাওয়া যায়[১]। নবপর্যায় বঙ্গদর্শনের সঙ্গেই সম্পাদক হিসাবে তাঁর যোগসূত্রের কালটি দীর্ঘতম এবং তাঁর স্বাদেশিকতা-মূলক রচনার পরিমাণও এই পত্রিকাতেই সর্বাধিক।

বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর থেকেই[২] রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের বন্ধুত্ব পূর্বের চেয়ে ঘন হয়ে ওঠে। দীর্ঘ আঠার বছর পরে বঙ্গদর্শন আবার নতুন করে প্রকাশ করার সংকল্প জাগে শ্রীশচন্দ্রের মনে। তখন এটির সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্যে তিনি এবং তাঁর কনিষ্ঠ শৈলেশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ জানান। এ দায়িত্ব-ভার গ্রহণ করার আন্তরিক ইচ্ছা তাঁর ছিল না। তাই শিলাইদহ থেকে বন্ধুবর প্রিয়নাথ সেনকে এই কথা জানিয়ে

১ সাধনা — ১৩০২
ভারতী — ১৩০৫
বঙ্গদর্শন — ১৩০৮-১৩১২
ভাণ্ডার — ১৩১২-১৩১৪
তত্ত্ববোধিনী — ১৩১৮-১৩১৯

২ ১২৭৯ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হয়। এই বছর থেকে ১২৮২ পর্যন্ত তিনিই সম্পাদক ছিলেন। তারপর অনিয়মিত ভাবে ১২৮৯ পর্যন্ত সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায় এটি প্রকাশিত হতে থাকে। শেষে ১২৯০ সালে কার্তিক থেকে মাঘ মাস পর্যন্ত মাত্র চারিটি সংখ্যা শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হওয়ার পর এটি বন্ধ হয়ে যায়।

তাঁকেই সম্পাদক হওয়ার জন্যে অনুরোধ করেন। কিন্তু দেখা যায় শেষ পর্যন্ত এ ভার রবীন্দ্রনাথকেই গ্রহণ করতে হয়েছে। এই ঘটনার ত্রিশ বছর পরে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "বঙ্গদর্শনের নবপর্যায়···আমার নাম যোজনা করা হল, তাতে আমার প্রসন্ন মনের সমর্থন ছিল না। কোন পূর্বতন খ্যাতির উত্তরাধিকার গ্রহণ করা সংকটের অবস্থা। আমার মনে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট সংকোচ ছিল। কিন্তু আমার মনে উপরোধ অনুরোধের দ্বন্দ্ব যেখানেই ঘটেছে সেখানেই আমি জয়লাভ করতে পারি নি, এবারেও তাই হল।"[৩]

রবীন্দ্রনাথ যখন এই দায়িত্ব-ভার গ্রহণ করলেন তখন শ্রীশচন্দ্রের মনের ওপর থেকে আত্মগ্লানির একটা মলিন ছায়া নেমে গেল। বঙ্কিমচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত বঙ্গদর্শন তাঁর হাতে এসেই বন্ধ হয়েছিল। এই ব্যর্থতার অনুশোচনায় দীর্ঘ আঠার বছর তিনি শুধু অন্তর্জ্বালা ভোগ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর অনুরোধ রাখতে সম্মত হলেন তখন তিনি যে কী পরিমাণ স্বস্তি অনুভব করেন নবপর্যায় বঙ্গদর্শনের প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় পাঠকদের কাছে তিনি তা অকুণ্ঠচিত্তে "নিবেদন" করেছেন, "বঙ্গদর্শন পুনর্জীবিত হওয়ায় আমার চিরন্তন ক্ষোভ দূর হইল। বঙ্গের প্রধান সাময়িক পত্র যে আমার হস্তে লোপ পাইয়াছিল, ইহাতে আমি বড় লজ্জিত ছিলাম।"

রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক প্রবন্ধ রচনার প্রথম পরিচয় আমরা পাই ভারতীর পৃষ্ঠাতে। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই রচনাগুলিকে তুচ্ছ বলে মনে করতেন এবং নিজেই এগুলির দোষ-ত্রুটির কথা উল্লেখ করে তাঁর স্থায়ী সৃষ্টি-সংগ্রহের মধ্যে এগুলিকে স্থান দিতে চান নি। তবু রচনাগুলি যে নিকৃষ্ট এ কথা বলা যায় না; আর ঐতিহাসিক গুরুত্বের দিক থেকেও এগুলির মূল্য আছে। ভারতীর সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে এ কথার উল্লেখ করা হয়েছে।

যে সময়ে বাঙলা, তথা ভারতের চারিদিকে রাজনৈতিক আন্দোলন তীব্রতর হয়ে উঠেছে, 'অসভ্য' বা 'অর্ধসভ্য' ভারতবাসীকে 'সুসভ্য' করে তোলার 'গুরুদায়িত্ব' সাধনের পথে ইংরেজকে ছোট বড় অনেক রকম বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহজাল ছিঁড়ে ফেলার একটা সর্বাত্মক চেষ্টায় বুদ্ধিবাদী নেতাদের রয়ে-সয়ে কাজ করার পাকা চত্বরে ফাটল ধরেছে, ঠিক সেই সময়েই রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শন সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। দেশের

৩ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের "রবীন্দ্র-জীবনী"-তে উদ্ধৃত। ২য় খণ্ড, পৃ-১৬।

সমসাময়িক অবস্থা তাঁর মনের ওপর যে কী পরিমাণ প্রভাব বিস্তার করেছিল বঙ্গদর্শনের পাতায় তার প্রচুর প্রমাণ মেলে। প্রথম যুগের লেখাগুলির মতো এখনকার লেখাগুলি আর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-সার নয়। তথ্য ও তত্ত্ব, ভাবনা ও ধারণা, দেশের অবস্থার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগও তার বাস্তব বিশ্লেষণ এবং বিদেশীর অত্যাচার দমনের ও স্বদেশের উন্নতি সাধনের উপায় সম্বন্ধে যথার্থ কর্মপথের নির্দেশ এই রচনাগুলিকে বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। তার ওপর সাহিত্যিক মূল্য তো আছেই। শক্ত কথা শক্ত করে বলাটা শক্ত নয়, স্পষ্ট আর সুন্দর করে বলার ক্ষমতাই অনন্যসাধারণ। রবীন্দ্রনাথ এই অনন্যসাধারণ দক্ষতার অধিকারী। অন্যান্য বিষয়ের রচনার মতো খাঁটি রাজনৈতিক লেখাগুলিতেও তাঁর এই দক্ষতার পরিচয় সুস্পষ্ট।

নবপর্যায় বঙ্গদর্শনের সুরুতেই রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর একটি ঘোষণা আমাদের চোখে পড়ে: বঙ্গদর্শন প্রবৃত্ত হবে বিশ শতকের যুগধর্মের ব্যাখ্যায়। তাঁর মতে এই যুগধর্ম গঠিত 'রাষ্ট্র' ও 'নেশনের' সমন্বয়ে। কিন্তু কার্যত পত্রিকার 'মটো' আরও ব্যাপক ও বিভিন্নমুখী হয়ে দাঁড়াল। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রকৃত স্বরূপের বিশ্লেষণ, তার আন্তর ঐক্যসূত্রের আবিষ্কার, তখনকার রাষ্ট্রিক ও সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই সংস্কৃতির আলোচনা, রীতি-নীতি আচার-অনুষ্ঠান এবং মানসতার দিক থেকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে পার্থক্যের পরিমাপ, সরকারী অত্যাচার-অনাচারের তীব্র প্রতিবাদ, গঠন-মূলক স্বাদেশিকতার স্বরূপ ও তার বিকাশের উপায় ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়েই পত্রিকায় প্রচুর রচনা প্রকাশিত হতে লাগল। অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে একটি কথা আমাদের মনে রাখা দরকার; দেশের সমসাময়িক অবস্থার প্রভাব রবীন্দ্রনাথের ওপর যতই পড়ে থাকুক তার টানে বিশুদ্ধ সাহিত্য-সৃষ্টির প্রেরণার সূত্রটি তাঁর মধ্যে ছিন্ন হয়ে যায় নি। তাই উপন্যাস ও গল্প, বিচিত্র-প্রবন্ধ ও কবিতা একই সময়ে তাঁর লেখনীর উৎস-মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১): রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা-মূলক যে প্রবন্ধগুলি ১৩০৮ থেকে ১৩১৫ সালের মধ্যে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়েছিল[৪] সেগুলিকে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

৪ এগুলির মধ্যে অনেকগুলি প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথের 'আত্মশক্তি', 'ভারতবর্ষ', 'সমাজ', 'শিক্ষা',

এক। যুগধর্মের বিচার—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের আদর্শগত বৈষম্য।

দুই। গঠন-মূলক স্বাদেশিকতা।

তিন। ইংরেজ অত্যাচার ও দমন-নীতির প্রতিবাদ।

এই বিভাগ অনুযায়ী প্রবন্ধগুলির নাম ও প্রকাশকাল:—

এক।— নকলের নাকাল — জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৮।
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার আদর্শ — জ্যৈষ্ঠ, " ।
আলোচনা: নকলের নাকাল সম্বন্ধে — আষাঢ়, " ।
নেশন্ কি? — শ্রাবণ, " ।
হিন্দুত্ব — শ্রাবণ, " ।
বিরোধ-মূলক আদর্শ — আশ্বিন, " ।
বারোয়ারি-মঙ্গল — চৈত্র, " ।
নববর্ষ — বৈশাখ, ১৩০৯।
ভারতবর্ষের ইতিহাস — ভাদ্র, " ।
অত্যুক্তি — কার্তিক, " ।
অবস্থা ও ব্যবস্থা — আশ্বিন, ১৩১২।
প্রাচ্য ও প্রতীচ্য — ভাদ্র, ১৩১৫।

দুই।— ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার — বৈশাখ, ১৩০৮।
মা ভৈঃ — কার্তিক, ১৩০৯।
স্বদেশ — পৌষ, " ।
বঙ্গ বিভাগ — জ্যৈষ্ঠ, ১৩১১।
য়ুনিভার্সিটি বিল: সাময়িক প্রসঙ্গ — আষাঢ়, " ।
স্বদেশী সমাজ — ভাদ্র, " ।
স্বদেশী সমাজের পরিশিষ্ট — আশ্বিন, " ।
সফলতার সদুপায় — চৈত্র, " ।
ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ — বৈশাখ, ১৩১২।
ব্রতধারণ — ভাদ্র, " ।

'রাজা প্রজা', 'সমূহ' প্রভৃতি গ্রন্থে সংকলিত হয়। 'ঘুষাঘুষি', 'রাজ-কুটুম্ব' প্রভৃতি কয়েকটি প্রবন্ধ রবীন্দ্র-রচনাবলীর ১০ম খণ্ডের পরিশিষ্টে সংকলিত হয়েছে।

দেশীয় রাজ্য	— আশ্বিন,	১৩১২।
বিজয়া-সম্মিলন	— কার্তিক,	„ ।
রাখী-বন্ধনের উৎসব	— „	„ ।
দেশনায়ক	— জ্যৈষ্ঠ,	১৩১৩।
শিক্ষা-সমস্যা	— আষাঢ়,	„ ।
জাতীয় বিদ্যালয়	— ভাদ্র,	„ ।
শক্তি	— মাঘ,	১৩১৪।
পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীর বক্তৃতা	— ফাল্গুন,	„ ।
পথ ও পাথেয়	— জ্যৈষ্ঠ,	১৩১৫।
সমস্যা	— আষাঢ়,	„ ।
সদুপায়	— শ্রাবণ,	„ ।
দেশহিত	— আশ্বিন,	„ ।
তিন। — রাষ্ট্রনীতি ও ধর্মনীতি	— কার্তিক,	১৩০৯।
রাজকুটুম্ব	— বৈশাখ,	১৩১০।
ঘুষাঘুষি	— ভাদ্র,	„ ।
ধর্মবোধের দৃষ্টান্ত	— আশ্বিন,	„ ।

এখানে রবীন্দ্রনাথের উপরোক্ত সব কটি প্রবন্ধেরই আলোচনার অবকাশ নেই এবং তার প্রয়োজনও নেই। বিষয় ও বক্তব্যের দিক থেকে কয়েকটি প্রবন্ধের মধ্যে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়াও শক্ত নয়। তাই আবশ্যক মতো প্রবন্ধগুলিকে বেছে নিয়ে আমরা আলোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছি।

এক

নকল করা মানুষের একটা সহজাত প্রবৃত্তি। দুর্বল প্রবৃত্তির দাস, আর প্রবৃত্তি সবলের দাস। যে শক্তিহীন সে অন্ধ অনুকরণের মধ্যে দিয়ে স্বকীয়তা, স্বাজাত্য, স্বধর্ম সমস্তই হারায়। আর যে শক্তিমান, যার বিচার-ক্ষমতা আছে, পরিমিতিবোধ আছে সে বোঝে, "যেটুকু লইলে বাকিটুকুর সহিত বেখাপ হয় না, তাহাকে বলে গ্রহণ করা; যেটুকু লইলে বাকিটুকুর সহিত অসামঞ্জস্য হয় তাহাকে বলে অনুকরণ করা।" 'নকলের নাকাল' প্রবন্ধে

এবং প্রবন্ধটির আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের আগে পর্যন্ত ইংরেজের অনুকরণ করার প্রবৃত্তি একটা দুরারোগ্য ব্যাধির মতো আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে পেয়ে বসেছিল। বেশ-ভূষা, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি সমস্ত ব্যাপারেই এই ব্যাধির মারাত্মক লক্ষণগুলি প্রকাশ পেয়ে আমাদের লজ্জাকর অক্ষমতাকে ফুটিয়ে তুলছিল। কিন্তু তার জন্যে অনেকেই লজ্জা পেতেন না। হয়তো দু একজন ধনী বিলাত-ফেরত সাহেবী-আনার অনুকরণের পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করেছিলেন। কিন্তু এই সব ডিস্‌টিংগুইষ্ট বাঙালী সাহেব নিজেদের উত্তরপুরুষের অবস্থা কি হবে তা ভাবতেন না। পিতা অনুকরণে ডিস্‌টিংশন্ পেলেও পুত্র সে কৃতিত্ব নাও দেখাতে পারে। অথচ বিলাতী মোহের হাত থেকে সে তখন নিষ্কৃতি পাবে না। তাই সেই হতভাগ্য পুত্রপৌত্রদের নিদারুণ অবস্থার কথা চিন্তা করে রবীন্দ্রনাথ মর্মাহত হয়েছেন, "তাহারা যখন ফিরিঙ্গী-লীলার অধস্তন রসাতলের গলিতে গলিতে সমাজচ্যুত আবর্জনার মতো পড়িয়া থাকিবে, তখন কি র‍্যাঙ্কিন্‌বিলাসীর প্রেতাত্মা শান্তিলাভ করিবে।"

আমাদের দেশের মাটিতে সাহেবী-আনা চলতে পারে না। কেন, তার উত্তরও দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ,

> ···আচার ব্যবহার সাজসজ্জা উদ্ভিদের মতো, তাহাকে উপড়াইয়া আনিলে শুকাইয়া পচিয়া নষ্ট হইয়া যায়। বিলাতী বেশভূষা আদবকায়দার মাটি এখানে কোথায়। সে কোথা হইতে তাহার অভ্যস্ত রস আকর্ষণ করিয়া সজীব থাকিবে। ব্যক্তিবিশেষ খরচপত্র করিয়া কৃত্রিম উপায়ে মাটি আমদানি করিতে পারেন এবং দিনরাত সযত্ন-সচেতন থাকিয়া তাহাকে কোনো মতে খাড়া রাখিতে পারেন। কিন্তু সে সকল দুই-চারিজন শৌখিনের দ্বারাই সাধ্য।
>
> যাহাকে পালন করিতে, সজীব রাখিতে পারিবে না তাহাকে ঘরের মধ্যে আনিয়া পচাইয়া হাওয়া খারাপ করিবার দরকার? ইহাতে পরেরটাও নষ্ট হয়, নিজেরটাও মাটি হইয়া যায়। সমস্ত মাটি করিবার সেই আয়োজন বাংলা দেশেই দেখিতেছি। (নকলের নাকাল)

আসলে পরিবর্তনের নীতিকে রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করেন নি। তাঁর বক্তব্য

পরিবর্তনের রীতির বিরুদ্ধে। স্পষ্ট ভাষাতেই তিনি একথা জানিয়েছেন, "প্রয়োজনের নিয়মে পরিবর্তন হইবে, অনুকরণের নিয়মে নহে।"

নবপর্যায়ের বঙ্গদর্শনে রবীন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সভ্যতা-সংস্কৃতির স্বরূপ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা সুরু করলেন। তিনি বললেন, য়ুরোপীয় সভ্যতার মূলভিত্তি হল রাষ্ট্রস্বার্থবুদ্ধি। য়ুরোপ এই ভিত্তির ওপরে ধর্মের প্রতিষ্ঠাকে স্বীকার করে নি, এর নীচেই ধর্মকে চেপে রেখেছে। (এবং স্বার্থবুদ্ধি ভিত্তি হলে তার ওপর ধর্মের প্রতিষ্ঠাও সম্ভব নয়।) কিন্তু "প্রত্যেক জাতির যেমন একটি জাতিধর্ম আছে, তেমনি জাতিধর্মের অতীত একটি শ্রেষ্ঠ ধর্ম আছে, তাহা মানবসাধারণের।" যে জাতি মানবসাধারণের এই ধর্ম অর্থাৎ মানবিকতার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে তার অমঙ্গল ঘনিয়ে আসে। ইতিহাস এর সাক্ষী। আমাদের দেশেও যখন বর্ণাশ্রমধর্ম মানবসাধারণের এই ধর্মকে আঘাত করেছিল তখন একটা বিরাট আপজাত্যের সম্মুখীন হতে হয়েছিল সমগ্র জাতিকে।

য়ুরোপীয় সভ্যতার মহত্ত্বও রবীন্দ্রনাথের চোখে বিশেষ ভাবেই ধরা পড়েছে। সেই মহত্ত্বের ভিত্তিতে মিলনের আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে অমঙ্গল দূর হবে না। কিন্তু বিশ শতকের প্রতীচ্য সভ্যতায় এর উল্টো রূপই ফুটে উঠল। রবীন্দ্রনাথ তাই ভবিষ্যদ্দ্রষ্টার নির্ভুল বিচারে মন্তব্য করলেন,

> …য়ুরোপীয় সভ্যতার মূলভিত্তি রাষ্ট্রীয় স্বার্থ যদি এত অধিক স্ফীতিলাভ করে যে ধর্মের সীমাকে অতিক্রম করিতে থাকে, তবে বিনাশের ছিদ্র দেখা দিবে এবং সেই পথে শনি প্রবেশ করিবে।
>
> স্বার্থের প্রকৃতিই বিরোধ। য়ুরোপীয় সভ্যতার সীমায় সীমায় সেই বিরোধ উত্তরোত্তর কণ্টকিত হইয়া উঠিতেছে। পৃথিবী লইয়া ঠেলাঠেলি কাড়াকাড়ি পড়িবে, তাহার পূর্ব-সূচনা দেখা যাইতেছে। ('প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার আদর্শ')

উনিশ শতকের নবজাগরণ শিক্ষিত বাঙালীকে যে নতুন পদ্ধতিতে চিন্তা করতে শেখাল তার একটি বিশেষ পরিচয় ফুটে উঠল নেশন্-তত্ত্বের আলোচনার মধ্যে। এই তত্ত্বচিন্তা বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। আমরা এখানে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারাটির অনুসরণ করব।

নেশন-তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রথমেই ফরাসী পণ্ডিত রেনাঁর মত অনুবাদ করে দিয়েছেন। রেনাঁর মতে, ভৌগোলিক সীমা-বিভাগ

বিভিন্ন নেশনের মধ্যে পার্থক্য রচনা করে একথা সত্য হলেও একমাত্র এবং পরম সত্য নয়। কারণ ভৌগোলিক সীমানাকে চূড়ান্ত বলে গ্রহণ করলে সর্বমানবিক সম্বন্ধবোধের মূল্যকে হ্রাস করা হয়। তাই রেনাঁ মন্তব্য করেছেন,

> ভূখণ্ডের উপর যুদ্ধক্ষেত্র ও কর্মক্ষেত্রের পত্তন হইতে পারে, কিন্তু নেশনের অন্তঃকরণটুকু ভূখণ্ডে গড়ে না। জনসম্প্রদায় বলিতে যে পবিত্র পদার্থকে বুঝি মনুষ্যই তাহার শ্রেষ্ঠ উপকরণ। সুগভীর ঐতিহাসিক মন্থনজাত নেশন একটি মানসিক পদার্থ, তাহা একটি মানসিক পরিবার, তাহা ভূখণ্ডের আকৃতির দ্বারা আবদ্ধ নহে। ('নেশন কি'।)

নেশনকে 'একটি মানসিক পদার্থ' 'একটি মানসিক পরিবার' বলে উল্লেখ করে রেনাঁ নেশন-তত্ত্বের সংকীর্ণ অর্থগত গণ্ডিটি ভেঙে দিলেন। নেশন সম্বন্ধে রেনাঁর এই 'মানসিক' শব্দটি প্রয়োগের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে রবীন্দ্রনাথ নেশনের রূপগত বিশ্লেষণে না গিয়ে তার ভাবগত ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হলেন। তিনি দেখালেন, নেশনের ভাবগত দিকটিকে বড় করে দেখে "সভ্য য়ুরোপ জগতে সদ্ভাব বিস্তার করিয়া জগতে ঐক্য সেতু বাঁধিতেছে," আর রূপগত দিকটিকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে "বর্বর য়ুরোপ বিচ্ছেদ, বিনাশ, ব্যবধান সৃজন করিতেছে।" ('হিন্দুত্ব'[৫])

রবীন্দ্রনাথ বললেন, আমাদের দেশে কিন্তু নেশন নয় সমাজই চিরকাল সবচেয়ে বড় বলে সম্মান পেয়ে এসেছে। বিভিন্ন ধর্মমত, ভাষা ও সম্প্রদায়ের নানা বিরুদ্ধ বিচার-সংস্কার নিয়েই গঠিত হয়েছে হিন্দু-সমাজ। নেশন্‌কেও যেমন একটা বিশেষ সংজ্ঞা দিয়ে বোঝানো যায় না, তেমনি হিন্দু-সমাজকেও।

নেশন শব্দটির মধ্যে দেশী গন্ধ মোটেই নেই—এটি য়ুরোপ থেকে আমদানী করা। প্রাচ্য সমাজ-ব্যবস্থায় নেশন গঠনের গুরুত্বকে স্বীকার করার প্রয়োজন হয় নি। ন্যাশন্যাল স্বার্থ বজায় রাখার জন্যে য়ুরোপে ব্যক্তি নিজের স্বার্থ বিসর্জন দেয়; আমাদের প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থাতেও সামাজিক স্বার্থকেই বড় করে দেখা হয়েছিল। কিন্তু "তখন সমাজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমস্ত সমাজ-কলেবরের স্বার্থকেই নিজের একমাত্র স্বার্থ জ্ঞান করিত। এখন সেই নিয়ম আছে, সেই চেতনা নাই।" আর এই চেতনাহীন নিয়ম-সংস্কারই আমাদের জাতীয়

৫ 'ভারতবর্ষীয় সমাজ' নামে 'আত্মশক্তি' গ্রন্থে সংকলিত।

অধঃপতনের প্রধান কারণ। রবীন্দ্রনাথ তাই পুনরুজ্জীবনের উপায় নির্দেশ করে বললেন,—

> সমাজের নিচে হইতে উপর পর্যন্ত সকলকে একটি বৃহৎ নিঃস্বার্থ কল্যাণবন্ধনে বাঁধা, ইহাই আমাদের সকল চেষ্টার অপেক্ষা বড় চেষ্টার বিষয়। এই ঐক্যসূত্রেই হিন্দুসম্প্রদায়ের একের সহিত অন্যের এবং বর্তমানের সহিত অতীতের ধর্মযোগ সাধন করিতে হইবে। আমাদের মনুষ্যত্বলাভের এই একমাত্র উপায়। ('হিন্দুত্ব')

বিশ শতকের য়ুরোপীয় চিন্তাধারায় নেশনের এই স্বভাবের দিকটাকে মোটেই মর্যাদা দেওয়া হয় নি। শুধু নানা দিক থেকে নানা রঙিন চিন্তার স্পট্-লাইট্ ফেলে তার বাহ্যিক রূপটাকেই প্রকট করে তোলার চেষ্টা হয়েছে। তাই শুদ্ধ ন্যাশনালিজ্‌মের আভ্যন্তরীণ যে মিলন-তত্ত্ব, যে সমন্বয়বাদ তার হদিস পান নি য়ুরোপীয় প্যাট্রিয়ট্রা। ফলে জেগেছে বিরোধ, এক নেশনের স্বার্থের সঙ্গে আর এক নেশনের। ন্যাশনালিজ্‌মের আদর্শ হয়ে উঠেছে বিরোধ-মূলক। আর এই 'বিরোধ-মূলক আদর্শ'কে বজায় রাখার জন্যে অপচেষ্টার অন্ত নেই। য়ুরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তিই হল এই স্বার্থ-মূল ভ্রান্ত আদর্শ। এ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—

> প্যাট্রিয়টিজ্‌ম্, ধর্মনীতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি কতকগুলি বাঁধিবোল আছে যাহা লোকে মুখে উচ্চারণ করে এবং সে সম্বন্ধে আর চিন্তা করিবার প্রয়োজন বোধ করে না। সে সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করিতে গেলেই হাতাহাতি বাঁধিয়া যায়। বাঁধি-বোল মুখে মুখে চলিয়া যায়—লোকে নিঃসংশয়ে জীবন-যাপন করে। প্যাট্রিয়টিক্ খুনাখুনি অথবা যোদ্ধধর্ম, এইরূপের একটা বাঁধি-বোল। ······বস্তুত এই অন্ধতা নেশনতন্ত্রেরই মূলগত ব্যাধি। মিথ্যার দ্বারা হউক, প্রেমের দ্বারা হউক, নিজেদের কাজে নিজেকে বড় করিয়া প্রমাণ করিতেই হইবে এবং সেই উপলক্ষে অন্য নেশন্-কে ক্ষুদ্র করিতে হইবে, ইহা নেশনের ধর্ম—ইহা প্যাট্রিয়টিজ্‌মের প্রধান অবলম্বন।

ভারতবর্ষের প্রাচীন সমাজ স্বার্থসাধনের দিকে মোটেই লক্ষ্য দেয় নি। একটা সর্বাত্মক মঙ্গলপ্রচেষ্টাই সে সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। রবীন্দ্রনাথ বললেন, এই স্বার্থসাধনের দিকে লক্ষ্য না থাকাই তার বর্তমান দুর্গতির কারণ নয়, কারণ হল আদর্শচ্যুতি। এই অদর্শচ্যুতির একটা বড় পরিচয় দল বেঁধে শোক বা

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। এ ব্যাপারটা আমাদের প্রাচীন সমাজে লক্ষণীয় নয়, বিদেশী অনুকরণের ফল। প্রাচীন সমাজে গুণীজনের সম্মান দেওয়া হত গুণচর্চার মধ্যে দিয়ে। কিন্তু যুগধর্মের প্রভাবে প্রচেষ্টার চেয়ে প্রচার বড় হয়েছে, চর্চার চেয়ে চীৎকার প্রাধান্য পেয়েছে। "ভ্রাতৃভাব এখন ভ্রাতাকে ছাড়িয়া বাহিরে ফিরিতেছে, দয়া এখন দীনকে ছাড়িয়া সংবাদ-দাতার স্তম্ভের উপর চড়িয়া দাঁড়াইয়াছে এবং লোকহিতৈষিতা এখন লোককে ছাড়িয়া রাজদ্বারে খেতাব খুঁজিয়া বেড়াইতেছে।" বিলাতী আদর্শকে আমরা গ্রহণ করেছি, কিন্তু তা আমাদের স্বভাব-বিরুদ্ধ বলে তাকে আমরা ধারণ করতে পারছি না। "বিলাতি মতের লজ্জা পাইয়াছি, কিন্তু সে লজ্জা নিবারণের বহু মূল্য বিলাতি বস্ত্র এখনো পাই নাই।" আমাদের পরাধীন দরিদ্র দেশ যদি এই ভাবে আপন চলার তাল ভুলে গিয়ে স্বাধীন সমৃদ্ধ দেশের সঙ্গে তাল রেখে চলতে চায় তাহলে কেমন করে সে আত্মরক্ষা করবে? "পরের দুঃসাধ্য আদর্শে সম্ভ্রান্ত হইয়া উঠিবার কঠিন চেষ্টায় কি উদ্বন্ধনে প্রাণ ত্যাগ করিবে?"

বিশ শতকের য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রতিযোগিতা-মূলক রূপটি যত কঠিনই হোক, তার গঠন-প্রক্রিয়া যত অনিবার্যই হোক রবীন্দ্রনাথ তাকে স্বাভাবিক বলে স্বীকার করতে পারেন নি। কারণ ভারতবর্ষের প্রাচীন সামাজিক আদর্শ তাঁর কাছে জীবন্ত, চিরন্তন। কর্ম, মর্ম আর ধর্মের প্রভাবে সে সমাজের আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয় নি। সেই আদর্শের অভিন্ন-নিষ্ঠ অনুসরণই পরাধীন ভারতের উন্নতির একমাত্র উপায়। তাই রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীকে এই বলে সচেতন করে দিলেন,

> দরখাস্ত করিয়া এ পর্যন্ত কোন দেশই রাষ্ট্রনীতিতে বড়ো হয় নাই, অধীনে থাকিয়া কোন দেশ বাণিজ্যে স্বাধীন দেশকে দূরে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই, এবং ভোগবিলাসিতা ও ঐশ্বর্যের আড়ম্বরে বাণিজ্য-জীবী দেশের সহিত কোনো ভূমিজীবী দেশ সমকক্ষতা রাখিতে পারে নাই। যেখানে প্রকৃতিগত এবং অবস্থাগত বৈষম্য, সেখানে প্রতিযোগিতা অপঘাতমৃত্যুর কারণ। ('বারোয়ারি-মঙ্গল')

স্বদেশী-যুগের ঐতিহাসিক স্মৃতি-বিজড়িত একটি বিখ্যাত প্রবন্ধ 'অত্যুক্তি'। প্রাচ্য চরিত্র সম্বন্ধে উদ্ধত বিদেশী অপবাদের এমন তীব্র নির্ভীক স্বদেশী প্রতিবাদ সে সময়ে আর ধ্বনিত হয়েছিল বলে মনে হয় না। যুক্তির কাঠিন্য আর বুদ্ধির

চমৎকারিত্বের, গভীর গাম্ভীর্য আর স্বচ্ছ সরসতার এক অপূর্ব সমন্বয় লক্ষ্য করা করা যায় এই প্রবন্ধটির মধ্যে।

১৩০৮ সালে ৩রা ফাল্গুন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দেবার সময় লর্ড কার্জন মন্তব্য করেছিলেন,

> If I were asked to sum in a single word the most notable characteristics of the East—physical, intellectual and moral—as compared with the West, the word exaggeration or extravagance is the one that I should employ. It is particularly patent on the surface of the native press.[৬]

পাশ্চাত্ত্যের সঙ্গে তুলনা করে প্রাচ্যচরিত্র সম্বন্ধে এমন নির্ভেজাল মিথ্যা কথা এমন গগনচুম্বী ঔদ্ধত্যের সঙ্গে আর কোন বিদেশী শাসক কখনো বলতে সাহস করেন নি। কার্জনের এই উক্তিতে সারা বাংলার শিক্ষিত সমাজে ক্রোধ আর ঘৃণা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠল। কলকাতার টাউন হলে প্রতিবাদ-সভার ব্যবস্থা হল। সভাপতি রাসবিহারী ঘোষ। এই প্রসঙ্গে কার্জনের আর একটি কুকীর্তির কথা স্মরণ করা আবশ্যক। ১৯০৩ সালের জানুয়ারী মাসে সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষ্যে কার্জন দিল্লীতে বিপুল অর্থব্যয়ে এক বিরাট দরবারের আয়োজন করেন। প্রাচ্যচরিত্র সম্বন্ধে তাঁর এই মিথ্যা-ভাষণ আর দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ভারতবাসীর মুখের গ্রাস কেড়ে রাজসম্মান কুড়োবার এই নিষ্ঠুর দুশ্চেষ্টা রবীন্দ্রনাথের সত্যনিষ্ঠ অন্তরে যে সাংঘাতিক আঘাত হেনেছিল তারই মর্মান্তিক বেদনা-প্রসূত প্রবন্ধ 'অত্যুক্তি'[৭]।

৬ দ্রষ্টব্য Convocation Address, Calcutta University, p. 924.

৭ ১৩৩৬ সালের অগ্রহায়ণ মাসের প্রবাসীতে শচীন্দ্রনাথ সেন রচিত "Political philosopby of Rabindranath" গ্রন্থের সমালোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং লিখেছিলেন, "কার্জন লাটের হুকুমে দিল্লীর দরবারের উদ্যোগ হল। তখন রাজশাসনের তর্জন স্বীকার ক'রেও আমি তাঁকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছিলুম।···আমি এই বলতে চেয়েছিলুম, দরবার জিনিসটা প্রাচ্য,—পাশ্চাত্ত্য কর্তৃপক্ষ যখন সেটা ব্যবহার করেন তখন তার যেটা শূন্যের দিক সেইটেই জাহির করেন, যেটা পূর্ণের দিক সেটাকে নয়।······দরবারে সম্রাট আপন অজস্র ঔদার্য প্রকাশ করার উপলক্ষ্য পেতেন—সেদিন তাঁর দ্বার অবারিত, তাঁর দান

কার্জনের 'exaggeration' বা 'extravagance' কথাটিকে রবীন্দ্রনাথ বাংলায় বললেন অত্যুক্তি। কিন্তু এই অত্যুক্তি কি শুধু প্রাচ্য সমাজেরই চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য? পাশ্চাত্য সমাজে এর পরিচয় মেলে না? রবীন্দ্রনাথ বললেন, "সকল জাতির মধ্যেই অত্যুক্তি ও আতিশয্য আছে। নিজেরটাকেই অত্যন্ত স্বাভাবিক ও পরেরটাকেই অত্যন্ত অসঙ্গত বোধ হয়।" নিজের বক্তব্যের সমর্থনে উভয় সমাজেরই ব্যবহারিক জীবন থেকে কতকগুলি প্রথাগত উদাহরণ সংগ্রহ করে দেখানোর পর রবীন্দ্রনাথ ক্রমশ আলোচনার গভীরে গেছেন,

> আমরা দেখিয়াছি, আমাদের অত্যুক্তি অলস বুদ্ধির বাহ্য প্রকাশ। তা ছাড়া সুদীর্ঘকাল পরাধীনতাবশত চিত্তবিকারেরও হাত দেখিতে পাই। যেমন আমাদিগকে যখন-তখন, সময়ে-অসময়ে, উপলক্ষ্য থাক বা না-থাক চীৎকার করিয়া বলিতে হয় আমরা রাজভক্ত। অথচ ভক্তি করিব কাহাকে, তাহার ঠিকানা নাই। আইনের বইকে, না কমিশনার-সাহেবের চাপরাসকে, না পুলিসের দারগাকে? গবর্মেণ্ট আছে, কিন্তু মানুষ কই? হৃদয়ের সম্বন্ধ পাতাইব কাহার সঙ্গে? আপিসকে বক্ষে আলিঙ্গন করিয়া ধরিতে পারি না। মাঝে মাঝে অপ্রত্যক্ষ রাজার মৃত্যু বা অভিষেক উপলক্ষ্যে, যখন বিবিধ চাঁদার আকারে রাজভক্তি দোহন করিয়া লইবার আয়োজন হয়, তখন ভীতচিত্তে শুষ্ক ভক্তি ঢাকিবার জন্য অতি দান ও অত্যুক্তি দ্বারা রাজপাত্র কানায় কানায় পূর্ণ করিয়া দিতে হয়।…এ দিকে আমাদের প্রতি সিকি-পয়সার বিশ্বাস মনের মধ্যে নাই; এত বড়ো দেশটা সমস্ত নিঃশেষে নিরস্ত্র; একটা হিংস্র পশু দ্বারের কাছে আসিলে দ্বারে অর্গল লাগানো ছাড়া আর কোন উপায় আমাদের হাতে নাই—অথচ জগতের কাছে সাম্রাজ্যের বলপ্রমাণ উপলক্ষ্যে আমাদের অটল ভক্তি রটাইবার বেলা আমরা আছি।

'অবস্থা ও ব্যবস্থা' রবীন্দ্রনাথের আর একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ। ৭ই আগষ্ট ১৯০৫, কলকাতার টাউন হলের সভায় বিদেশী দ্রব্য বর্জনের যে প্রতিজ্ঞা

অপরিমিত। পাশ্চাত্য নকল দরবারে সেই দিকটাতে কঠিন কৃপণতা, সেখানে জনসাধারণের স্থান সংকীর্ণ, পাহারাওয়ালার অস্ত্রে রাজপুরুষদের সংশয়বুদ্ধি কণ্টকিত, তার উপরে এই দরবারের ব্যয় বহনের ভার দরবারের অতিথিদেরই উপরে। কেবলমাত্র নত মস্তকে রাজার প্রতাপকে স্বীকার করাবার জন্যেই এই দরবার।"

গ্রহণ করা হয় তার ফলে অচিরে দেশব্যাপী আন্দোলন সুরু হয়। এই সভার মাত্র আঠার দিন পরেই রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধটি রচনা করে কলকাতার টাউন হলের এক সভায় পাঠ করেন।[৮] গ্রহণ-বর্জনের প্রতিজ্ঞার প্রতি দেশবাসীর কতখানি গুরুত্ব দেওয়া উচিত, এই প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী কর্মসূচী প্রণয়ন হবে কি ভাবে, স্বদেশী আন্দোলনের সূচনার এই গুরুতর বিষয়গুলি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই প্রবন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করলেন।

বঙ্গচ্ছেদের প্রস্তাবে যখন সারা দেশ এক অভূতপূর্ব প্রাণ-চাঞ্চল্য অনুভব করছে, সেই উত্তেজনাময় মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথের স্থিরমস্তিষ্ক-প্রসূত কর্ম-নির্দেশ দেশবাসীর কাছে এসে পৌঁছতে দেরি হল না। তিনি স্পষ্টই বললেন, উত্তেজনায় আত্মবিস্মৃত না হয়ে একটি কথা পরিষ্কারভাবে চিন্তা করে নেওয়া দরকার। আমরা দেশের হিত চাই, অথচ তার জন্যে স্বার্থত্যাগ বা কষ্টস্বীকার না করে পরের ভাণ্ডার থেকে সে হিত ভিক্ষা করে নিতে চাই। ভিক্ষা করে মঙ্গল লাভ করার চেষ্টার মতো মূর্খতা আর নেই। "এমন অবস্থায় নিরাশ হওয়াই স্বাভাবিক এবং তাহাই মঙ্গলকর।" এই নিরাশার ভিতর দিয়েই বাঙালী, তথা সমগ্র ভারতবাসী সেদিন চেতনার আলোক লাভ করেছিল, ফলে দূর হয়েছিল অন্ধ মোহ, স্বচ্ছ দৃষ্টিতে তাকাতে পেরেছিল ইংরেজের প্রকৃতি, তার উদ্দেশ্য আর অভিসন্ধির দিকে। রবীন্দ্রনাথ বললেন, সুযোগ যখন এসেছে, মোহ যখন ঘুচেছে তখন আত্মচেষ্টায় নিজেকে গড়ে তুলতে হবে। ইংরেজের কাছে ভিক্ষুকের মতো প্রত্যাশী হয়ে লাভ নেই। কারণ, "য়ুরোপের শ্রেষ্ঠতা নিজেকে জাহির করা এবং বজায় রাখাকেই চরম কর্তব্য বলিয়া জানে। অন্যকে রক্ষা করা যদি তাহার সঙ্গে সম্পূর্ণ খাপ খাইয়া যায়, তবেই অন্যের পক্ষে বাঁচোয়া, যে-অংশে লেশমাত্র খাপ না খাইবে, সে-অংশে দয়ামায়া বাছবিচার নাই।" রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ চরিত্রের এই গূঢ় পরিচয়টি উদ্ঘাটিত করে দেশবাসীকে সচেতন করে দিলেন। সে-সময় নেতাদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁর সঙ্গে একমত হতে পারেন নি বটে, কিন্তু তাঁর সত্য-দৃষ্টির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে দেশবাসীর দেরি হয় নি। ইংরেজ বঙ্গবিভাগ করেছে, তাই সক্রোধে স্বদেশী হয়ে উঠলে কোন লাভ হবে না। "দেশের প্রতি আমাদের যে-সকল কর্তব্য আজ আমরা

৮ ৯ই ভাদ্র, ১৩১২।

স্থির করিয়াছি, সে যদি দেশের প্রতি প্রীতির উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয় তবেই তাহার গৌরব ও স্থায়িত্ব; ইংরেজের প্রতি রাগের উপরে যদি তাহার নির্ভর হয় তবে তাহার উপরে ভরসা রাখা বড় কঠিন।"

দুই

একসময় আমরা দেশকে ভালোবাসতে আরম্ভ করেছিলাম বিলাতী হৃদয় দিয়ে। তাই সে অবস্থায় দেশের প্রতি আমাদের আন্তরিকতা সার্থক হতে পারে নি। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার মোহ আমাদের সহজ দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করেছিল, তাই ইংরেজের কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষাও আমাদের স্বভাবের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারি নি। এই প্রসঙ্গ নিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তাঁর "সামাজিক ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার" প্রবন্ধে আলোচনা করেছিলেন। তাঁর মতে আমাদের এই বিলাতী হৃদয়ের স্বদেশপ্রেম অত্যন্ত অস্বাভাবিক। আর এই অস্বাভাবিকতাই হল আমাদের ব্যাধি। এই ব্যাধিত অন্তরের ভালোবাসা দিয়ে স্বদেশের উন্নতি সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ বললেন, এ ব্যাধি যে কেবল সামাজিক তা নয়, জাতীয়। ফরাসী বিদ্রোহ, দাসত্ববারণ চেষ্টা এবং ইংরেজী কাব্য-সাহিত্যের রাজকীয় সমৃদ্ধি আমাদের বিস্মিত করেছিল। "আমরা সেই সভ্যতার ঔদার্যের সহিত ভারতবর্ষীয় সংকীর্ণতার তুলনা করিয়া য়ুরোপকে বাহবা দিতেছিলাম।"

বঙ্গব্যবচ্ছেদের প্রচণ্ড আঘাত আমাদের সেই বিরাট ভ্রান্তি ভেঙ্গে দিলে বটে, কিন্তু চলার পথ উন্মুক্ত হল না। ভুল পথে আর চলা যায় না, ঠিক পথেরও হদিস নেই। তখন "প্রাচীন ভারতবর্ষ আর আধুনিক সভ্য জগতের চৌমাথার মোড়ে" আমরা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম।

জাতির এই প্রচণ্ড মানসিক দ্বন্দ্বকে বাঙালীই প্রথম অনুভব করেছে বিশ শতকের সূচনায়; আর এই দ্বন্দ্ব নিরসনের প্রথম সার্থক প্রচেষ্টার গৌরবও বাঙালীরই প্রাপ্য। সেই সংশয়-দোদুল অবস্থায় জাতিকে যাঁরা যথার্থ পথনির্দেশ দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। স্বদেশী হৃদয়ের স্বাদেশিকতার প্রকৃত গঠনমূলক রূপটি এই সময় থেকেই দানা বেঁধে ওঠে।

ইংরেজের কাছে আবেদন-নিবেদন করে কিছুই পাওয়া যাবে না। রবীন্দ্রনাথ বললেন, আমাদের মঙ্গল এই না পাওয়ার মধ্যেই,

ইংরেজ যদি আমাদিগকে সমান বলিয়া একাসনে বসাইত, তাহা হইলে আমাদের অসমানতা আরও অধিক হইত। তাহা হইলে ইংরেজের মহত্ত্বের তুলনায় আমাদের গৌরব আরও কমিয়া যাইত। তাহারা পৌরুষের দ্বারা যে আসন পাইয়াছে আমরা প্রশ্রয়ের দ্বারা তাহা পাইয়া যদি সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত থাকিতাম, আমাদের আত্মাভিমান শান্ত হইত, তবে তদ্দ্বারা আমাদের জাতির গভীরতর দারুণতর দুর্গতি হইত।

মাথায়-হাত-দিয়ে-বসে-পড়া জাতিকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন, সব সভ্যতার মধ্যে একটা মূলসূত্র আছে, সেটি মহত্ত্বের, সেটি চিরন্তন; কিন্তু তার বাইরের অবয়বটা সাময়িক। সেটি ঐ মূলসূত্রটিকে অবলম্বন করেই যুগোপযোগী রূপ লাভ করে। য়ুরোপীয় সভ্যতার সেই চিরন্তন অংশটি, সেই মহত্ত্বের মূলসূত্রটি আমাদের কাছে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণীয় হওয়া উচিত।

তেমনি ভারতবর্ষীয় প্রাচীন আদর্শের মধ্যেও একটা চিরন্তন ও একটা সাময়িক অংশ আছে। যেটা সাময়িক সেটা অন্য সময়ে শোভা পায় না। সেইটেকেই যদি প্রধান করিয়া দেখি, তবে বর্তমান কাল ও বর্তমান অবস্থা দ্বারা আমরা পদে পদে বিড়ম্বিত উপহসিত হইব। কিন্তু ভারতবর্ষের চিরন্তন আদর্শটিকে যদি আমরা বরণ করিয়া লই, তবে আমরা ভারতবর্ষীয় থাকিয়াও নিজেদের নানা কাল নানা অবস্থার উপযোগী করিতে পারিব।

('ব্যাধি ও প্রতিকার')

রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীকে যে কর্মপথের নির্দেশ দিলেন সে পথ মোটেই সুগম নয়, আত্মত্যাগের ভিতর দিয়ে সে পথে চলার বাধা দূর করতে হয়। কিন্তু মাতৃভূমির সঙ্গে নাড়ীর যোগ যে অনুভব করেছে মৃত্যুভয়ও তার কাছে তুচ্ছ। তাই রবীন্দ্রনাথ স্বদেশবাসীকে অভয় দিয়ে বললেন,

মৃত্যু একটা প্রকাণ্ড কালো কষ্টিপাথরের মতো। ইহারই গায়ে কষিয়া সংসারে সমস্ত খাঁটি সোনার পরীক্ষা হইয়া থাকে।

তুমি দেশকে যথার্থ ভালোবাস—তাহার চরম পরীক্ষা তুমি দেশের জন্য মরিতে পার কি না ('মা ভৈঃ' [৯])

মাঝে মাঝে সভাসমিতিতে যোগ দেওয়া ছাড়া সক্রিয় রাজনীতিতে

৯ 'বিচিত্র প্রবন্ধ' গ্রন্থের অন্তর্গত।

রবীন্দ্রনাথ কখনোই অংশগ্রহণ করেন নি। তবু দেশের অবস্থা এবং রাজনীতির নানা বিষয় ও আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ছিল। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাদীক্ষার মধ্যে দিয়েই যে ভারতে জাতীয় চেতনার উন্মেষ, ইংরেজ শাসকদের মধ্যে লর্ড কার্জন এ সত্য যথার্থ ভাবেই উপলব্ধি করেন। তাই এই জাতীয়তাবোধকে চূর্ণ করার জন্যে তিনি একটি বিভিন্নমুখী অভিসন্ধি গড়ে তোলেন। তার একটি মুখ 'য়ুনিভার্সিটি বিল্'। এই বিলের বলে উচ্চ শিক্ষা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য হয়ে উঠল; আর ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিতের মধ্যে একটা মর্মান্তিক বিচ্ছেদের পথ প্রশস্ত হল। বিলের এই প্রচ্ছন্ন সাংঘাতিক উদ্দেশ্যটিকে প্রকট করে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করলেন,

> আমাদের ভাবনার বিষয় এই যে, দেশে বিচার দুর্মূল্য, অন্ন দুর্মূল্য, শিক্ষাও যদি দুর্মূল্য হয়, তবে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে নিদারুণ বিচ্ছেদ আমাদের দেশেও অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া উঠিবে। বিলাতে দারিদ্র্য কেবল ধনের অভাব নহে, তাহা মনুষ্যত্বেরও অভাব—কারণ, সেখানে মনুষ্যত্বের সমস্ত উপকরণই চড়া দরে বিক্রয় হয়।......এই জন্যই বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে, নিজেদের বিদ্যাদানের ব্যবস্থাভার নিজেরা গ্রহণ করা। ('য়ুনিভার্সিটি বিল্')

'স্বদেশী সমাজ' রবীন্দ্রনাথের আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। সে-সময়ে এই প্রবন্ধটির তীব্র সমালোচনা হয়েছিল। বিশিষ্ট রাজনীতিজ্ঞ পৃথ্বীশচন্দ্র রায়ের সমালোচনাতেই তীব্রতার মাত্রা ছিল সর্বাধিক। রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অবিচলতায় এই সমস্ত প্রতিবাদের সম্মুখীন হন।

বঙ্গভঙ্গের সরকারী প্রস্তাব তখন প্রকাশিত হয়েছে।[১০] শিক্ষা-সংস্কার নিয়েও নানা আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে। অভূতপূর্ব এক রাজনৈতিক উত্তেজনায় বাংলার শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সমাজের মন তখন অস্থির। এই অস্থিরতার, এই উত্তেজনার একটা সাময়িক মূল্য থাকলেও এর দ্বারা জাতির কোন মানসিক বিকাশ বা কোন স্থায়ী উন্নতি সম্ভব নয়। তাই রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে বাঙালীর সামনে একটা গঠনমূলক পরিকল্পনা তুলে ধরলেন।[১১] পল্লী-সংগঠনের

১০ Calcutta Gazette, December 3, 1903.

১১ ৭ই শ্রাবণ, ১৩১১, মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে চৈতন্য লাইব্রেরির এক বিশেষ অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধটি পাঠ করেন; ১৬ই শ্রাবণ কার্জন রঙ্গমঞ্চে পরিবর্তিত আকারে এটি পুনঃপঠিত হয়।

কোন চিন্তা তখনো নেতাদের মাথায় আসে নি। এ ধরণের নীরব কর্মের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা তাঁরা বিশেষ বুঝতেন না। রবীন্দ্রনাথই প্রথম তাঁর এই প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে দেশবাসীকে পল্লী-সচেতন করে তুলতে চেষ্টা করলেন। তিনি বললেন, পল্লীগুলির নির্জীব ব্যাধিত অবস্থা দূর করতে না পারলে মঙ্গলের আশা নেই। এ কাজের জন্যে সরকারের কাছে হাত পাতার দরকার হয় না। পূর্বে আমাদের দেশে পল্লীগুলি যে উপায়ে সজীব ছিল এখনো সেই উপায়েই এগুলিকে জাগানো যায়।

> আমাদের দেশ প্রধানত পল্লীবাসী। এই পল্লী মাঝে মাঝে যখন আপনার নাড়ীর মধ্যে বাহিরের বৃহৎ জগতের রক্তচলাচল অনুভব করিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠে, তখন মেলাই তাহার প্রধান উপায়।······প্রত্যেক জেলার ভদ্র শিক্ষিত সম্প্রদায় তাহাদের জেলার মেলাগুলিকে যদি নবভাবে জাগ্রত, নব প্রাণে সজীব করিয়া তুলিতে পারেন, ইহার মধ্যে দেশের শিক্ষিতগণ যদি তাঁহাদের হৃদয় সঞ্চার করিয়া দেন, এই সকল মেলায় যদি তাঁহারা হিন্দু-মুসলমানের সদ্ভাব স্থাপন করেন—কোন প্রকার নিষ্ফল পলিটিক্সের সংস্রব না রাখিয়া বিদ্যালয়, পথঘাট, জলাশয়, গোচর-ভূমি প্রভৃতি সম্বন্ধে জেলার যে-সমস্ত অভাব আছে তাহার প্রতিকারে পরামর্শ করেন, তবে অতি অল্পকালের মধ্যে স্বদেশকে যথার্থই সচেষ্ট করিয়া তুলিতে পারেন।

আমাদের আভ্যন্তরীণ দুঃখ-দুর্দশার প্রধান কারণ যে আমাদের নিশ্চেষ্টতা এবং পরমুখাপেক্ষিতা এ সত্য রবীন্দ্রনাথ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন; তাই স্বদেশবাসীর এই সচেষ্টতাকেই তিনি সর্বাধিক মূল্য দেন।

> গলায় কাছা না লইলে আমাদের গতি নাই, একথা আমি কোনো-মতেই বলিব না—আমি স্বদেশকে বিশ্বাস করি, আমি আত্মশক্তিকে সম্মান করি। আমি নিশ্চয় জানি যে, যে উপায়েই হউক, আমরা নিজের মধ্যে একটা স্বদেশীয় স্বজাতীয় ঐক্য উপলব্ধি করিয়া আজ যে সার্থকতা লাভের জন্য উৎসুক হইয়াছি, তাহার ভিত্তি যদি পরের পরিবর্তনশীল প্রসন্নতার উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়, যদি তাহা বিশেষভাবে ভারতবর্ষের স্বকীয় না হয়, তবে তাহা পুনঃপুনই ব্যর্থ হইতে থাকিবে।

রবীন্দ্রনাথের এই সাবধানবাণী তখন অনেকেরই ভালো লাগেনি। প্রসঙ্গান্তরে

এ বিষয়ে আলোচনা করা হবে। এই সূত্রে একটি কথা আমাদের অবশ্যই স্বীকার করা উচিত—

দেশের কাজ বলিতে যে এই ধরণের উচ্ছ্বাসহীন কর্ম বুঝাইতে পারে, একথা তখনো রাজনৈতিক নেতারা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই এবং পনেরো বৎসর পরে যখন নেতাদের কাছে গ্রামের ডাক পৌছিল তখন অনেকেই জানিতেন না যে এই আদর্শের কথা রবীন্দ্রনাথেরই।[১২]

রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধটি সম্বন্ধে বলাইচাঁদ গোস্বামী বঙ্গবাসী পত্রিকায় কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করেন। সেগুলির উত্তর দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে 'স্বদেশী সমাজের পরিশিষ্ট' লিখতে হয়। এটি প্রথমে বঙ্গবাসী-তেই প্রকাশিত হয়েছিল।

বাংলাদেশের শিক্ষা সংস্কারের অভিপ্রায়ে ইংরেজ সরকার একটি কমিটি গঠন করেন (১৯০৪)। সরকার মুখে বললেন শিক্ষা-সংস্কার, কাজে করতে চাইলেন শিক্ষা-সংহার। জাতীয়তাবোধের আলোকে নতুন-জাগা একটা জাতিকে যদি দমিয়ে রাখতে হয়, তাহলে প্রথম প্রয়োজন তার আভ্যন্তরীণ সাংস্কৃতিক ঐক্য-সূত্রটিকে ছিন্ন করা। একথা লর্ড কার্জনের মতো পরিষ্কার ভাবে আর কোন ইংরেজ শাসক বোধ হয় বোঝেন নি। এই উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের ভাষা-বিচ্ছেদের প্রচেষ্টাই সবচেয়ে মারাত্মক।

শিক্ষা-সংস্কার কমিটির রিপোর্টে বিভিন্ন প্রস্তাবের মধ্যে একটি অদ্ভুত ধরণের প্রস্তাব রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রস্তাবটিতে বলা হয়, স্বল্পবুদ্ধি পল্লী-বাসীদের সহজে বোঝার সুবিধার জন্যে পাঠশালার বইগুলিতে স্থানীয় উপভাষার প্রবর্তন করা হোক্। রবীন্দ্রনাথ এই রিপোর্টের তীব্র সমালোচনা করে রচনা করেন 'সফলতার সদুপায়'।[১৩]

কমিটি বলিতেছেন, ইহাতে চাষীদের উপকার হইবে ; কিন্তু…একতলায় এমন উপকার করিতে বসা ঠিক নয়, যাহাতে কিছুদিন পরেই দোতলায় ফাটল ধরিতে আরম্ভ হয়। সেটা দোতলার পক্ষে মন্দ এবং একতলার পক্ষেও ভাল নয়। সরকার বাহাদুর যদি ভারতবর্ষের দেশে দেশে ভাষাবিচ্ছেদ

১২ "রবীন্দ্র-জীবনী" প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ২য় খণ্ড, পৃ ১১৪।

১৩ ২৭শে ফাল্গুন, ১৩১১ জেনারেল অ্যাসেম্ব্লি হলে পঠিত।

স্থরু করিয়া দেন, তবে কৃষি পল্লীতে তাহার স্থত্রপাত হইয়া দিনে দিনে নিচে হইতে উপর পর্যন্ত তাহার ফাটল বিস্তৃত হইতে আরম্ভ করিবে।…বোঝা যাইতেছে, কর্তৃপক্ষের তরফ হইতে আমাদের দেশটাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়াটা একটা matter of great importance হইয়া উঠিয়াছে।… কর্তৃপক্ষ বলিতেছেন, আমরা নিতান্তই চাষীদের উপকার করিতে চাই।… ইংরেজের দেশেও চাষা যথেষ্ট আছে এবং সেখানে যে ভাষায় পাঠ্যগ্রন্থ লেখা হয়, তাহা সকল চাষার মধ্যে প্রচলিত নহে।…স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, ইংলণ্ডে চাষীদের শিক্ষা স্থগম করা যদিও নিশ্চয়ই matter of great importance, তথাপি ইংলণ্ডের সর্বত্র ইংরেজি ভাষার ঐক্য রক্ষা করা matter of greater importance.

বাংলাদেশের পাঠশালার বইগুলির ভাষা 'বড় বেশি সংস্কৃতায়িত', কমিটির এই মন্তব্যের সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথ ভাষাতত্ত্বের নিপুণ বিচার বিশ্লেষণ করে কমিটির পণ্ডিতদের বুঝিয়ে দিলেন, "আমাদের দেশে প্রাচীন ভাষার সহিত আধুনিক প্রাকৃত ভাষাগুলির…আকস্মিক সম্বন্ধ নহে, বরাবর সংস্কৃত ভাষার সহিত ইহার নাড়ীর যোগ রহিয়া গেছে।"[১৪]

রবীন্দ্রনাথ বললেন, ইংরেজের শাসন ব্যবস্থায় যেখানেই শাসনসন্ধি একটু আলগা হয়ে যাবার আশংকা দেখা দেবে অমনি সেখানে জোর করে দুটো পেরেক ঠুকে দেবার চেষ্টা হবে,—এটা ইংরেজের পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু আমাদের এ নিয়ে মেজাজ খারাপ না করে আত্মগঠনের চেষ্টা করতে হবে।

স্বায়ত্তশাসনের অধিকার আমাদের ঘরের কাছে পড়িয়া আছে—কেহ তাহা কাড়ে নাই এবং কোনোদিন কাড়িতে পারেও না। আমাদের গ্রামের, আমাদের পল্লীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পথঘাটের উন্নতি সমস্তই আমরা নিজে করিতে পারি—যদি ইচ্ছা করি, যদি এক হই ; এজন্য গবর্মেণ্টের চাপরাস বুকে বাঁধিবার কোনও দরকার নাই। কিন্তু ইচ্ছা যে করে না, এক যে হই না। তবে চুলায় যাক স্বায়ত্তশাসন ! তবে দড়ি ও কলসীর চেয়ে বন্ধু আর

১৪ "কর্তৃপক্ষের…সংকল্প বন্ধ হওয়াতে বঙ্গদর্শনে মুদ্রিত 'সফলতার সদুপায়' প্রবন্ধের উপরি-লিখিত ও তৎসময়োপযোগী অন্যান্য অংশ 'আত্মশক্তি'তে প্রবন্ধটি সংকলনের সময় বাদ দেওয়া হয়।" রবীন্দ্র-রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, গ্রন্থ-পরিচয়, পৃ ৬৪৭।

কেহ নাই !...একটি বৃহৎ স্বদেশী কর্মক্ষেত্র আমাদের আয়ত্তগত না থাকিলে আমাদিগকে চিরদিনই দুর্বল থাকিতে হইবে, কোন কৌশলে এই নির্জীব দুর্বলতা হইতে নিষ্কৃতি পাইব না।

১৩১২ সালের বিজয়াদশমীর পরের দিন বাগবাজারের পশুপতি বসুর বাড়ীতে এক মিলন-সভার অনুষ্ঠান হয়। এই সভায় রবীন্দ্রনাথ 'বিজয়া সম্মিলন' প্রবন্ধটি পাঠ করেন। তিনি বলেন, বঙ্গব্যবচ্ছেদের আঘাতে বাঙালীর হৃদয়ের দ্বার অর্গলমুক্ত হয়েছে, এই আঘাতের মধ্যে দিয়েই জেগেছে গভীর ঐকবোধ, একাত্মতার চেতনা, যার স্পর্শে স্বদেশের সত্যরূপকে বাঙালী দেখতে পেয়েছে। "এত দিন স্বদেশ আমাদের কাছে একটা শব্দমাত্র একটা ভাবমাত্র ছিল—আশা করি, আজ তাহা আমাদের কাছে বস্তুগত সত্যরূপে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।" স্বদেশের এই সত্যরূপের সাধনায় রবীন্দ্রনাথ সেদিন বাঙালীকে উদ্বুদ্ধ করে তুলে বলেন, বিদেশীর দয়ার ওপর নির্ভর না করে, সমস্ত প্রলোভনকে জয় করে, অপ্রমত্তচিত্তে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। অগ্রগতির এ পথ মোটেই সুগম নয়, দুর্যোগ হয়তো অদূরেই অপেক্ষা করছে। রবীন্দ্রনাথ তাই দেশবাসীকে সাবধান করে দিয়ে বললেন,

> আজ যাত্রারম্ভে এখনো মেঘের গর্জন শোনা যায় নাই বলিয়া সমস্তটাকে যেন খেলা বলিয়া মনে না করি। যদি বিদ্যুৎ চকিত হইতে থাকে বজ্র ধ্বনিত হইয়া উঠে তবে তোমরা ফিরিয়ো না, ফিরিয়ো না, দুর্যোগের রক্তচক্ষুকে ভয় করিয়া তোমাদের পৌরুষকে জগৎসমক্ষে অপমানিত করিয়ো না।

বাঙালীকে সেদিন এইভাবে এগিয়ে যাওয়ার সাহস দিয়েই রবীন্দ্রনাথ তাঁর কর্তব্য শেষ করেন নি, এই সঙ্গে দিয়েছিলেন এক সুচিন্তিত কর্মসূচী। 'রাখি-বন্ধনের উৎসব' সেই কর্মসূচীরই একটি অঙ্গ। রচনাটির আকার খুব ছোট এবং এটি তাঁর অন্য কোন গ্রন্থে বা রচনাবলীতে সংকলিত হয় নি।[১৫] কিছুটা অংশ এখানে উদ্ধৃত হল,

> সে দিন বাংলার পূর্ব বিভাগের সহিত পশ্চিম বিভাগের, উচ্চশ্রেণীর সহিত নিম্নশ্রেণীর, খৃষ্টান মুসলমানের সহিত হিন্দুর মিলন স্মরণের দিন—

১৫ ১৩৫৩ সালের ৩২শে শ্রাবণের দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রী পুলিনবিহারী সেনের 'রবীন্দ্র-চর্চা' দ্রষ্টব্য।

অতএব সেদিন প্রভু ও ভৃত্য ধনী ও দরিদ্র জাতিবর্ণ নির্বিশেষে পরস্পরের হস্তে রাখি বাঁধিয়া দিবেন। বর্তমান বৎসরে এই ৩০শে আশ্বিনে শুক্ল তৃতীয়া তিথি পড়িবে—এই তিথিকে আমরা রাখি তৃতীয়া নাম দিয়া উক্ত তিথিতে প্রতিবর্ষে বাঙালির মিলনোৎসব সম্পন্ন করিব। উক্ত তিথিতে সংযমস্বরূপ আমাদের অরন্ধন হইবে—চুল্লি না জ্বালিয়া আমরা ফল দুগ্ধ প্রভৃতি আহার করিব। উক্ত দিনে বাঙলার পূর্ববিভাগের লোকেরা পশ্চিমবিভাগের নিকট ও পশ্চিমবিভাগের লোকেরা পূর্ববিভাগের নিকট "ভাই ভাই এক ঠাঁই" এই লিখিত মন্ত্রসহ রাখিসূত্র পাঠাইয়া দিবেন। রাজার খড়্গ যে বিধাতার বন্ধনকে ছিন্ন করিতে পারে না ইহাই উপলব্ধি করিবার জন্য আমাদের এই রাখি-বন্ধনের উৎসব।

তিন

ইংরেজ শাসকদের অত্যাচার অনাচারের বিরুদ্ধে স্পষ্টভাষায় তীব্র প্রতিবাদ রবীন্দ্রনাথের এই সময়কার বহুরচনাতেই ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাঁর এই লেখাগুলিতে একটা ব্যাপক বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গি আমরা লক্ষ্য করি। ধর্ম, সমাজতত্ত্ব আর রাজনীতির মিলিত ভিত্তিতে পূর্ব-পশ্চিমের প্রকৃতিগত পার্থক্যই এগুলিতে প্রাধান্য পেয়েছে। তাই এই রচনাগুলি ঠিক প্রতিবাদের ক্ষেত্রে পড়ে না। অবশ্য এ কথা সত্য যে রবীন্দ্রনাথের কোন রচনাই আজকালকার রাজনৈতিক ভাষায় 'প্রতিবাদ' নয়। তবু ঘটনাবিশেষ অবলম্বন করে বা ব্যক্তিবিশেষের প্রতি ইংরেজের অবিচারের ব্যাপার নিয়েও তিনি কয়েকবার লেখনী ধারণ করেন; এবং প্রতিবাদের সুর এগুলিতে যতটা স্পষ্ট অন্য লেখায় ততটা নয়।

সোমেশ্বর দাস নামক এলাহাবাদ নিবাসী একজন ধনী ব্যাঙ্কারের বাড়ীতে তাঁর একজন ইংরেজ ভাড়াটে ফুলগাছের টব আনার জন্যে তার চাকরদের পাঠালে সোমেশ্বর বাবু তাতে বাধা দেন। ইংরেজ ভাড়াটেটি এই ব্যাপার নিয়ে আদালতে উপস্থিত হলে সোমেশ্বর বাবুর কারাদণ্ড হয়। এই ঘটনাটি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শনে লিখলেন, "কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রতি অবিচার মাসিক-পত্রের আলোচ্য বিষয় নহে। কিন্তু বর্তমান ব্যাপারটি ব্যক্তিবিশেষকে অবলম্বন করিয়া সমস্ত ভারতবাসীর প্রতি লক্ষ্য নিবেশ করিয়াছে।" সোমেশ্বর

দাসের কারাদণ্ডের সমর্থনে সেদিন 'পায়োনিয়ার' মন্তব্য করেছিল, ভারতবর্ষে বিভিন্ন জাতের লোকের মধ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্যে এ ধরণের কঠিন বিধানের প্রয়োজন আছে। প্রশ্নটা ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের একটি কুখ্যাত নীতি 'ল এণ্ড অর্ডার'-সংক্রান্ত, যাকে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে বলেছেন, 'দারোয়ানিতন্ত্র'।[১৬] ইংরেজ আদালতের এই মনুষ্যত্বহীন অবিচার আর পায়োনিয়ারের স্বার্থতুষ্ট মন্তব্যের প্রতিবাদ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন,

> যে সকল জাতি law abiding অর্থাৎ বিনা বিদ্রোহে আইন মানিয়া চলে, তাহাদেরই অপমান আদালতের কাছে তুচ্ছ। যাহারা কিছুতেই শান্তিভঙ্গ করিবে না তাহাদিগকে অন্যায় আঘাত করাও অল্প অপরাধ।··· বিচারের নিক্তিতে সক্ষম-অক্ষম এবং কালো-সাদায় ওজনের কম বেশি নাই। কিন্তু পলিটিকাল প্রয়োজন বলিয়া একটা ভারী জিনিষ আছে, সেটা যে-দিকে ভর করে সেদিকে নিক্তি হেলে। এদেশে ইংরেজের প্রতি দেশী লোকের অন্ধ সম্ভ্রম একটা পলিটিকাল প্রয়োজন, অতএব সেরূপ স্থলে সূক্ষ্ম বিচার অসম্ভব। ('রাষ্ট্রনীতি ও ধর্মনীতি')

সে-সময়ে রাস্তাঘাটে ফিরিঙ্গীদের অত্যাচার নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে উঠেছিল। প্রথম প্রথম এই অত্যাচার লোকে বিনা প্রতিবাদে নীরবে সহ্য করত; কিন্তু ক্রমে প্রতিবাদ করতে সুরু করল। শুধু মুখে নয়, হাতেও।[১৭] এই সময়ে বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর New India পত্রিকায় ঘুষির পরিবর্তে ঘুষি দিয়ে ইংরেজের অত্যাচার-অনাচারের প্রতিবাদ ও প্রতিবিধান করার নির্দেশ

১৬ "ইংরেজ-ধনী বাংলা দেশের রক্ত-নেংড়ানো পাটের বাজারে শতকরা চার পাঁচশো টাকা মুনাফা শুষে নিয়েও যে দেশের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে এক পয়সাও ফিরিয়ে দেয় না, তার দুর্ভিক্ষে বন্যায় মারী-মড়কে যার কড়ে আঙুলের প্রান্তও বিচলিত হয় না, যখন সেই শিক্ষাহীন, স্বাস্থ্যহীন উপবাস-ক্লিষ্ট বাংলা দেশের বুকেব ওপর পুলিশের জাঁতা বসিয়ে রক্তচক্ষু কর্তৃপক্ষ কড়া আইন পাশ করেন তখন সেই বিলাসী ধনী স্ফীত মুনাফার ওপর আরামের আসন পেতে বাহবা দিতে থাকে: বলে, 'এই তো পাকা চালে ভারত শাসন'।···ল এণ্ড অর্ডার রক্ষা হচ্ছে দারোয়ানিতন্ত্র, পালোয়ানের পালা; সিম্প্যাথি এণ্ড রেস্পেক্ট্ হচ্ছে ধর্মতন্ত্র, মানুষের নীতি।"

—পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারী (যাত্রী)

রবীন্দ্র-রচনাবলী, উনবিংশ খণ্ড, পৃ-৪১৬-১৭।

১৭ এই প্রসঙ্গে ভারতীর রচনাগুলি লক্ষণীয়।

দিয়ে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে লেখক অভিমত প্রকাশ করেন যে এশিয়াবাসী হয়তো সুযোগ পেলে 'রিফাইণ্ড্ পাশবিকতা'য় য়ুরোপীয়কে জয় করতে পারবে। বিপিনচন্দ্র ছিলেন বাংলা দেশে বৈপ্লবিক চিন্তাধারার অন্যতম প্রবর্তক এবং উগ্র স্বদেশপ্রেমের সমর্থক। এই ধরণের অভিমত প্রকাশ করা তাঁর পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এই ধরণের প্রতিবাদ বা প্রতিবিধান-রীতি রবীন্দ্রনাথ সমর্থন করতে পারেন নি। তিনি বিপিনচন্দ্রের এই 'রিফাইণ্ড্ পাশবিকতা'র সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে লিখলেন,

> সম্পাদক মহাশয় বলেন, আমরা যদি ঘুষির পরিবর্তে ঘুষি ফিরাইতে পারি, তবে রাস্তায়-ঘাটে ইংরাজকে অনেক অন্যায় হইতে নিরস্ত রাখিতে পারি। কথাটা সত্য—মুষ্টিযোগের মতো চিকিৎসা নাই—কিন্তু সম্পাদকের উপদেশ সহসা কেহ মানিতে রাজী হইবে না।···আমাদের পরিবার ভালোমানুষ হইবার, পরস্পরের অনুকূলকারী হইবার, একটি কারখানাবিশেষ। অতএব ঘুষি শিক্ষা করিলেও, মানুষের নাসিকাগ্রে ও চক্ষুতারকায় তাহা নির্বিচারে প্রয়োগ করিবার ক্ষিপ্রকারিতা আমাদের অভ্যাস হয় না।··· ইংরাজের গায়ে হাত দিতে গিয়া গ্রামসুদ্ধ দোষী-নির্দোষী বহুতর লোকের কিরূপ অসহ্য লাঞ্ছনা ঘটে, তাহার দৃষ্টান্ত আছে।···দেশীয়ের প্রতি উপদ্রব করিয়া ইংরাজ অল্পদণ্ড ও ইংরাজের গায়ে হাত দিয়া আমরা গুরুদণ্ড পাই, ইহার মধ্যে শুধু যে মনুষ্যধর্ম আছে তাহা নহে, তাহার সঙ্গে রাজধর্মও যোগ দিয়াছে। এ স্থলে ঘুষি তোলা কম কথা নয়।···অতএব আমাদের জীর্ণ-প্লীহা ইংরাজের বুটাগ্রের পক্ষে যেমন সহজ লক্ষ্য, ইংরাজের নাসাগ্র আমাদের বদ্ধমুষ্টির পক্ষে সেরূপ সুন্দর সুগম নহে। সে জন্য ইংরাজ যদি নিজেকে আমাদের চেয়ে বেশি বাহাদুর মনে করেন ত করুন—কিন্তু আমরা কেন ইংরাজের তরফ হইতে স্বজাতিকে বিচার করি? (রাজ-কুটুম্ব [১৮])

রবীন্দ্রনাথের এ মন্তব্যে বিপিনচন্দ্র তাঁকে একটু ভুল বুঝলেন। তিনি বোধ হয় মনে করলেন, এক গালে চড় খেয়ে অন্য গাল ফিরিয়ে দেওয়া রবীন্দ্রনাথের মত না হলেও চোখের জলে ভিজিয়ে আহত গালের ব্যথা দূর করার চেষ্টাই বুঝি রবীন্দ্রনাথের কাছে শ্রেয়। রবীন্দ্রনাথ বিপিনচন্দ্রের

১৮ রবীন্দ্র-রচনাবলীর ১০ম খণ্ডের পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

এই ভুল ধারণা নিরসনের জন্যে 'ঘুষাঘুষি' নামক প্রবন্ধটি প্রকাশ করেন। তিনি লিখলেন—

> ইংরাজের ঘুষিঘাষা খাইয়া নাকি সুরে নালিশ করা এদেশে কিছুকাল পূর্বে অত্যন্ত অধিক মাত্রায় প্রচলিত ছিল। একটা কাককে ঢেলা মারিলে পৃথিবীসুদ্ধ কাক যেমন চীৎকার করিয়া মরে, দেশী লোকের মার খাইবার খবরে আমাদের খবরের কাগজগুলি তেমনি করিয়া অবিশ্রাম বিলাপ-পরিতাপে আকাশ বিদীর্ণ করিত।
>
> আমরাই সর্বপ্রথমে 'সাধনা' পত্রিকায় এই নাকিকান্নার বিরুদ্ধে বারংবার আপত্তি উত্থাপন করিয়াছি—এবং যৎকিঞ্চিৎ ফললাভ করিয়াছি তাহাও দেখা যাইতেছে।

এর পরে রবীন্দ্রনাথ বিপিনচন্দ্রের ভুল ধারণা ভাঙার জন্যে যা লিখলেন, সেটা তাঁর লেখনী থেকে যেন আকস্মিক ভাবেই বেরিয়ে এল। ইংরেজ-সরকারের অত্যাচার-অনাচারের বিরুদ্ধে এমন সুস্পষ্ট ও সুতীব্র মন্তব্য এর আগে তাঁর লেখায় আর দেখা যায় নি—

> এ দেশে ইংরাজ অবিচারের বলেই আপনাকে বলী মনে করে। সেই বলের পশ্চাতে নিরাপদে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাহার অত্যাচার করিবার সহজ স্বত্বকে চিরস্থায়ী করিতে চাহে।···স্বত্বরক্ষা বা আত্মরক্ষা বা মানরক্ষার খাতিরে কোন ইংরাজের গায়ে হাত তুলিলে তাহার পরিণাম সুখজনক না হইতে পারে, এ আশঙ্কা স্বীকার করিয়াও যখন আমাদের দেশের লোক আঘাতের পরিবর্তে আঘাত করিতে শিখিবে, তখনই ইংরাজের কাপুরুষতার সংশোধন হইবে—এ অত্যন্ত সহজ কথাটি যদি অস্বীকার করি, তবে স্বভাবের নিয়ম সম্বন্ধে আমার সুগভীর অজ্ঞতা প্রকাশ করিব।

তবু এই স্বভাবের নিয়মকে রবীন্দ্রনাথ পূর্ণ সমর্থন জানাতে পারলেন না, কারণ এই স্বভাবের নিয়ম থেকেই বিদ্বেষ, বিদ্বেষ থেকে গুণ্ডামি আর গুণ্ডামি থেকে চরম মনুষ্যত্বহীনতার জন্ম। মনুষ্যত্বহীনতা প্রশ্রয় পেলেই সভ্যতা-সংস্কৃতির বিকাশের পথ যায় বন্ধ হয়ে। তাই স্বভাবের নিয়মকে সব ক্ষেত্রে নির্বিচারে মেনে চলাও একটা জাতির পক্ষে কল্যাণকর হতে পারে না। মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ববোধ জাগিয়ে তোলার কর্তব্যে আমাদের সমাজ অটুট-নিষ্ঠ। আর এই কারণেই মারামারির ব্যাপারে ইংরাজের কাছে আমাদের হঠ্‌তে

হয় ; সেটা "কেবল ভয়ে নয়—অনভ্যাসে।" মনে হয় এইখানেই বিপিনচন্দ্রের মতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতের পার্থক্য। পাশবিকতার যে কোন রিফাইণ্ড্ রূপ রচনা করা যায় এ ধারণা উগ্রপন্থী স্বদেশপ্রেমিকের কাছে মূল্য পেতে পারে, কিন্তু একজন স্থিতধী স্বদেশসাধকের কাছে তা অর্থহীন। তবু সময় বিশেষে আর অবস্থা বিশেষে নির্বিচারে সর্বশক্তি নিয়োগ করেও অন্যায়ের প্রতিকার করা উচিত। দেশবাসী এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে সেদিন যে কর্তব্য-নির্দেশ পেয়েছিল তা চিরকালের সত্য হলেও স্বদেশীযুগের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

> কিন্তু একটা অবস্থা আছে, যখন ফলাফল বিচার অসঙ্গত এবং অন্যায়। ইংরাজ যখন অন্যায় করিয়া আমাকে অপমান করে, তখন যতটুকু আমার সামর্থ্য আছে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিকার করিয়া জেলে যাওয়া এবং মরাও উচিত। ইহা নিশ্চয় জানিতে হইবে যে, হয় তো ঘুষায় পারিব না এবং হয় তো বিচারশালাতেও দোষী সাব্যস্ত হইব ; তথাপি অন্যায় দমন করিবার জন্য প্রত্যেক মানুষের যে স্বর্গীয় অধিকার আছে, যথাসময়ে তাহা যদি না খাটাইতে পারি, তবে মনুষ্যের নিকট হেয় এবং ধর্মের নিকট পতিত হইব। নিজের দুঃখ এবং ক্ষতি আমরা গণ্য না করিতে পারি, কিন্তু যাহা অন্যায় তাহা সমস্ত জাতির প্রতি এবং সমস্ত মানুষের প্রতি অন্যায় এবং বিধাতার ন্যায়দণ্ডের ভার আমাদের প্রত্যেকের ওপরেই আছে। বিদ্বেষ হইতে বাহাদুরি হইতে স্পর্দ্ধা হইতে নিজেকে সর্বপ্রযত্নে বাঁচাইয়া ন্যায় নীতির সীমার মধ্যে কঠিন ভাবে নিজেকে সংবরণ করিয়া দুষ্ট শাসনের কর্তব্য আমাদিগকে গ্রহণ করিতেই হইবে। ('ঘুষাঘুষি'[১৯])

'তোমারি তরে মা সঁপিনু দেহ'[২০] গানটি রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধক সংগীতগুলির মধ্যে প্রাচীনতম। অবশ্য 'একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন' গানটি কারো কারো মতে নাকি রবীন্দ্রনাথের কিশোর বয়সের রচনা। এ সম্বন্ধে সঠিক তথ্যের অভাবে প্রথম গানটিকেই সর্বপ্রাচীনতার গুরুত্ব দিতে হয়। তারপর

১৯ রবীন্দ্র-রচনাবলীর ১০ম খণ্ডের পরিশিষ্টে সংকলিত।

২০ ভারতী—আশ্বিন, ১২৮৪।

প্রয়োজনের তাগিদে বা অনুরোধে পড়ে তাঁকে এই জাতীয় আরো কয়েকটি গান লিখতে হয়েছিল। ১২৯৩ সালে কলকাতায় প্রথম কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষ্যে রচনা করেন—'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে'। অধিবেশনের উদ্বোধনের দিনে কবি নিজেই গানটি সভায় গেয়েছিলেন। ১২৯৪ সালে রবীন্দ্রনাথ আরো চারখানি দেশাত্মবোধক গান রচনা করেন—(১) 'আগে চল্ আগে চল্ ভাই' (২) 'তবু পারিনে সঁপিতে প্রাণ' (৩) 'কেন চেয়ে আছ গো মা মুখপানে' এবং (৪) 'আমায় বোলো না গাইতে বোলো না'। 'অয়ি ভুবন মনোমোহিনী' গানটি আরো কিছু কাল পরের রচনা।

বঙ্গভঙ্গের সময় দেশে স্বাদেশিকতার যে প্রবল বন্যা প্রবাহিত হয় তার আঘাতে রবীন্দ্রনাথ এক নতুন সাহিত্যচেতনা লাভ করেন। দেশাত্মবোধক প্রবন্ধ, কবিতা এবং গানের গতানুগতির রচনাধারাটি শেষ হল। এখনকার রচনাগুলি, বিশেষ করে গানগুলি আর অনুরোধ বা প্রয়োজনবোধ-প্রসূত নয়, সম্পূর্ণ প্রাণের আবেগে লেখা; শুধু মাতৃবন্দনা নয়, আত্মশক্তি-সন্দীপক। তাঁর এই গান ও কবিতাগুলি স্বদেশীযুগের দেশকর্মীদের অশেষ প্রেরণা দিয়েছিল। এই জাতীয় দুটি কবিতা এবং পাঁচটি গান বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়, বাঙালীর কাছে যেগুলির সুপরিচয়ের গৌরব এখনো ক্ষুণ্ণ হয় নি। তাই এখানে শুধু সেগুলির নামোল্লেখ মাত্র করা হল। কবিতা: 'প্রার্থনা', ('শতাব্দীর সূর্য আজি' ইত্যাদি, বৈশাখ, ১৩০৮) এবং 'নববর্ষের গান' ('হে ভারত, আজি নবীন বর্ষে' ইত্যাদি, জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৯)।[২১] গান: 'দেশের মাটি' (আশ্বিন, ১৩১২), 'ও আমার সোনার বাঙলা' (আশ্বিন, ১৩১২) 'হবেই হবে' ('নিশি দিন ভরসা রাখিস্' ইত্যাদি, কার্তিক, ১৩১২), 'দ্বিধা' ('বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি' ইত্যাদি, কার্তিক, ১৩১২), এবং 'অভয়' ('আমি ভয় করব না' ইত্যাদি, কার্তিক, ১৩১২)।

আত্মশক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত স্বদেশ-সাধনার যে নতুন গঠনমূলক আদর্শ রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীর সামনে তুলে ধরলেন তার অনুসরণে বা সমালোচনায় বঙ্গদর্শনে আরো অনেকেরই বিভিন্ন ধরণের রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। কারো কারো রচনায় নতুন বিষয় বা সমস্যারও আলোচনা আছে। এঁদের মধ্যে

---

২১ 'শিবাজী-উৎসব' ও অরবিন্দ ঘোষকে উদ্দেশ্য করে লেখা 'নমস্কার' কবিতা দুটিও বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়; প্রথমটি আশ্বিন, ১৩১১ ও দ্বিতীয়টি ভাদ্র, ১৩১৪।

উল্লেখযোগ্য হলেন,—ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এবং বিজয়চন্দ্র মজুমদার।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় (১৮৬১-১৯১০) : স্বদেশী যুগের সন্ধ্যা পত্রিকার একটি পৃষ্ঠাও আজ আর পাওয়া যায় না। কিন্তু সে সময়ে এই পত্রিকাটি বিপ্লবীদের হাতিয়ার ছিল। সম্পাদক ছিলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। এঁর আসল নাম ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ভাব এবং কর্মের বৈচিত্র্যে গড়া অদ্ভুত এঁর জীবন। প্রথমে ছিলেন ব্রাহ্ম, পরে হলেন খ্রীষ্টান, তার পরে বৈদান্তিক হিন্দু। খ্রীষ্টান হওয়ার পর ইনি যে নাম গ্রহণ করেন তার মধ্যে সনাতন হিন্দুপ্রথা এবং খ্রীষ্টীয় মতের অপূর্ব সমন্বয় দেখা যায়। নিজেই নিজের নামের ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বন্দ্য' ত্যাগ করে তিনি রাখলেন শুধু উপাধ্যায়, অর্থাৎ শিক্ষক। বন্দ্য বা প্রশংসিত হবার যোগ্য তিনি নন; আর খ্রীষ্টান হবার জন্যে তিনি নাম নিলেন 'ব্রহ্মবান্ধব'। তাঁর সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে শ্রদ্ধাস্পদ ডাক্তার সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন,—"খ্রীষ্টান হইলেও ব্রহ্মবান্ধব ভারতীয় পন্থা পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি খ্রীষ্টান ধর্মের সঙ্গে ভারতীয় সন্ন্যাস-সাধনার কোন বিরোধ দেখিতে পান নাই। আগে ভারতবর্ষ সব ধর্মকে আত্মসাৎ করিয়াছে। এখন ব্রহ্মবান্ধব চাহিলেন খ্রীষ্টীয় ধর্মকেও ভারতীয় করিতে।"[২২] রবীন্দ্রনাথ এঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। মত এবং আদর্শের দিক থেকেও দুজনের মধ্যে অনেক মিল ছিল। শান্তিনিকেতনে বিদ্যায়তন গড়ে তোলার কাজে ব্রহ্মবান্ধবই ছিলেন রবীন্দ্রনাথের প্রথম সহযোগী। শেষ জীবনে ব্রহ্মবান্ধবের আকস্মিক মত পরিবর্তন ঘটে। বৈদান্তিক সন্ন্যাসী হয়ে যান বৈপ্লবিক দেশভক্ত। শেষে রাজদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে বিচারাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু ঘটে। তিনি মনে করতেন, স্বদেশ-সাধনায় তাঁর কর্তব্য বিধাতৃ-নির্দিষ্ট। মামলার সময় নিজের আচরণ সম্বন্ধে তিনি যে তেজদৃপ্ত উত্তর দেন তাতে আবেগের ভাগ যতই থাক, তাঁর অন্তরের সত্য পরিচয়টিও গোপন থাকে নি।

সন্ধ্যা ছাড়া ব্রহ্মবান্ধব আরো দুটি পত্রিকা কিছুদিন পরিচালনা করেছিলেন—স্বরাজ (সাপ্তাহিক) এবং করালী (অর্ধ-সাপ্তাহিক)। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়,

২২ "বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস", ডাঃ সুকুমার সেন, ৪র্থ খণ্ড, পৃ ২৯।

সন্ধ্যা কাগজেই "প্রথম দেখা গেল বাংলাদেশে আভাসে-ইংগিতে বিভীষিকা-পন্থার সূচনা।" এই পত্রিকায় যে-সব প্রবন্ধ প্রকাশিত হত, সেগুলির মধ্যে অধিকাংশই ইংরেজ সরকারকে গালিগালাজ এবং এই সরকারের প্রতি বিদ্রূপ-কটাক্ষ ছাড়া কিছু নয়; সেগুলির ভাষা ও ভঙ্গি স্থূল; কিন্তু তবু সে-যুগের ইতিহাস আলোচনায় এই লেখাগুলির বিশেষ মূল্যকে অস্বীকার করার উপায় নেই।

ব্রহ্মবান্ধবের বহু রচনা বিভিন্ন পত্রিকার পৃষ্ঠাতে ছড়িয়ে রয়েছে। তাঁর চারখানা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল বলে জানা যায়—'সমাজ'[২৩] 'ব্রহ্মামৃত' (১৩০৯), 'পাল-পার্বণ' এবং 'আমার ভারত উদ্ধার'। এখানে তাঁর মাত্র দুটি প্রবন্ধের উল্লেখ করব—'তিন শত্রু' (শ্রাবণ—১৩০৮) এবং 'ভারতের অধঃপতন' (মাঘ, ১৩০৮)। দুটি প্রবন্ধই 'সমাজ' এবং 'সমাজ-তত্ত্ব' নামক গ্রন্থ দুটির অন্তর্গত। 'ভারতের অধঃপতন' নামক প্রবন্ধটির নাম পরিবর্তন করে 'হিন্দু জাতির অধঃপতন' রাখা হয়। 'তিন শত্রু' প্রবন্ধের প্রারম্ভেই লেখক বলছেন—

> কথায় বলে, 'তিন শত্রু দিতে নাই', কিন্তু এমনি আমাদের পোড়া-কপাল যে, ভারতের ভাগ্যদেবতা জীবজ্জাগ্রৎ তিন তিন জন বৈরী আমাদের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের প্রকোপে আমাদের জাতীয় জীবনলীলার শেষ পালা সমাসন্নপ্রায়।

এই বলে লেখক এই তিন শত্রুর পরিচয় দিয়েছেন। তারা হল—(১) "বৃথাভিমানী 'হিন্দু'-'হিন্দু'-রব নির্ঘোষকারী গোঁড়ার দল" (২) "ইংরাজী-নবিশ হিন্দুনামধারী রামপক্ষীভক্ষীর দল" এবং (৩) "সমন্বয়বাদীর দল"। তৃতীয় দলের সম্বন্ধে লেখক এক জায়গায় মন্তব্য করেছেন—

> আমরা বড় ধ্যান করিতে ভালোবাসি, সদাই স্তিমিত-লোচন, আর য়ুরোপীয়েরা কেবল দৌড়ঝাপ করে; এস আমরাও দৌড়াই, কিন্তু চক্ষু মুদিয়া।···আমরা কদলিপত্রে ভোজন করি, আর সাহেবেরা টেবিলে খায়; এস আমরা টেবিলে কলাপাতা বিছাইয়া খাই।

মনে রাখা দরকার, সন্ধ্যা পত্রিকার রাজনৈতিক রচনাগুলির আগে ব্রহ্ম-বান্ধবের রচনার বিষয় ছিল বিশেষ করে সমাজতত্ত্ব।

২৩ এই গ্রন্থের রচনাগুলি 'সমাজ-তত্ত্ব' নাম দিয়ে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় পুনরায় প্রকাশ করেন। প্রকাশ—১৩১৭।

'ভারতের অধঃপতন' প্রবন্ধে লেখক ভারতের প্রকৃত ইতিহাস না থাকার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। এই প্রসঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার মধ্যে ভারতের অধঃপতনের তিনটি কারণ প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছেন—(১) অহৈতুক কর্ম জন্য নৈসর্গিক অবসাদ, (২) আর্য অনার্যের অত্যুদার সম্মেলন এবং (৩) বৌদ্ধ-বিদ্রোহ।

বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮-১৯৩২)ঃ ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে স্বদেশীযুগ একটি বিশিষ্ট অধ্যায়। যে-কজন মুক্তি-সাধকের আত্মত্যাগ ও কর্মনিষ্ঠায় এই অধ্যায়টি রচিত হয়েছিল তাঁদের মধ্যে বিপিনচন্দ্র পালের নাম সহজেই মনে পড়ে। বিশ শতকের সূচনায় বাংলা দেশের স্বাদেশিকতার নবরূপায়ণে অন্যতম রূপকার বিপিনচন্দ্র। আর এই পরিচয়ের সুদৃঢ় ভিত্তিতেই তিনি চির-প্রতিষ্ঠ। তিনি ছিলেন অসাধারণ বাগ্মী। সাংবাদিক ও সাহিত্যিক হিসাবেও তাঁর পরিচয় নগণ্য নয়। রাজনৈতিক সমস্যা, সমাজতত্ত্ব এবং ধর্মজিজ্ঞাসা তাঁর রচনার প্রধান বিষয়বস্তু। তত্ত্বচিন্তা আর সমস্যা বিশ্লেষণের দিক থেকে বিপিনচন্দ্রের শক্তিমত্তা অনস্বীকার্য। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও স্বীকার করতে হয় যে, বিশ শতকের সুরুতে বাংলা সাহিত্য বিকাশের যে নবায়ণ গ্রহণ করেছিল বিপিনচন্দ্র ঠিক সে পথে চলতে পারেন নি। এর জন্যে অবশ্যই দায়ী তাঁর পিছিয়ে-থাকা সাহিত্য-বোধ। "এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে সমাজে এবং যুগচিন্তায় যে পরিবর্তনটি ধীরে ধীরে ঘটছিল বিপিনচন্দ্র তার সবটুকুই গ্রহণ করতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি-আশ্রয়ী স্বাধীন বিচারণাতেই আধুনিক যুক্তি-ধর্মী রচনার লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে।"[২৪] অবশ্য এ লক্ষণ বিপিনচন্দ্রের রচনাতেও যে একেবারেই দুষ্প্রাপ্য তা নয়। রবীন্দ্রনাথের রচনায় যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রকাশনার পরিচয় ফুটে উঠল বিপিনচন্দ্র তা সমর্থন করতে পারেন নি। সংস্কার-বদ্ধ সাহিত্য-দৃষ্টি আর ব্যক্তিগত সাহিত্যানুভূতির প্রসারণ শক্তির অভাবেই বিপিনচন্দ্রের কাছে রবীন্দ্র-সাহিত্য অস্পষ্ট ও অবাস্তব বলে মনে হয়েছিল। অবশ্য তাঁর রচনায় তিনি যে বলিষ্ঠতা, সমাজ-সচেতনতা এবং বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় রেখে গেছেন, তা চিরকালই প্রশংসার দাবি রাখবে।

---

২৪ 'বিপিনচন্দ্র পাল : নবযুগের সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব'—ভবতোষ দত্ত, বিশ্বভারতী পত্রিকা, জন্মশতবার্ষিকী সংখ্যা, পৃ—১৬২

রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনাকালেই বিপিনচন্দ্রের কয়েকটি স্বাদেশিকতা-মূলক রচনা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ এই পত্রিকার সম্পাদনা ত্যাগ করার পর থেকে (১৩১২ সালের শেষে) তাঁর রচনার সংখ্যা এতে বৃদ্ধি পায়। সামাজিক ও রাজনীতিক অবস্থার বিচার-বিশ্লেষণের দিক থেকে তাঁর এই রচনাগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এগুলি হল,—'রাজা ও প্রজা' (আশ্বিন, ১৩১২), 'বঙ্গচ্ছেদে বঙ্গের অবস্থা' (কার্তিক এবং অগ্রহায়ণ ১৩১২), 'নেশান্ বা জাতি' (শ্রাবণ, ১৩১৩) 'শিবাজী-উৎসব' (ভাদ্র, ১৩১৩), 'শিবাজী-উৎসব ও ভবানী-মূর্তি, (আশ্বিন, ১৩১৩), 'প্রাদেশিক সমিতি' (চৈত্র, ১৩১৩), 'রাজভক্তি' (শ্রাবণ, ১৩১৪), 'কংগ্রেসী কথা' (বৈশাখ, ১৩১৫), 'আধুনিক শিক্ষার আদর্শ ও জবরদস্তির লোক শিক্ষা' (শ্রাবণ, ১৩১৯) এবং 'ভারতের ভবিষ্যৎ ও লর্ড হার্ডিঞ্জের শাসননীতি' (মাঘ, ১৩১৯)। এই প্রবন্ধগুলির কয়েকটির সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করা হল।

সিপাহী বিদ্রোহের নির্যাতনের কথা ইংরেজ ভুলতে পারে নি; তবু দেখা গেল এই বিদ্রোহের পরেই মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতবাসীর প্রতি নানা রকম আনুকূল্যের প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করলেন। কিন্তু—

> ক্রমে ইংরেজ সে উদারনীতি বর্জন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহাতে ইংরেজের কোনই অপরাধ আছে বলিয়া মনে করি না। ইংরেজের সে উদারনীতি ধর্মের দ্বারা প্রণোদিত হয় নাই, সংকীর্ণ স্বার্থেরই উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আজও যদি আপনার স্বার্থরক্ষার জন্য সে উদারতা আবশ্যক মনে করিত ইংরেজ প্রাণপণে তাহা অবলম্বন করিয়া চলিত। কিন্তু আজ ইংরেজ ভারতে অভয়পদ পাইয়াছে। প্রজামণ্ডলী দুর্বল, নিঃস্ব, নিরস্ত্র ও নিবীর্য হইয়া পড়িয়াছে। ইংরেজের সাম্যনীতি শ্বেতকৃষ্ণের ভেদ নষ্ট করিতে পারে নাই, কিন্তু জমিদার ও প্রজার পরস্পরমুখাপেক্ষী সম্বন্ধকে চিরদিনের জন্য ছিন্ন করিয়া দিয়াছে। প্রজার উপরে জমিদারের আর কোন অধিকার নাই। ইংরেজ রাজত্বে জমিদার অপেক্ষা জমাদার প্রবলতর হইয়া উঠিয়াছে।··· ইহা রাজনীতির সার্বভৌমিক অভিজ্ঞতা। ইংরেজের আধুনিক অত্যাচার-প্রবণতা ভারতের প্রকৃতিপুঞ্জের নিশ্চেষ্টতা ও বীর্যহীনতারই প্রতিফল। ('রাজা ও প্রজা')

'বঙ্গচ্ছেদে বঙ্গের অবস্থা' প্রবন্ধটি বিপিনচন্দ্রের অনন্যসাধারণ বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গির

পরিচয় বহন করছে। পর পর দুটি সংখ্যায় এই দীর্ঘ প্রবন্ধটি সমাপ্ত। এই সময় অরবিন্দ ঘোষ এবং প্রমথনাথ মিত্রের সঙ্গে গুপ্ত সমিতি গঠনের কাজে তিনি সচেষ্ট হয়ে উঠেছিলেন ; তাই দেখা যায় বৈপ্লবিক কর্মপন্থা গ্রহণের জন্যেও এই প্রবন্ধে দেশবাসীর প্রতি প্রচ্ছন্ন ইংগিত রয়েছে।

সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে লেখক প্রথমেই প্রমাণ করলেন যে এই বঙ্গবিভাগের ফলে অনেকে যা আশংকা করছেন অর্থাৎ বাঙালীর মানসিক বা নৈতিক বা অর্থগত বা সমাজগত অনিষ্টপাত, তার কোনটারই কোন সম্ভাবনা নেই। কিন্তু "আসল কথাটা এই যে ইহার দ্বারা ইংরেজ এমন একস্থানে কুঠারাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছে যাহার উপরে আমাদের সকল ভবিষ্যৎ উন্নতি ও মুক্তি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে।" এই কথা বলে তিনি ইংরেজের তথাকথিত সুশাসনের স্বরূপটি নির্ভীকভাবে উদ্ঘাটন করে দিলেন। এই অংশটিতে তাঁর রাজনীতিজ্ঞান ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি সুস্পষ্ট।

> ইংরেজের কুটিল রাজনীতি উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে,—আগ্রা ও অযোধ্যায়—হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যে বিদ্বেষ-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিয়াছে, বাঙ্গলাতেও এই বঙ্গবিভাগের পরে, তাহা করিতে চেষ্টা করিবে। মুসলমান সম্প্রদায় নানা কারণে এখনো ইংরেজের মুখাপেক্ষী হইয়া চলাকেই শ্রেয়স্কর মনে করেন। পূর্ববঙ্গের মুসলমান সম্প্রদায়ের কোন কোন নেতা ইতিমধ্যেই এই বঙ্গবিভাগ বিষয়েই, ইংরেজ নীতির সমর্থন করিয়াছেন। এই সকল অনুচরের সাহায্যে আপনার কুটিল ভেদনীতি প্রতিষ্ঠা করিয়া ইংরেজ বঙ্গবিভাগ হইয়া গেলে পূর্ববঙ্গে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিবিধ রাজকীয় ব্যাপারে ঈর্ষাদ্বেষ উৎপাদন ও পরিপোষণ করাইয়া, বাঙ্গালীর রাজনৈতিক শক্তিকে অক্ষম করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিবে। পশ্চিমবঙ্গে এইরূপ ভেদনীতি প্রচার করিয়া উড়িষ্যাবাসী ও বেহারবাসীদের সাহায্যে মুষ্টিমেয় বাঙ্গালীকে চাপিয়া রাখিতে চেষ্টা করিবে এবং পূর্ববঙ্গে চা-কর সম্প্রদায় ও পশ্চিমবঙ্গে ইংরেজ বণিকমণ্ডলী ও বেহারের নীলকর দল, উভয়ত্রই হিন্দু মুসলমানকে চাপিয়া রাখিবে। এইজন্যই আমি মনে করি যে বঙ্গবিভাগ কেবল বাঙ্গলার নহে, কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষের নবোন্মেষিত জাতীয় জীবনের উপর বিষম কুঠারাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছে।

কিন্তু বাঙালী তথা সমগ্র ভারতবাসীকে যদি এই প্রচণ্ড বিপৎপাতের হাত

থেকে রক্ষা পেতে হয় তা হলে দেশেবিদেশে শুধু আন্দোলন চালালে চলবে না। বিপিনচন্দ্রের মতে,—

> এই সকল নিষ্ফল আন্দোলনে শক্তি ক্ষয় না করিয়া এখন আমাদিগকে আপনাদিগের শক্তি সংগ্রহ করিয়া, আত্মশক্তি প্রয়োগে এই অনিষ্ট নিবারণের আয়োজন করিতে হইবে।

বঙ্গদর্শনে কতকগুলি রচনা প্রকাশিত হয়েছিল যেগুলির শেষে শুধু 'শ্রীঃ'-এর উল্লেখ আছে। এই 'শ্রীঃ'-রচিত 'স্বদেশী বা পেট্রিয়টিজ্‌ম্' নামক একটি প্রবন্ধ ১৩১২ সালের চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধটি সম্বন্ধে ১৩১৩ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় ইন্দ্রনাথ দেবশর্মা এবং আষাঢ় সংখ্যায় অজিতকুমার চক্রবর্তী কতকগুলি প্রশ্ন উত্থাপন করেন। তাঁদের সমালোচনা এবং প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বিপিনচন্দ্র 'নেশন্ বা জাতি' প্রবন্ধটি রচনা করেন। এই প্রবন্ধটির শিরনামার নিচে লেখা আছে 'স্বদেশী বা পেট্রিয়টিজ্‌ম্ প্রবন্ধের অনুবৃত্তি'। সুতরাং এর থেকে ধারণা করা মোটেই অমূলক হবে না যে, 'শ্রীঃ'-রচিত অন্যান্য লেখাগুলিও বিপিনচন্দ্রের। এ প্রসঙ্গে যথাস্থানে আলোচনা করব।

রবীন্দ্রনাথ নেশন্‌তত্ত্বের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা বিশ্বপ্রেমের প্রেরণাপুষ্ট। যে স্বাজাত্যবোধ বিশ্বমানবিক চেতনার আলোকে পরিশুদ্ধ হয়ে ওঠে নি তার সংকীর্ণতায় রবীন্দ্রনাথ ব্যথিত হয়েছেন। কোন দিন একে তিনি স্বীকার করেন নি। কিন্তু বিপিনচন্দ্র এই বিশুদ্ধ আদর্শবাদীর দৃষ্টিতে নেশনতত্ত্বের বিচার করেন নি। তাঁর বস্তুনিষ্ঠ মনোধর্ম বাস্তবতার ভিত্তিতেই এই তত্ত্বের বিচার করেছে। তাই তাঁর কাছে দেশপ্রেম বা পেট্রিয়টিজ্‌মের উৎস 'নেশন-অভিমান'। তিনি লিখলেন,

> দুই দল লোক এই দেশচর্যের বিরোধী। একদল স্বদেশপ্রেমকে বিশ্বমানবের উদার প্রেমের বিরোধী বলিয়া মনে করে; অপর দল যে সকল উপকরণে নেশন্ গঠিত হয়, আমাদের মধ্যে সে সকল উপকরণ আছে, ইহা বিশ্বাস করে না।
>
> প্রথমত বিশ্বপ্রেমিকের কথা। ইহারা একপ্রকার নিতান্ত নিরাকার, মানবপ্রেমের ভান করিয়া থাকে। ইহাদের প্রাণে পেট্রিয়টিজ্‌ম্ বলিতে যে উদ্বেল, উচ্ছ্বসিত জীবনাভিরাম স্বদেশপ্রীতি ও স্বদেশচর্য বোঝায়, তাহা কদাপি জাগ্রত হয় নাই। আমার নেশন্, আমার জাতি, আমার স্বদেশ

বলিতে যে মুখভরা উল্লাস, বুকভরা আশা, প্রাণভরা উদ্যম, যে আশিস, আনন্দ ও গৌরবভাব স্ফুরিত হইয়া উঠে,—ইহাদের সে-ভাবের কোনই আস্বাদন ও অভিজ্ঞতা নাই।···এইরূপ একান্ত অভেদাত্মক বিশ্বপ্রেম বা মানবপ্রেম সত্যই হউক আর কল্পিতই হউক সর্বথাই দেশচর্য বা পেট্রিয়টিজ্‌মের সম্পূর্ণ বিরোধী।

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে এই মন্তব্যের মধ্যে দিয়ে বিপিনচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের মতের প্রতিবাদ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মতো তিনি বিশ্বপ্রেমের ভিত্তির ওপর স্বদেশপ্রেমকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি বরং স্বদেশপ্রেমের ভিত্তির ওপরেই বিশ্বপ্রেমকে বসাতে চেয়েছেন। তাঁর পরিষ্কার বক্তব্য হল, "সত্য অভেদজ্ঞান ভেদের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়; প্রকৃত উদার বিশ্বজনীন মৈত্রীও সেইরূপ ভেদপ্রাণ স্বদেশচর্যের মধ্য দিয়াই সাধিত হয়, অন্য উপায়ে নহে।"

লেখক তিন রকম স্বাতন্ত্র্যের কথা বলেছেন যে-গুলির মধ্যে দিয়ে নেশন্-অভিমান স্বদেশচর্যা বা পেট্রিয়টিজ্‌ম্‌কে স্ফুরিত করে তোলে। সেই তিনটি স্বতন্ত্র্য হল—'আমার দেশ' 'আমার ধর্ম' এবং 'আমার সভ্যতা-সাধনা'। এই প্রসঙ্গে প্রবন্ধের শেষে তিনি মন্তব্য করেছেন, "কিন্তু দেশগত পরিচ্ছিন্নতা এবং রাজনৈতিক স্বার্থের বন্ধন যে পরিমাণে নেশন্-অভিমানকে পরিস্ফুট করে এমন আর কিছুতেই করে বলিয়া মনে হয় না।" ('নেশন্ বা জাতি')। কিন্তু কয়েক বছর পরেই বিপিনচন্দ্রের এই মত বদলে গিয়েছিল; রাজনৈতিক স্বার্থপুষ্ট নেশন্-অভিমান থেকে যে পেট্রিয়টিজ্‌মের জন্ম তখন তিনি আর তাকে সমর্থন করতে পারেন নি। এবং এ বিষয়ে তখন তিনি যা মন্তব্য করেছিলেন তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতের মিল খুঁজে পাওয়া শক্ত নয়। বিপিনচন্দ্র লিখলেন,—

> In Europe, Nationalism can never get rid, therefore, of its political incumbus. It can not, without a much deeper analysis of the social life and experience, be raised to the dignity of a philosophy or the sanctity of a religion······Patriotism in Europe is, therefore, mainly a geographical virtue. It has only a supreme territorial reference.[২৫]

---

২৫ *Nationality and Empire* : **Bipin Chandra Paul. p-77.**

বিপ্লবী-বাংলা মহারাষ্ট্রের কাছ থেকে যথেষ্ট প্রেরণা লাভ করেছিল। লোকমান্য তিলক ১৮৯৭ সালে মহারাষ্ট্রে শিবাজী-উৎসবের প্রচলন করেন। তারপর প্রধানত সখারাম গণেশ দেউস্করের প্রচেষ্টায় এই অনুষ্ঠানটি বাংলা দেশে প্রবর্তিত হয়। ১৩১৩ সাল থেকে এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে সিংহ-বাহিনী ভবানী-মূর্তির এবং গুরু রামদাসের সংশ্রব গড়ে ওঠে। ফলে নানারকম প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। অনুষ্ঠানটি যে হিন্দুভাবাপন্ন এ কথা অস্বীকার করার উপায় ছিল না; তার সঙ্গে মূর্তিপূজা ও ধর্মের সংযোগ হওয়াতে অনেকে পৌত্তলিকতার অভিযোগ আনলেন; আবার কেউ বা এটি রাজনৈতিক অনুষ্ঠান এই ধারণায় ধর্মের সঙ্গে এর সংযোগ অকল্যাণকর বলে অভিমত প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানটির ব্যাপারে এই ধরণের প্রশ্ন-সমস্যা নিয়ে রচিত বিপিনচন্দ্রের দুটি প্রবন্ধই মূল্যবান। লেখকের মতের প্রতি পূর্ণ স্বীকৃতি জানানো সম্ভব না হলেও তাঁর সমাজ- ও রাষ্ট্র-চেতনার পরিচয়ে এবং সূক্ষ্ম অবধারণ ক্ষমতায় মুগ্ধ হতে হয়। দুটি প্রবন্ধ থেকেই সামান্য অংশ উদ্ধৃত হল,—

> ধর্মকে যদি জাতীয় জীবনের বাহিরে না রাখিতে হয় তবে হিন্দু-মুসলমানে মিলিত হইয়া ভারতে এক বিশাল জাতীয় জীবনের প্রতিষ্ঠা হইবে কিরূপে? ইহাই বর্তমান যুগের প্রধান সমস্যা। ভারতের ভবিষ্য জাতীয়-জীবন ফেডারেশনের আদর্শে গঠিত হইবে। এই জীবনের এক অঙ্গ হিন্দু, অপর অঙ্গ মুসলমান, তৃতীয় অঙ্গ খৃষ্টীয়ান থাকিবেই থাকিবে। কিন্তু ইহারা প্রত্যেকে আপন আপন বিশেষত্বকে রক্ষা করিয়া ও সেই বিশেষত্বেরই বিকাশ সাধনের দ্বারা ভারতের সাধারণ জাতীয় জীবনকে পরিপুষ্ট করিবে।

সুতরাং লেখকের মত, এই আদর্শকে প্রতিপালন করতে হলে, জাতীয় জীবনের মধ্যে সব ধর্ম, সাহিত্য, আচার-অনুষ্ঠান ও সাধনার প্রতিফলন থাকবে; "আর এই আদর্শ যাঁহারা আয়ত্ত করিয়াছেন, তাঁহারা শিবাজী উৎসবের হিন্দুত্বে ভারতে জাতীয়-জীবন গঠনের ও জাতীয়-একত্ব সম্পাদনের কোন ব্যাঘাত উৎপাদন করিবে, এরূপ আশংকা করিতে পারেন না।" ('শিবাজী উৎসব')

শিবাজী-উৎসবের সঙ্গে, ভবানী-মূর্তি এবং গুরু রামদাসের সংশ্রবকে সমর্থন করে বিপিনচন্দ্র লিখলেন,—

> শিবাজীর চরিত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে গেলে যেমন ভবানীকে ছাড়িলে চলিবে না, তেমনি রামদাসকেও ছাড়িলে চলিবে না। ফলত ভবানী ও

রামদাস পরস্পরের সঙ্গে অচ্ছেদ্য অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াই শিবাজীর নিকট প্রকাশিত হইয়াছিলেন।…

আমাদের আজকালকার ভাব ও ভাষায় শিবাজীর এই উদ্দীপনা ও প্রেরণাকে ব্যক্ত করিতে গেলে আমরা ইহাকে জাতীয় শক্তি নামে হয় ত অভিহিত করিব। যখন যে দেশে যে-কোন ব্যক্তি স্বদেশ ও স্বজাতির উদ্ধার সাধনে বদ্ধপরিকর হন, তখনই তাঁহার মধ্যে এই শক্তি কার্য করিয়া থাকে। এই জাতীয় মহাশক্তি, এই spirit of the race-এর দ্বারা অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ না হইলে, কেহ কদাপি স্বদেশের জন্য সত্যভাবে আত্মোৎসর্গ করিতে পারেন না।…ইহুদীরা রোমক শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া, খৃষ্ট জন্মকালে, এই মহাশক্তিকে,—আপনাদের এই সনাতন spirit of the race-কেই মশি বা Messiah নামে অভিহিত ও তাহার প্রতীক্ষায় পরাধীনতার সমুদয় ক্লেশযন্ত্রণা সহ্য করিয়াছিল। ফরাসী-বিপ্লবকালে ফরাসীরা এই মহাশক্তিকেই স্বাধীনতা (liberty) নামে ভজনা করিয়াছিল……। জাপানবাসিগণ মিকাডোর মধ্যে আপনাদের এই Race spirit-কেই প্রত্যক্ষ করে, এবং স্বজাতির সনাতন মহাশক্তি ও মহাপ্রাণতার প্রকট-মূর্তি ও প্রত্যক্ষ বিগ্রহরূপেই তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া একই সঙ্গে দেশভক্তি ও রাজভক্তির চরম চরিতার্থতা লাভ করিয়া থাকে। এই জাতীয় শক্তি, এই spirit of the race-ই শিবাজীর নিকটে ভবানীরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল।[২৬] ('শিবাজী-উৎসব ও ভবানী মূর্তি')

২৬ যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী বিপিনচন্দ্রের এই মতের সমালোচনা করে ১৩১৪ সালের আশ্বিন মাসের বঙ্গদর্শনে 'শিবাজী-উৎসব' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এখানে তাঁর মতও কিছুটা স্মরণ করা যেতে পারে,—

"শিবাজী ভবানীর উপাসনা করিতেন; ইহাতে এইটুকু তাহার চরিত্রের বুঝিতে পারি যে তিনি ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ ছিলেন। ইহা বীরের একটি সদ্‌গুণ। কিন্তু তাই বলিয়া ভবানীকে বাদ দিয়া শিবাজী চরিত্র কেন বুঝিতে পারিব না তাহার কোন যুক্তি পাই না।…আমরা যখন শিবাজীকে ভবানীর উপাসক রূপে দেখি, তখন তিনি জগন্মাতা আদ্যাশক্তির উপাসনা করিতেছেন, তাহাই মনে করি,—অন্য কোন ভাবে আমরা তাঁহার ভবানী-উপাসনাকে গ্রহণ করিতে পারি না। জাতীয়-শক্তিই বলুন বা race-spirit-ই বলুন বা liberty-ই বলুন এরূপ কোন নামে তাঁহার হৃদয়স্থিত অমূর্ত-শক্তিকে অভিহিত করিতে কোন হিন্দুই প্রস্তুত হইবেন না।"

'কংগ্রেসী কথা' প্রবন্ধে বিপিনচন্দ্র প্রথমে কংগ্রেসের তৎকালীন মনোভাবের সুস্পষ্ট সমালোচনা করলেন, তারপর ভারতবাসীর প্রতি ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর অসংগত বাৎসল্যের অন্তর্নিহিত কুটিলতার দিকে ইঙ্গিত করে দেশবাসীর মনে ন্যায্য অধিকারবোধ উদ্দীপ্ত করে তুলতে চেষ্টা করলেন।

> কংগ্রেস যে-দুটি মুখ্য প্রার্থনা মুখে লইয়া ভূমিষ্ঠ হয়, সে-দুটিরই মূল উদ্দেশ্য বৃটিশ শাসনকে উন্নত ও নিষ্কণ্টক করা, ব্রিটিশ প্রভুশক্তিকে ভারতের প্রজাশক্তির আনুকূল্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার স্থায়িত্ববিধান করা।

কিন্তু যে-দিন থেকে দেশবাসীর চেতনা হল, যে-দিন থেকে স্বাধীকার প্রতিষ্ঠায় দেশবাসী ব্যস্ত হয়ে উঠল, সে-দিন ইংরেজের মুখে শোনা গেল, 'আগে যোগ্যতা পরে আকাঙ্ক্ষা, আগে উপযুক্ত হও পরে অধিকার চাহিও।' কংগ্রেসী নেতারা তখন সাহস করে এইটুকু বলতে পেরেছিলেন যে, আমাদের উপযুক্ততার অভাব আর নেই, ইংরেজ শুধু আমাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্যে আমাদের যোগ্যতাকে অস্বীকার করছে। আর নিজেদের এই যোগ্যতা প্রতিপাদনের নিষ্ফল চেষ্টাতেই তখন কংগ্রেসের সর্বশক্তি নিয়োজিত ছিল। কিন্তু সে-দিন যে-কথা কংগ্রেসী নেতারা বলার সাহস পান নি; বিপিনচন্দ্র তাঁর এই রচনায় অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে সেই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

> আমাদের যোগ্যতা-অযোগ্যতার বিচারক তোমরা নও, তোমরা হইতে পার না।···অভিভাবকের অধিকার ও অজুহাত তোমাদের নিতান্তই অলীক কল্পনা। ধর্মত ও লোকত সেরূপ অধিকার এক জাতির উপরে অন্য এক জাতির কখনই প্রতিষ্ঠিত হয় না, হইতে পারে না। বিভিন্ন ও বিরোধী জাতিসকলের মধ্যে রক্ষক-রক্ষিত সম্বন্ধ আজ পর্যন্ত কোন নীতিশাস্ত্রেই প্রতিপন্ন হয় নাই।···এই সকল ভাব, চিন্তা ও বিচারের ফলে দেশে এক অভিনব রাজনৈতিক আদর্শ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহার লক্ষ্য কেবল সুশাসন নহে, কিন্তু স্বায়ত্তশাসন। ইহার প্রণালী ইংরেজের সম্মুখে বাগ্‌বিতণ্ডা করিয়া শাসন-কার্যে ব্রিটিশ রাজপুরুষগণের সাহচর্য করিবার যোগ্যতা প্রতিপাদন নহে, কিন্তু দেশের লোকের আত্মশক্তি, আত্মজ্ঞান ও আত্মসম্মান জাগ্রত করিয়া সর্বতোভাবে রাজশক্তির সমক্ষে ও সমকক্ষে প্রজাশক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করা।

'শ্রীঃ'-রচিত স্বাদেশিকতা-মূলক কতকগুলি প্রবন্ধ ও কবিতা বঙ্গদর্শনে পাওয়া যাচ্ছে। এই লেখাগুলি বিপিনচন্দ্রের বলেই আমার ধারণা; ধারণার কারণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। 'শ্রীঃ'-রচিত দুটি প্রবন্ধ এবং দশটি কবিতা এখানে উল্লেখযোগ্য। প্রবন্ধ : 'স্বদেশী বা পেট্রিয়টিজম্' (চৈত্র, ১৩১২) এবং 'ইজ্জৎ' (শ্রাবণ, ১৩১৫); কবিতা : 'স্বদেশ', 'ব্রত', 'ভিখারী', 'উপনয়ন', 'আগ্নেয়গিরি', 'প্রলয়', 'বঙ্গবিভাগ' (কাতিক, ১৩১২) এবং 'পূজারী', 'জীর্ণতরী' ও 'পান্থপাদপ' (বৈশাখ, ১৩১৩)।

বিপিনচন্দ্র রচিত কিছু স্বদেশী গান এবং ব্রহ্মসংগীতের সন্ধান পাওয়া যায়। সংগীত-রচনা ও স্বর-সংযোজনায় যাঁর কিছুটা দক্ষতা ছিল কবিতা রচনা যে তাঁর পক্ষে অস্বাভাবিক নয় এ কথা মেনে নিতে তর্কের প্রয়োজন হয় না। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত তাঁর এই কবিতাগুলির প্রত্যেকটিই সনেট্। এখানে দুটি কবিতা উদ্ধৃত হল। অন্যগুলি ভাব-ভঙ্গির দিক থেকে একই রকম। যে স্বতঃস্ফূর্ত উগ্র স্বদেশপ্রীতি বিপিনচন্দ্রের গদ্য-রচনাগুলিতে একটা বলিষ্ঠ আত্মপ্রকাশ লাভ করেছে, এই কবিতাগুলির মধ্যেও তা মোটেই দুর্লক্ষ্য নয়।

প্রলয়

কতদিন বল আর রাখিবে সম্বরি
বক্ষোমাঝে রুদ্ধশ্বাস, বেদনা গভীর,
সন্তানের অবহেলা, ঘৃণা বিদেশীর
সহিবে নীরবে? কবে উঠিবে বিদরি
মেদিনী-অম্বরতল ক্রন্দনের স্বরে
ঢালি দিবে উচ্ছ্বসিত যুগ-যুগান্তের
অগ্নি-প্রস্রবণ, হৃদয়ের স্তরে স্তরে
হতেছে সঞ্চিত নিত্য যাহা। প্রলয়ের
প্রবল আঘাতে বিলাসের কারাগার
নিমেষে ভাঙিয়া দিবে, দিবে চূর্ণ করি
বিলাস-সম্ভার যত পণ্যবীথিকার।
সেইদিন ভারতের চির-বিভাবরী
হবে সুপ্রভাত, দ্বাদশ আদিত্যগণ
আনিবেন ভারতের মহাজাগরণ।

বঙ্গবিভাগ

রাজার শাণিত খড়্গ নিষ্ঠুর আঘাতে
পারে নি করিতে দ্বিধা তোমারে স্বদেশ!
শুধু ভাঙিয়াছে তব নিদ্রার আবেশ,
দিয়াছে চেতনা। আজি নবীন প্রভাতে
যুগ-যুগান্তের সুপ্ত নিমীলিত আঁখি
মেলিয়াছ, হেরিতেছ তরবারি-লেখা
বিদারণ-রেখাগুলি স্থির দৃষ্টি রাখি
রুধিরাক্ত বক্ষোপরি। শুধু ক্ষুণ্ণ রেখা,
ছিন্ন করে সাধ্য কার পূত দেহ তব
কুলিশ-কঠোর? এই ব্যবচ্ছেদ-খাদ
ভরিয়া বহিয়া যাক্ তরঙ্গ ভৈরব
বঙ্গ বক্ষঃ ক্ষত বিগলিত মেঘনাদ,
রক্তগঙ্গা—পুণ্যস্পর্শ যা'র দিবে প্রাণ
সহস্র সন্তানে, দিবে বরাভয়দান।

'ইজ্জৎ' প্রবন্ধটি বিপিনচন্দ্রের (শ্রীঃ-) সাহিত্যিক বুদ্ধিমত্তা এবং উদগ্র স্বদেশ-চেতনার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। প্রবন্ধটি কতকগুলি ক্ষুদ্র এবং অনতিবৃহৎ অনুচ্ছেদের সমষ্টি। এক-একটি অনুচ্ছেদ যেন এক-একটি সোপানের মতো, পাঠকের মনকে ক্রমশ বৈপ্লবিক আবেগের শীর্ষের দিকে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে। রচনাভঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথের স্পষ্ট প্রভাব আছে, কিন্তু রাজনৈতিক মত ও পথের ব্যাপারে লেখক তাঁর মৌলিক পার্থক্য পূর্ণমাত্রায় বজায় রেখেছেন। গুপ্তসমিতি-গুলির ক্রিয়াকলাপের প্রতি লেখকের সমর্থন পরিষ্কার ভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। প্রবন্ধটির বিশেষ গুরুত্বের জন্যে এটি থেকে কিছু বিস্তৃত অংশ উদ্ধৃত হল।

আসল কথা প্রজার চোক্ ফুটিয়াছে। কি কারণে তাহার চোক্ ফুটিয়া গেল তাহা লইয়া বিবাদ করিয়া লাভ নাই। সে বুঝিয়াছে,—প্রকৃত সুশাসন লাভ করিতে না পারিলে ইজ্জৎ থাকিতে পারে না। সে রাজভক্তি দান করিতে অসম্মত হয় নাই, কিন্তু তাহার প্রতিদান লাভ করিবার দাবি ত্যাগ করিতে অসম্মত।

এতদিন একতরফা ইজ্জতের ধূমপুঞ্জে গগন-মণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। এখন তাহার মধ্যে প্রজার ইজ্জৎ বিদ্যুদ্দামের মত ঝলসিয়া উঠিতেছে। তাহারাও মানুষ—তাহারাও মানুষের মত শাসন লাভ করিতে চায়।

ইহাকে আকস্মিক চিত্তবিকার বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিবার উপায় নাই,—ক্রোধান্ধ হইয়া লাঠির আঘাতে চূর্ণ করিবারও সম্ভাবনা নাই। কারণ ইহা বহু দিনে—ধীরে ধীরে—স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায়—একটি মহাশক্তিরূপে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে···

···রাজপুরুষগণ তাহার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা সরলভাবে পূর্ণ করিবার চেষ্টা না করিয়া, কৃত্রিম শাসনকৌশলে আকাঙ্ক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করিয়া বসিয়াছেন। তাঁহারা স্পষ্ট করিয়া শুনাইয়া দিয়াছেন—'এখন কেন, সুদূর ভবিষ্যতেও—যতদূর দেখা যায় ততদূর—সম্মুখে কেবল সূচীভেদ্য অন্ধকার।'

তথাপি প্রজা সমুচিত সম্ভ্রম রক্ষা করিয়াই কথা কহিয়া আসিতেছিল। এখনও তাহাতে সম্পূর্ণ অনাস্থা উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। কারণ সে এখনও সভা করিয়া কাঁদিতেছে, সংবাদপত্রে লিখিয়া কাঁদিতেছে, আবেদনপত্রহস্তে রাজদ্বারে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে!

এরূপ ক্ষেত্রে সকলের হৃদয় একরূপ চিন্তায় পরিচালিত হইতে পারে না। কাহারও হৃদয় ক্ষোভে, কাহারও বা বিদ্বেষে ভরিয়া উঠাই স্বাভাবিক। ক্ষোভ আত্মসংবরণ করিতে পারে, বিদ্বেষ সকল অবস্থায় সকল সময়ে আত্মসংবরণ করিতে পারে না। তাই সে আত্মপ্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে। ইহাই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ব্যাপার।

অক্ষমের বিদ্বেষ চিরদিন যে গোপনপথে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে, সেই চির-পরিচিত পুরাতন পথেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তাহার নিন্দা করিতে চাহিলে নিন্দা করিতে পারা যায়। কারণ তাহার নিন্দা সর্ববাদী-সম্মত। কিন্তু তাহাকে অস্বাভাবিক বলিয়া তর্ক করিতে পারা যায় না।

কেহ বলিতেছেন, ইহা ভারতের চিরপরিচিত প্রশান্ত প্রকৃতির স্বভাববিরুদ্ধ আকস্মিক চিত্ত-বিক্ষেপ—আর্য সভ্যতার অপরিজ্ঞাত অধর্ম পথ।

কেহ বলিতেছেন—ইহা পাশ্চাত্য দৃষ্টান্তের অনুকরণ মাত্র, পাশ্চাত্য শিক্ষার অপরিহার্য অশান্ত পরিণাম!

কথায় কথায় কথা বাড়িয়া উঠিতেছে,—উভয় দলের অসংযত তর্ক প্রকৃত সত্যকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। ইহাই যে মানবপ্রকৃতির স্বাভাবিক চিত্ত-বিক্ষেপ, সে কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যে-সকল কারণে ইহা অভিব্যক্ত হইয়া পড়ে, সেই সকল কারণ যখনই যে-দেশে ঘনীভূত হইতে থাকে সেই দেশে তখনই ইহা স্বাধীনভাবে আত্মপ্রকাশ করে।···

···ভারতবর্ষের পক্ষে এইরূপ গোপন পথে পদার্পণ করিবার সম্ভাবনা নানা কারণে উদ্ভূত হইতে পারে। পাশ্চাত্য দৃষ্টান্ত তাহাকে কিয়ৎপরিমাণে পথপ্রদর্শন করিয়া থাকিতে পারে, এশিয়ার নবজাগরণের প্রথম পুলক কিয়ৎপরিমাণে তাহাকে উৎসাহদান করিতে পারে। তর্কস্থলে এ সকল কথা মানিয়া লইলেও বলিতে হইবে—ইহাই যথেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। শাসনব্যবস্থার মধ্যে উত্তেজনার কারণ না থাকিলে কেবল বাহিরের দৃষ্টান্তে—বাহিরের প্রলোভনে, সহসা এরূপ চিত্তবিকার উপস্থিত হইতে পারে না।···

···'আমরা না থাকিলে কি হইত', ইহাই তাহার প্রধান স্পর্ধার কথা হইয়া উঠিয়াছে। 'আমরা আছি বলিয়া কি হইতে পারে'—ইহা এখনও তাহার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা বলিয়া সমাদর লাভ করিতে পারে নাই। পারিলে ইজ্জত রক্ষার জন্য এত ব্যতিব্যস্ত হইতে হইত না।

এখনও সময় হয় নাই বলিয়া স্রোতের মুখে বাধা দান করিলে, সে কৃত্রিম বাধা অধিক দিন গতিরোধ করিতে পারিবে না। যত দিন পারিবে, ততদিনও প্রতিনিয়ত গোপন পথে নিরুদ্ধ শক্তি-স্রোত ফুটিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিতে বিরত হইবার সম্ভাবনা নাই!

দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৮২-১৯৩৫): সাহিত্যিক হিসাবে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর তেমন খ্যাতি অর্জন করতে পারেন নি; এবং রচনার পরিমাণও নিতান্তই অল্প। তবে যা লিখেছেন তা চেষ্টাকৃত নয়, প্রাণের আবেগেই লেখা—বিশেষ করে কবিতাগুলি। বুদ্ধির দীপ্তি বা ভাবের গভীরতা এগুলিতে তেমন না থাকলেও সারল্যের মাধুর্য আছে। স্বদেশী-আন্দোলনের সময় দিনেন্দ্রনাথও দুএকটি দেশাত্মবোধক কবিতা লিখেছিলেন। বঙ্গদর্শনে তাঁর এই জাতীয় দুটি

কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল—'আত্মগৃহ' (ভাদ্র-১৩১২), এবং 'দুর্ভাগ্য' (আশ্বিন-১৩১২)।[২৭] 'আত্মগৃহ' থেকে শেষের কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত হল।

তুমি ত রাখনি দূরে কাহারেও! আপন যে নয়
তারেও ডাকিয়া ঘরে চিরদিন দিয়েছ আশ্রয়।
তবে কেন, হে জননি, যারা তব আপন সন্তান
ছাড়িয়া তোমার ক্রোড় পর দ্বারে পায় অপমান?
পর হতে পারে তবু আপনারে পারে না বুঝিতে
ঘরে শত্রু আছে বসে,' যায় মূঢ় পরেরে যুঝিতে।

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (১৮৬২-১৯৩০): অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বাংলা সাহিত্যের একজন সুপরিচিত লেখক। দুটি গ্রন্থের মধ্যে দিয়ে সে-সময়ে তিনি যথেষ্ট প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন—'সিরাজদ্দৌলা' ও 'মীরকাসিম'। এ দেশে ঐতিহাসিক আলোচনার ধারাতে তিনি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও বিচারণার পরিচয় দেন। 'ঐতিহাসিক চিত্র' নামে একটি পত্রিকাও তিনি প্রকাশ করেছিলেন। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত তাঁর তিনটি প্রবন্ধের নাম এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে—'মর্মচ্ছেদ' (কার্তিক, ১৩১২), 'নবজীবন' (পৌষ, ১৩১২) এবং 'নবযুগের ভারতবর্ষ' (বৈশাখ, ১৩১৯)। অবশ্য এগুলির একটিতেও লেখকের স্বাধীন চিন্তাশক্তির কোন পরিচয় ফুটে ওঠে নি; এমন কি 'নবযুগের ভারতবর্ষ' প্রবন্ধে ইংরেজের ওপর নতুন করে ভক্তি ও বিশ্বাস স্থাপনের কথা আছে। ভাঙা বাংলার পুনর্মিলনে অনেকেই তখন ইংরেজের সুমতির পরিচয়ে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন, এবং স্থির বিশ্বাস নিয়ে সরকারের আন্তরিক আনুকূল্য প্রত্যাশা করেন। অক্ষয়কুমারও এই উৎফুল্ল প্রত্যাশীদের মধ্যে একজন। তাই তাঁকে লিখতে দেখি,

> এতকালের পর, ইংলণ্ডের সিংহাসনতলে প্রজার ক্রন্দন জয়যুক্ত হইয়াছে। ভারত সম্রাট সস্ত্রীক ভারতবর্ষে উপনীত হইয়া, ভারত শাসনের মূলমন্ত্র বিঘোষিত করিয়া গিয়াছেন,—জনসমাজ আবার আশার বাণী শ্রবণ করিয়া, জয়ধ্বনি করিয়া উঠিয়াছে। ('নবযুগের ভারতবর্ষ')

২৭ এই দুটি কবিতাই কবির 'বীণ' কাব্য-গ্রন্থের অন্তর্গত। পরবর্তী কালে প্রকাশিত দিনেন্দ্র-গ্রন্থাবলীতেও স্থান পেয়েছে। দিনেন্দ্র-গ্রন্থাবলী—প্রকাশ, ১৩৪৩।

বিজয়চন্দ্র মজুমদার (১৮৬১-১৯৩২): বাংলা সাহিত্যের সহৃদয় ও জিজ্ঞাসু পাঠক মাত্রেই বিজয়চন্দ্র মজুমদারের কবিত্বশক্তির পরিচয় রাখেন। ভাষাতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বে বিজয়চন্দ্রের বিশেষ পাণ্ডিত্য কোনদিনই তাঁর কাব্য রচনায় অন্তরায় হয় নি। শ্রদ্ধাস্পদ ডাঃ সুকুমার সেনের মতে "বাংলা পদ্য রচনায় ইঁহার সহজ দক্ষতা ছিল"।[২৮] আর এই সহজ দক্ষতার জন্যেই তাঁর অনেক কবিতা প্রয়াসহীনভাবে মাধুর্য-মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। বঙ্গদর্শনে বিজয়চন্দ্রের একটি চমৎকার খণ্ডকাব্য প্রকাশিত হয়েছিল। এর কিছু কাল আগে বঙ্গভঙ্গের সরকারী প্রস্তাব দেশবাসীকে জানানো হয়েছে (১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩১০) এবং চারিদিকে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সুর ক্রমশ তারায় চড়তে সুরু করেছে। কবি এই ব্যাপারটি নিয়ে লিখলেন 'বঙ্গমঙ্গল'[২৯] কাব্য (ফাল্গুন, ১৩১০)। কাব্যটি তিন সর্গে বিভক্ত: প্রথম সর্গ, মন্ত্রণা, দ্বিতীয় সর্গ, উদ্যোগ এবং তৃতীয় সর্গ, সিদ্ধি। বঙ্গদর্শনে বিজয়চন্দ্রের দেশাত্মবোধক রচনা আর বিশেষ প্রকাশিত হয় নি। বিদ্রূপাত্মক কবিতা রচনায় কবির বেশ সুনাম ছিল। বঙ্গভঙ্গের ব্যাপার নিয়ে এমন অপূর্ব ব্যঙ্গকাব্য সে-সময় আর কারো লেখনী থেকে বেরিয়েছিল বলে জানি না। এই খণ্ডকাব্যটির কোন খণ্ডাংশ উদ্ধৃত করে দিলে রসাস্বাদে অনেকটা ঘাটতি থাকতে পারে বলে প্রায় সম্পূর্ণ অংশটিই উদ্ধৃত হল।

'মন্ত্রণা' শীর্ষক প্রথম সর্গের সুরুতে কার্জনের কীর্তিকথা বর্ণনা করার জন্যে কবি সরস্বতীর কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছেন—

…এ অর্ণবে হায়
কিরূপে উড়ুপে চড়ি পারি পার হতে?
তুমি যদি হে ভারতি, নাহি ধর হাল?
খাটুনিও নাহি বেশী পাটুনীর কাজে।
থাকিলেও ক্ষতি কিবা? কার্য-হীন তুমি
হবেই তো অচিরাৎ নূতন বিধানে;[৩০]
আগে থেকে দাঁড়-টানা শিখে রাখা ভাল।
পার কর বীণাপাণি কাব্য-কালাপানি।

২৮ 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' ডাঃ সুকুমার সেন, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-৩৬।

২৯ এই খণ্ডকাব্যটি কবির 'ফুলশর' কাব্য-গ্রন্থের অন্তর্গত। প্রকাশ-১৩১১।

৩০ নূতন বিধান অর্থাৎ য়ুনিভার্সিটি বিল্‌।

হিমালয়ে শিমলার তুঙ্গ শৃঙ্গ যথা—
নির্জনে মার্জন করে পর্জন্য আপনি,
কর্জন বসিয়া তথা কনক আসনে
ভাষেণ অমৃতবাণী বাণী-বিড়ম্বিনী,
সম্ভাষি সচিবে, মিত্রে, পাত্রে, কোতোয়ালে।
"বিদায়িতে ভারতীরে মারুতির রথে
পূর্ণ আজি আয়োজন, চূর্ণ আন্দোলন।
হে পাত্র! পড়িয়া শাস্ত্র গাত্র দাহ কারো
নাহি হবে; রবে সবে নীরবে জগতে।
ছল-ধরা রোগে ধরা ছিল প্রপীড়িত,
লুপ্ত হ'বে তাহা গুপ্ত-বিধির প্রচারে;
ওহে মিত্র, নেত্র আজি উৎফুল্ল উল্লাসে।
শাস্তির কুলীশ দিব পুলিশের হাতে;
আঁট ঢাল, কোতোয়াল, শ্রীঅঙ্গ মণ্ডিয়া।
সচিব! রচিব আমি অন্য নব বিধি,
ঠাণ্ডা করি দেশ; তুমি পাণ্ডা হও তার।"
শুনি সে অমৃতবাণী জয়ধ্বনি করি
উঠিল সচিববৃন্দ; বন্দী গাহে গান।

(বন্দীর গান)

করিয়ে দরবার জেরবার
করেছ রাজাগণে।
রহিবে নাম ছাপা (ধামা চাপা)
পুলিশ কমিশনে।
ইউনিবরসিটি বরষটি
অস্ত না যেতে যেতে
করিবে ভারতীর মতিস্থির
কুলোর বাতাসেতে।

গুপ্ত বিল্ খুলি বিল্‌কুল্-ই
মহিমা জারি হোলো।
প্রভুর জয়গানে একতানে
সকলে হরি বলো।

দ্বিতীয় সর্গ

(উদ্যোগ)

"মধুমাখা ইতিবৃত্ত প্রত্নতত্ত্বে জারি
করিলে সচিব তুমি, বাঁচিল বাঙালী।
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ সে ছিল তিন দেশ
এক সঙ্গে বঙ্গে তার শাসন গর্হিত।
বিশেষ বঙ্গের লোক বড় কথা কয়
ঝালা-ফালা করি কর্ণ। জালা দূর হবে,
কথা বন্ধ কর যদি কবন্ধ করিয়া।"
উচ্চারিয়া কথাগুলি হস্তে লয়ে ছুরী
দক্ষ সার্জনের মত দাঁড়াল কর্জন
কহিলা সচিব তবে যুক্ত কর-যুগে :—
"ছুরী হেরি ডরি প্রাণে যদি ওঠে কাঁদি ;
কিম্বা যদি ধড় হ'তে স্বতন্ত্রিতে মাথা
শঙ্কা হয় প্রাণে তার ? কি হইবে প্রভু ?"
বর্ষি রসনায় লক্ষ ভৎর্সনা বচন,
কহেন শ্বেতাঙ্গ-পতি :—"অঙ্গচ্ছেদ অতি
সোজা কথা, মজা ওতে আছে বহুবিধ।
উহাতে চীৎকার করা ভাবপ্রবণতা।
বৈজ্ঞানিক জাতি মোরা শিখাব এবার,
থাকে প্রাণ ধড় মুণ্ড বিভক্ত করিলে।
যতটুকু যাবে কাটা ঠিক ততখানি
এনে দিব অন্য দেহ হইতে কাটিয়া ;
সবগুলো হবে তাজা সমান সমান।

বঙ্গ হতে কাট বঙ্গ ; প্রত্যঙ্গ ত সেটা।
কলিঙ্গ কিষ্কিন্ধ্যা জুড়ি উৎকলের সাথে
কর নব দেহ সৃষ্টি। ভাষার একতা
অত্যন্ত আশ্চর্য রূপে হইবে সাধিত।"
তথাস্তু বলিয়া সবে শির করি নত
রত হল নব বিধি করিতে প্রচার।
হুঙ্কারে মেদিনী ফাটে। উঠিল রোদন
বুদ্ধিহীন বঙ্গমুখে, অঙ্গচ্ছেদ ভয়ে।

(রোদন ধ্বনি)

মাথাটা কাটা গেলে
বাঁচিব জানি খাঁটি ;
শোভিব নব ডালে,
দেহটা দিলে ছাঁটি ;
মঙ্গল হবে খাসা
বিশেষ আছে জানা,
জঙ্গলে পাবে বাসা
অঙ্গের দু'টো ডানা।
অবোধ মোরা ওগো,
কাঁদিয়া মরি তবু ;
বঙ্গটা বঙ্গে রাখো
করুণা করি প্রভু।

তৃতীয় সর্গ

(সিদ্ধি)

—তূণক ছন্দ—

অস্ত্র-হস্ত লাট, মস্ত বঙ্গ-অঙ্গ ছেদিবে।
সাধ্য কার আজি তাঁর ন্যায্য কার্য রোধিবে ?

মন্ত্রপূত লাট-দূত দেশ দেশ ধাইল ;
ভেদমন্ত্র—বেদতন্ত্র—কণ্ঠ তার গাইল।
হর্ষনেত্র পাত্রমিত্র লম্ফ ঝম্ফ ঝাঁপিল।
ঘোর রোল গণ্ডগোল ; বঙ্গখণ্ড কাঁপিল।
রাজ্যখণ্ড লণ্ডভণ্ড হইল তায় দুঃখ কি ?
খণ্ড-শূন্য জেদ-পূর্ণ রৈল লাট-বাক্যটি।
দেব সর্ব লাট-গর্ব হেরি পুষ্প বর্ষিল,
বঙ্গ-মুণ্ড দেহপিণ্ড ছাড়ি ভূমি পশিল।
স্তব্ধ বঙ্গ, কর্ম সাঙ্গ, লাট ঘাড় নাড়িল।
তূণকের ছন্দ ঢের বর্ণনায় বাড়িল।

মাথাটা গেল যবে, দ্যাখে সবে
দেহটা ঠাণ্ডা !
কেহ বা ভাবে মনে সংগোপনে
গেছে বা প্রাণটা।
উড়ের মাথা জুড়ে দিল ধড়ে,
তবুও নড়ে না !
আসাম দিল খাসা লম্বা নাসা,
শ্বাস যে পড়ে না।
টিপিয়া নাড়ী তার ফেরেজার
কহেন লাটকে,
"আবার দেহটিতে পার দিতে
মাথাটা আট্‌কে ?"
কহেন লাট যে সে কড়া ভাষে :—
"কোরো না বিজ্ বিজ্ !
জুড়িয়া দিলে মাথা, রবে কোথা
আমার prestige."

খণ্ড হল বঙ্গ দেশ,
খণ্ডকাব্য হল শেষ ;

বঙ্গের মঙ্গল আজি করিল কর্জন।
শ্রীবঙ্গ-মঙ্গল গায় বঙ্গবাসীজন ॥

অন্যান্য কয়েকজন লেখক : যাঁদের রচনা সম্বন্ধে আলোচনা করা হল এঁরা ছাড়া আরো কয়েকজন চিন্তাশীল ব্যক্তির কিছু দেশাত্মবোধক রচনা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু তাঁদের আলোচনার ধারা নিতান্তই গতানুগতিক। সমস্যা-মীমাংসা, তত্ত্ব-আলোচনা বা সাহিত্যিক প্রকাশভঙ্গির দিক থেকে এগুলি বৈশিষ্ট্যহীন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শরৎচন্দ্র চৌধুরী এবং ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী। স্বাদেশিকতার ভিত্তিতে যতীন্দ্রমোহন গুপ্তের একটি গল্পও প্রকাশিত হয়, ('রাজ-প্রসাদ,'—চৈত্র ১৩১২)। বঙ্গদর্শন বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঠিক পূর্বের সংখ্যাতেই গোবিন্দচন্দ্র দাসের 'নববর্ষ—রাহু-কেতুর প্রতি' কবিতাটি প্রকাশিত হয় (বৈশাখ, ১৩২১)।

'সাময়িক-প্রসঙ্গ' : বঙ্গদর্শনে 'সাময়িক-প্রসঙ্গ' বিভাগে মাঝে মাঝে জাতীয় সমস্যা নিয়ে আলোচনা বা বিভিন্ন তথ্য প্রকাশ করা হত। ৭ই আগষ্ট, ১৯০৫, বাঙালী যে গ্রহণ-বর্জনের সংকল্প নিয়েছিল সেই উপলক্ষ্যে প্রতি বছর কলকাতায় জাতীয়-উৎসব পালিত হত। ১৯০৮ সালে চতুর্থ-বার্ষিক উৎসবে বিভিন্ন বক্তার বক্তৃতা ১৩১৫ সালের ভাদ্র সংখ্যার 'সাময়িক-প্রসঙ্গ'-তে প্রকাশিত হয়। এখানে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিপিনচন্দ্র পালের বক্তৃতার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে বঙ্গদর্শন প্রসঙ্গে আলোচনা শেষ করছি। ইংরেজ-শাসক তো বটেই, আমাদের নেতাদের মধ্যেও কেউ কেউ বয়কটকে বিদ্বেষ-জাত বলে মনে করতেন। বক্তৃতায় সুরেন্দ্রনাথ এবং বিপিনচন্দ্র উভয়েই বয়কট সম্বন্ধে এই ভুল ধারণা নিরসনের চেষ্টা করেছেন।

> এ আন্দোলন আজ কেবলমাত্র বঙ্গদেশে আবদ্ধ নহে, সমগ্র ভারতে পরিব্যাপ্ত। ভগবান আমাদের নেতা ও পরিচালক।…কারারুদ্ধ হই, বধ্যমঞ্চে বিলম্বিত হই—স্বদেশী আমরা পরিত্যাগ করিতে পারি না।—স্বদেশী আমাদের জীবন, স্বদেশী আমাদের সংস্থিতি।…
>
> 'বয়কট' বিষয়ে আমরা সকলেই একমত। অ্যাংলোইণ্ডিয়ান প্রভুরা বলিয়া থাকেন যে 'বয়কট' জাতীয় বিদ্বেষ বৃদ্ধি করে কিন্তু আমাদের 'বয়কট'

জাতীয় বিদ্বেষ-প্রণোদিত নহে ; ইহা সমতা ও সদিচ্ছার উপর প্রতিষ্ঠিত। জাতীয় বিদ্বেষ যদি যথার্থ ই উদ্ভূত হইয়া থাকে তবে গভর্ণমেণ্টের অত্যাচারপূর্ণ আইনকানুনই তাহার জন্য দায়ী।

—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বয়কটকে অনেকে অসংযম বলিয়া থাকেন ; কিন্তু আমার তো বোধ হয় সংযম যদি কিছুতে থাকে তবে তাহা বয়কটেই ! ইংরাজেরা বয়কটকে বলিয়া থাকেন 'Passive resistance' বা 'নিষ্ক্রিয় বাধা'। যাহা নিষ্ক্রিয় তাহা অসংযম হইবে কি করিয়া ? এরূপ ভ্রমাত্মক বাক্য আমি আর কখনও শুনি নাই।...কারণ বয়কট তো নিবৃত্তির নামান্তর মাত্র।

—বিপিনচন্দ্র পাল।

ভারতী

১২৮৪ সালের শ্রাবণ মাসে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় ভারতীর আত্ম-প্রকাশ। সাময়িক-পত্র জগতে এই নবজাতকের আবির্ভাব যেন প্রতীক্ষিত ছিল। তাই জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে সে তার নিজস্ব আসন রচনা করে নিলে। সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ, প্রকৃত কর্ম-কর্তা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং সহায়ক রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয় চৌধুরী। পত্রিকাটির সম্পাদনার দায়িত্ব বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লেখক-লেখিকা গ্রহণ করেছিলেন[১]। ১৩০৫ সালে এবং ১৩০৮ থেকে ১৩২১ সালের মধ্যে[২] ভারতীতে স্বাদেশিকতা-মূলক বহু রচনা প্রকাশিত হয়। সেগুলির আলোচনায় প্রবেশ করার আগে প্রসঙ্গত আর একটা কথা বলে নেওয়া দরকার। সুধীন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ঠাকুর-পরিবারের বালকদের রচনা ছাপার হরফে প্রকাশ করার আগ্রহ নিয়ে, আর এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে প্রেরণা সঞ্চারের আকাঙ্ক্ষায় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী বালক নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন (বৈশাখ, ১২৯২)। কিন্তু এক বছর পরেই পত্রিকাটি ভারতীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়ায় "বালকদের পাঠ্য একটি সচিত্র কাগজ" হিসাবে তার অস্তিত্ব লুপ্ত হয়।

১ "১২৮৪ শ্রাবণ—১২৯০—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২৯১ —১৩০১—স্বর্ণকুমারী দেবী

১৩০২ —১৩০৪—হিরণ্ময়ী দেবী, সরলা দেবী

১৩০৫ — —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩০৬ —১৩১৪—সরলা দেবী

১৩১৫ —১৩২১—স্বর্ণকুমারী দেবী

১৩২২ —১৩৩০—মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

১৩৩১ —১৩৩৩—আশ্বিন—সরলা দেবী।"

'বাংলা সাময়িক-পত্র', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

২য় খণ্ড, পৃ ২৩।

২ আমাদের আলোচ্য বিষয়ে ১৩০৫ সালের ভারতীতে রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি রচনা প্রকাশিত হয়। আমাদের নির্দিষ্ট সময়-সীমার বাইরে হলেও রচনাগুলির গুরুত্ব বিচার করে এগুলিকে আলোচনার মধ্যে গ্রহণ করা হল।

স্বদেশ-নিষ্ঠার যে আদর্শ পরবর্তীকালে সমগ্র ভারতবাসীকে আত্ম-প্রতীত করে তুলেছিল বাংলার ঠাকুর-পরিবারই তার উদ্বোধক। যে সময়ে পাশ্চাত্য ভাব-কল্পনা আর অন্ধ অনুচিকীর্ষা শিক্ষিত ভারতবাসীর সুরুচি-সভ্যতার পরিচয় হিসাবে ফুটে উঠেছিল সেই সময়েই দেখা যায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁর কোন নতুন আত্মীয়ের কাছ থেকে পাওয়া ইংরেজীতে লেখা চিঠি সঙ্গে সঙ্গে ফেরৎ পাঠিয়েছিলেন। অতি সাধারণ ব্যাপারেও ঠাকুর-পরিবারের স্বদেশ-প্রীতির নানা পরিচয় ফুটে উঠত। কিন্তু এই ঐকান্তিক স্বদেশ-নিষ্ঠা কখনই গোঁড়ামি বা রক্ষণশীলতায় আড়ষ্ট হয়ে ওঠে নি। তাই ভারতী প্রকাশের উদ্দেশ্য আলোচনা-প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "······জ্ঞানালোচনার সময় আমরা স্বদেশ-বিদেশ নিরপেক্ষ হইয়া যেখান হইতে যে জ্ঞান পাওয়া যায় তাহাই নতমস্তকে গ্রহণ করিব। কিন্তু ভাবালোচনার সময় আমরা স্বদেশীয় ভাবকেই বিশেষ স্নেহ-দৃষ্টিতে দেখিব।" (ভারতী—শ্রাবণ, ১২৮৪)।

ভারতীতে যাঁদের স্বাদেশিকতা-মূলক রচনা প্রকাশিত হয়েছিল তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে এই কজনের নাম করা যায়,—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সরলা দেবী, হিরণ্ময়ী দেবী, প্রমথ চৌধুরী, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, শিবনাথ শাস্ত্রী, অমৃতলাল বসু, রাধাকান্ত বসু, রমেশচন্দ্র বসু, সুরেশচন্দ্র চৌধুরী, হরিশচন্দ্র চক্রবর্তী, স্বর্ণকুমারী দেবী ও অনুপমা দেবী। 'জ্যাঠা', 'শ্রীপাগল' ও 'শ্রীস্বদেশী' ছদ্মনামেও কয়েকটি ব্যঙ্গ-রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। এ ছাড়া কয়েকটি পত্র এবং 'চয়ন', 'রাজ্যের কথা' প্রভৃতি বিভাগগুলি থেকেও অনেক মূল্যবান তথ্য জানা যায়।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৮-১৯২৫)ঃ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৃষ্টিশক্তি বিস্ময়কর বৈচিত্র্যে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিল। শিল্প, সাহিত্য, সংগীত, ব্যবসা-বাণিজ্য, সব দিক থেকেই দেশকে আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করে তোলার আদর্শ তাঁর মধ্যে এনে দিয়েছিল এক অক্লান্ত কর্ম-ক্ষমতা। কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর এই ক্ষমতা হয়তো সম্পূর্ণ সার্থকতা অর্জন করতে পারে নি, কিন্তু তবু এই দুর্দমনীয় শক্তিমত্তা এদেশে স্বাদেশিকতার ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় অধ্যায় রচনা করেছে।

প্রথমেই বলেছি, ভারতীর প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা এবং কর্ম-কর্তা ছিলেন

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। তাঁর অনেকগুলি রচনা এতে প্রকাশিত হয়েছিল। অনুবাদ রচনাগুলির মধ্যেও তাঁর দেশাত্মবোধের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এখানে তাঁর শুধু একটিমাত্র প্রবন্ধের উল্লেখ করছি। 'আবেদন—না, আত্মচেষ্টা' নামে এই প্রবন্ধটি ১৩১১ সালের আশ্বিন মাসের ভারতীতে প্রকাশিত হয়।[৩] ব্রিটিশ-সরকারের কাছে আবেদন-নিবেদন করে আমাদের সর্বাঙ্গীণ জাতীয় উন্নতি যে কখনোই সম্ভব নয়, বাংলার একদল চিন্তাশীল স্বদেশ-সেবী বহুকাল ধরেই একথা প্রচার করে আসছিলেন। একজনের দুঃখ আর একজন লাঘব করেছে, ব্যক্তিগত জীবনে এমনতর সহৃদয়তার পরিচয় মাঝে মাঝে পাওয়া গেলেও জাতিগত ভাবে এ পরিচয় সুলভ নয়। বিশেষ করে বিজেতা-বিজিতের ক্ষেত্রে। ইংরেজ-সরকার যে নিঃস্বার্থভাবে আমাদের কোন উপকার করবে না, আমাদের জাতীয় দুর্গতি দূর করার ক্ষমতা যে আমাদেরই হাতে, এই সহজ সত্যটা তখন একদল দেশকর্মীর মাথায় কিছুতেই প্রবেশাধিকার পায় নি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাই স্পষ্ট ভাষায় এবং সম্পূর্ণ নির্ভীক ভাবেই মন্তব্য করলেন—

> কিন্তু বাস্তবিক কথা বলিতে গেলে আমাদের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থায় ইহা ভিক্ষাবৃত্তি ভিন্ন আর কি? যখনই ইংরাজেরা আমাদের দেশ জয় করিলেন এবং যখনই আমরা পরাজয় স্বীকার করিয়া তাঁহাদের পদানত হইলাম, তখন হইতেই আমরা বাধ্য হইয়া আমাদের সমস্ত ন্যায্য অধিকার ছাড়িয়া দিয়াছি। এখন আমরা যাহা কিছু তাঁহাদিগের নিকট পাইতেছি সে কেবল তাঁহাদিগের অনুগ্রহ ভিন্ন আর কি হইতে পারে? এখন অধিকার সমর্থনের কথা আমাদের মুখে শোভা পায় না। রাজনৈতিক অধিকারের সঙ্গে বলের অকাট্য যোগ। যেখানে বল নাই সেখানে অধিকার কোথায়?…দুর্বলের প্রতি দেবতারাও বিমুখ।…
>
> …ইংরাজ-রাজের সহিত আমাদের যে সম্বন্ধ উহা পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ

৩ এই প্রবন্ধটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'প্রবন্ধ-মঞ্জরী' গ্রন্থে আছে। প্রকাশ—১৩১২। পৃ ৫০৫। ১৩১১ সালের ৭ই শ্রাবণ চৈতন্য লাইব্রেরীর একটি বিশেষ অধিবেশনে মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধটি পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে তাঁর যে মতামত ব্যক্ত হয়েছিল তার সমালোচনা ও প্রতিবাদ করে পৃথ্বীশচন্দ্র রায় এই বছরের শ্রাবণ সংখ্যার প্রবাসীতে একটি প্রবন্ধ লেখেন। পৃথ্বীশচন্দ্রের মতের প্রতিবাদ করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর এই প্রবন্ধটি ভারতীতে প্রকাশ করেন। দ্রষ্টব্য: ভারতী-সম্পাদিকার নিকট পৃথ্বীশচন্দ্রের পত্র, কার্তিক ১৩১১।

নহে। উহা বিজয়ী-বিজিতের সম্বন্ধ, ক্রেতা-বিক্রেতার সম্বন্ধ; উহাতে হৃদয়ের তিলমাত্র সংস্রব নাই।···আসল কথা যতটুকু স্বকীয় স্বার্থের অনুকূল, ততটুকুই ইংরাজ আমাদের জন্য করিয়াছেন এবং এখনও করিতে প্রস্তুত আছেন, তাহার অধিক নহে।

এই প্রসঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একথাও বললেন যে, কংগ্রেসের কর্মকর্তারা প্রতি বছর এই আবেদন-নিবেদনের ব্যাপারে যে অজস্র টাকা ব্যয় করেন তা যদি কোন গঠন-মূলক কাজে খরচ করা যায় তাহলেই দেশের প্রকৃত উপকার হতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১): সম্পাদক হিসাবে ভারতীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক মাত্র এক বছরের (১৩০৫)। এই সময়ের মধ্যে তাঁর বহু রচনা ভারতীতে প্রকাশিত হয়। গদ্য রচনার ভাগই বেশী। দেশবাসীর নানা অভাব-অভিযোগ, দেশের দুর্দশা ও তার প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে তখন তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় লিখতে সুরু করেছেন। ইংরেজ-সরকার, কংগ্রেস, জমিদার, শিক্ষিত-মধ্যবিত্ত সকলেই তখন তাঁর সমালোচনার বিষয়-বস্তু। এখানে প্রসঙ্গত আর একটি কথা বলে নেওয়া দরকার। প্রথম দিকে লেখা রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলি ভারতীতেই প্রকাশিত হয়; 'চেঁচিয়ে বলা' (চৈত্র, ১২৮৯), 'জিহ্বা-আস্ফালন' (শ্রাবণ, ১২৯০), 'টৌনহলের তামাশা' (পৌষ, ১২৯০), 'হাতে কলমে' (আশ্বিন, ১২৯১) প্রভৃতি লেখাগুলির কথা স্মরণ করা যেতে পারে। কিন্তু এগুলির কোনটিই গভীর চিন্তা-প্রসূত নয়; সমসাময়িক কয়েকটি ঘটনায় উত্তেজিত হয়ে তিনি এই প্রবন্ধগুলি লিখেছিলেন। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ আর বিদ্বেষ অনেক জায়গাতেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ রাজনীতির ক্ষেত্রে কিছুটা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন; অবশ্য এই ধরনের সক্রিয়তা শুধু মাঝে মাঝে সভা-সমিতিতে যোগদান করে প্রবন্ধ পাঠের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। কিন্তু এই সব প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে রাজনীতিজ্ঞ রবীন্দ্রনাথের গভীর চিন্তাশীলতা, সূক্ষ্মবিচারশক্তি এবং নির্ভুল ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির পরিচয় ফুটে উঠেছে। ভারতীতে প্রকাশিত তাঁর এই জাতীয় প্রবন্ধগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'কণ্ঠরোধ' (বৈশাখ, ১৩০৫), 'ভাষা-বিচ্ছেদ' (শ্রাবণ, ১৩০৫), 'কোট বা চাপকান' (আশ্বিন, ১৩০৫),

'মুখুজ্জে বনাম বাঁড়ুজ্জে' (ভাদ্র, ১৩০৫), এবং 'ইম্পীরিয়ালিজ্‌ম্‌' (বৈশাখ, ১৩১২)।

উনিশ শতকের শেষের দিকে (১৮৯৬-৯৭) বোম্বাইতে যে ভীষণ প্লেগ দেখা দিয়েছিল ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে তার যে একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে এ কথা সকলেই জানেন। প্লেগ নিবারণের অজুহাতে ইংরেজ কর্মচারীরা দেশবাসীর ওপর যে দারুণ অত্যাচার সুরু করে তার ভীষণতা রোগকেও ছাড়িয়ে যায়। লোকমান্য তিলকের অনুগত সহকারী নাটু ভ্রাতৃদ্বয়কে এই সময়ে বিনা বিচারে নির্বাসিত করা হয়। তার কিছুদিন পরে দুজন প্লেগ-অফিসার পুণার রাস্তায় অকস্মাৎ নিহত হন। এই হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে ইংরেজ-সরকার তিলককেও জড়িত মনে করে দেড় বছরের জন্যে তাঁকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। তিলকের কারাদণ্ড এবং ইংরেজ-সরকারের এই দমন-নীতির প্রতিবাদে সারা ভারতবর্ষ আলোড়িত হয়ে ওঠে। তিলকের মোকদ্দমা চালানোর জন্যে বাংলাদেশ থেকে যে অর্থ-সাহায্য করা হয়েছিল তার উদ্যোক্তাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অন্যতম। প্রতিবাদকারীদের কণ্ঠকে রুদ্ধ করার জন্যে তৈরি হল 'সিডিশন্‌ বিল্‌', বস্‌ল 'সিক্রেট প্রেস্‌ কমিটি'। 'সিডিশন্‌ বিল্‌' পাশ হবার আগের দিন টাউন্‌ হলের এক সভায় রবীন্দ্রনাথ 'কণ্ঠরোধ'[৪] প্রবন্ধটি পাঠ করেন। এখানে প্রবন্ধটি থেকে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত হল।

> আমি বিদ্রোহী নহি, বীর নহি, বোধ করি নির্বোধও নহি, উদ্যত রাজদণ্ডপাতের দ্বারা দলিত হইয়া অকস্মাৎ অপঘাত মৃত্যুর ইচ্ছাও আমার নাই; কিন্তু আমাদের রাজকীয় দণ্ডধারী পুরুষটি ভাষার ঠিক কোন্‌ সীমানায় ঘাঁটি বাঁধিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন তাহা আমি স্পষ্টরূপে জানি না,—এবং আমি ঠিক কোন্‌খানে পদার্পণ করিলে শাসনকর্তার লগুড় আসিয়া আমাকে ভূমিশায়ী করিবে তাহা কর্তার নিকটও অস্পষ্ট,—কারণ কর্তার নিকট আমার ভাষা অস্পষ্ট, আমিও নিরতিশয় অস্পষ্ট, সুতরাং স্বভাবতই তাঁহার শাসনদণ্ড আনুমানিক আশংকাবেগে অন্ধভাবে পরিচালিত হইয়া দণ্ডবিধির ন্যায়সীমা উল্লঙ্ঘনপূর্বক আকস্মিক উল্কাপাতের ন্যায় অযথা স্থানে দুর্বল জীবের অন্তরিন্দ্রিয়কে অসময়ে সচকিত করিয়া তুলিতে পারে।

৪ ১৩১৫ সালে প্রকাশিত 'রাজাপ্রজা' গ্রন্থে সংকলিত।

…অতি দূরে রুশিয়ার পদধ্বনি অনুমানমাত্র করিলে তাঁহারা কিরূপ চকিত হইয়া উঠেন তাহা আমরা বেদনার সহিত অনুভব করিয়াছি। কারণ, প্রত্যেকবার তাঁহাদের সেই হৃৎকম্পের চমকে আমাদের ভারতলক্ষ্মীর শূন্যপ্রায় ভাণ্ডারে ভূমিকম্প উপস্থিত হয়, আমাদের দৈব-পীড়িত কংকালসার দেশের ক্ষুধার অন্নপিণ্ডগুলি মুহূর্তের মধ্যে কামানের কঠিন লৌহপিণ্ডে পরিণত হইয়া যায়,—সেটা আমাদের পক্ষে লঘুপাক খাদ্য নহে।…

…ইতিমধ্যে একদিন দেখিলাম গবর্মেণ্ট অত্যন্ত সচকিত ভাবে তাঁহার পুরাতন দণ্ডশালা হইতে কতকগুলি অব্যবহৃত কঠিন নিয়মের প্রবল লৌহ-শৃংখল টানিয়া বাহির করিয়া তাহার মরিচা সাফ করিতে বসিয়াছেন। প্রত্যহ-প্রচলিত আইনের মোটা কাছিতেও আমাদিগকে আর বাঁধিয়া রাখিতে পারে না—আমরা অত্যন্ত ভয়ংকর!

এমন অপূর্ব ভাষায় ইংরেজ-সরকারের এমন নির্ভীক সমালোচনা পত্র-পত্রিকার পাতায় খুব অল্পই প্রকাশিত হয়েছে। এই সময় ঢাকায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় উপস্থিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ সভাপতি রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতার বাংলা সারাংশ পাঠ করেন। ভারতীতে রবীন্দ্রনাথ এই সভার যে সমালোচনা লেখেন (আষাঢ়, ১৩০৫ : 'প্রসঙ্গ-কথা') তাতে দেশের তথাকথিত নেতাদের আসল রূপটিকে নির্মমভাবে উদ্‌ঘাটন করে দিয়েছিলেন।

দেখিলাম সমগ্র পূর্ববঙ্গ নবানুরাগে অনুরঞ্জিত। যাঁহারা একদিন এই সকল রাজনৈতিক মহোৎসবে যোগদান করেন নাই, তাঁহারাই অগ্রণী হইয়া আমাদের অভ্যর্থনার ও পরিচর্যার জন্য করজোড়ে দণ্ডায়মান।

একপক্ষে ইহা নিতান্তই আনন্দের ব্যাপার। অন্যপক্ষে,—আপনার দিক দিয়া দেখিলে—ইহাতে নিতান্তই কুণ্ঠিত হইতে হয়। মাতৃভূমির সেবার জন্য আসিয়াছি; অসীম আত্মকর্তব্যের একটিও সম্পাদন করিতে শিখি নাই, অথচ কেবল আসিয়াছি বলিয়াই অভ্যর্থনার এত আড়ম্বর কেন?

একে ত আমরা সহজেই আমাদের স্বদেশের প্রতি কর্তব্যকে যথাসম্ভব লঘু করিয়া তৎসম্বন্ধীয় অহংকারকে যথাসম্ভব গুরুতর করিয়া তুলিয়াছি। ক্ষণকালের জন্য সভা করিয়া বক্তৃতা দিয়া, রেজোল্যুষণ আওড়াইয়া আপনাদিগকে দুঃসাধ্য ব্রতপরায়ণ বীর বলিয়া জ্ঞান করি, তাহার পরে যদি

> আবার এইরূপ অযথা অপরিমিত সম্মান ও সমাদর লাভ করিতে থাকি, তাহা হইলে আমাদের সহজেই মনে হইবে এ সম্মানের আমরা অধিকারী, আমাদের শৌর্যের ইহা পুরস্কার। আমাদের কাজ সেই অতি যৎসামান্যই থাকিয়া যাইবে অথচ প্রাপ্যের দাবি উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিবে।

প্রবন্ধটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ শুধু আমাদের চারিত্রিক দোষত্রুটির সমালোচনা করেই ক্ষান্ত হন নি, কি ভাবে দেশের প্রকৃত উন্নতিসাধন সম্ভব তারও একটি সুচিন্তিত নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর মতে আমরা যা বলি তা যথার্থভাবে 'আমাদের' কথা নয়; কারণ 'আমরা' মানে শুধু মুষ্টিমেয় শহরবাসী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত নয়, 'আমরা' অর্থে দেশের জনসাধারণ। কিন্তু—

> যাহাদের দেশ আমরা তাহাদের সঙ্গে আদৌ মিলিত হইতেছি না; আমাদের বেশভূষা, আমাদের রাজনৈতিক বক্তৃতার ভাষা ও ভাব-ভংগী দেখিয়া তাহারা অতি দূরে ভীত বিকম্পিত কলেবরে দণ্ডায়মান হইতে বাধ্য হইতেছে।

ইংরেজ-শাসনের প্রত্যক্ষ ফল আমাদের কাছে অশুভ হলেও পরোক্ষ ফল অনেকাংশে শুভ হয়েছিল। এ কথা রবীন্দ্রনাথও অস্বীকার করেন নি। ভারতবাসীর দৃষ্টির সামনে খণ্ড ভারতবর্ষের যে অখণ্ড স্বদেশরূপটি ফুটে উঠল তার জন্যে ইংরেজ-সরকারকেই সাধুবাদ দিতে হয়। কিন্তু ইংরেজ-সরকার যখন বুঝল তাদের শাসন যে পরোক্ষ ফল প্রসব করেছে ভারতবাসীর দিক থেকে তার মূল্য এবং গুরুত্ব কতখানি তখন থেকেই সে শাসনের চেহারাটা বদলাতে লাগল, তখন থেকেই শুধু একটিমাত্র প্রচেষ্টায় সরকারের চিন্তা-ভাবনা কেন্দ্রীভূত হল—কি করে ভারতের এই জাতীয় ঐক্যসূত্রটিকে ছিন্ন করা যায়। এই উদ্দেশ্যে ইংরেজ-সরকার বহুবার বহু উপায় অবলম্বন করেছিল। সেগুলির মধ্যে অন্যতম হল ভাষা-বিচ্ছেদ। আসাম, উড়িষ্যা এবং বাংলার মধ্যে একটা সুস্পষ্ট ভাষাগত মিল লক্ষ্য করা যায়। এক সময় তিনটি অঞ্চলের শিক্ষিতদের ভাষা ছিল বাংলা। ইংরেজ-সরকার যখন এই ভাষাগত যোগসূত্রটিকে অত্যন্ত অযৌক্তিক এবং অন্যায়ভাবে ছিন্ন করতে চাইল তখন রবীন্দ্রনাথ তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করে লিখেছিলেন 'ভাষা-বিচ্ছেদ'।[৫] এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে

৫ দ্রষ্টব্য—'শব্দতত্ত্ব'; পরিশিষ্ট—রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১২শ খণ্ড।

মত ব্যক্ত করেছেন তার সঙ্গে হয়তো অনেকেরই মতের মিল হবে না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সেটা বড় কথা নয়। এ ব্যাপারে ইংরেজ-সরকারের মনের অন্ধকার কক্ষটিতে যে দুরভিসন্ধির জাল বোনা হচ্ছিল রবীন্দ্রনাথের মর্মভেদী দৃষ্টিতে সেটা স্পষ্টই ধরা পড়েছিল। এটাই আসল কথা।

পুরুষানুক্রমিক সম্পদ, ক্ষমতা আর প্রজাসাধারণের কাছ থেকে শংকামিশ্রিত সম্মান লাভ করে এদেশের অনেক জমিদারের এমন ধারণা হয়েছিল যে তাঁরাই বুঝি দেশের প্রকৃত নেতা। নেতৃত্বের এই প্রসঙ্গ তুলে রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় একবার এক প্রবন্ধে কংগ্রেসের নেতাদের প্রতি কটাক্ষ করেছিলেন। এই ব্যাপার নিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'মুখুজ্জে বনাম বাঁড়ুজ্জে'[৬] প্রবন্ধটি লেখেন। জমিদারেরা আসলে কি এবং কি তাঁদের হওয়া উচিত এ সম্বন্ধে তিনি এই প্রবন্ধে তাঁর পরিষ্কার মতামত ব্যক্ত করেছেন।

বিজাতির অন্ধ অনুকরণ এবং স্বজাতির অন্ধ অনুসরণ দুই-ই জাতীয় উন্নতির প্রতিকূল। ইংরেজী শিক্ষা-দীক্ষার সঙ্গে বেশভূষাও আমরা বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করেছিলাম ; কিন্তু এই বিজাতীয় পোষাক যে আমাদের কাছে কতটা উপযোগী তা বিচার করে দেখি নি। শরীরে কোট-প্যাণ্ট চড়িয়ে আমরা মনের মধ্যে সাহেব সাজার লোভকে শান্ত করেছি ; যুক্তি দিয়ে নিজেকে এবং পরকে বোঝাতে চেষ্টা করেছি যে এই সাজটাই কাজকর্মের পক্ষে নিতান্ত উপযোগী, আর এ দেশের পুরুষদের জাতীয় পরিচ্ছদ বলতে আছেই-বা কি। রবীন্দ্রনাথের 'কোট বা চাপকান'[৭] প্রবন্ধটি এই প্রশ্নের ওপরই একটা চমৎকার আলোচনা। তিনি যে শুধু এই পোষাক-সংক্রান্ত সমস্যার একটা সমাধান দিতে চেষ্টা করেছেন তাই নয় (যদিও আজকের দিনে তাঁর সে সমাধানকে মেনে নেওয়া মুস্কিল) হিন্দু-মুসলমানের মিলনের আদর্শটিকেও সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

> বাংলাদেশে যে-ভাবে ধুতি-চাদর পরা হয়, তাহা আধুনিক কাজকর্ম এবং আপিস আদালতের উপযোগী নয়। কিন্তু আচকান চাপকানের প্রতি সে দোষারোপ করা যায় না।
>
> সাহেবী বেশধারীরা বলেন, ওটাও তো বিদেশী সাজ। বলেন বটে,

---

৬ দ্রষ্টব্য—প্রবন্ধ, পরিশিষ্ট—রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১০ম খণ্ড।

৭ 'সমাজ' গ্রন্থের অন্তর্গত।

কিন্তু সে একটা জেদের তর্ক মাত্র। অর্থাৎ বিদেশী বলিয়া চাপকান তাঁহারা পরিত্যাগ করেন নাই, সাহেব সাজিবার একটা কোনো বিশেষ প্রলোভন আছে বলিয়াই ত্যাগ করিয়াছেন।

আর চাপকান যে বিদেশী পোষাক এ কথাও স্বীকার করা চলে না,

কেন না মুসলমানদের সহিত বসনভূষণ শিল্প-সাহিত্যে আমাদের এমন ঘনিষ্ঠ আদানপ্রদান হইয়া গেছে যে, উহার মধ্যে কতটা কার, তাহার সীমা নির্ণয় করা কঠিন। চাপকান হিন্দুমুসলমানের মিলিত বস্ত্র। উহা যে সকল পরিবর্তনের মধ্য দিয়া বর্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে, তাহাতে হিন্দুমুসলমান উভয়েই সহায়তা করিয়াছে।...

এক্ষণে যদি ভারতবর্ষীয় জাতি বলিয়া একটা জাতি দাঁড়াইয়া যায়, তবে কোনমতেই মুসলমানকে বাদ দিয়া হইবে না। যদি বিধাতার কৃপায় কোনোদিন সহস্র অনৈক্যের দ্বারা খণ্ডিত হিন্দুরা এক হইতে পারে, তবে হিন্দুর সহিত মুসলমানের এক হওয়াও বিচিত্র হইবে না। হিন্দুমুসলমানে ধর্মে না-ও মিলিতে পারে, কিন্তু জনবন্ধনে মিলিবে,—আমাদের শিক্ষা আমাদের চেষ্টা আমাদের মহৎ স্বার্থ সেই দিকে অনবরত কাজ করিতেছে। অতএব যে-বেশ আমাদের জাতীয় বেশ হইবে তাহা হিন্দুমুসলমানের বেশ।

'ইম্পীরিয়ালিজ্‌ম্'[৮] প্রবন্ধটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ-সাম্রাজ্যবাদের মুখোস খুলে দিয়ে তার স্বরূপটিকে দেশবাসীর চোখের সামনে তুলে ধরেছেন।[৯]

৮ 'রাজা প্রজা' গ্রন্থের অন্তর্গত।

৯ ইংরেজ-সাম্রাজ্যবাদের আসল চেহারাটা রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ চিন্তা-নায়কেরা এইভাবে উদ্‌ঘাটন করে দেওয়া সত্ত্বেও কয়েক বছর পরে দেখা যায় বিপিনচন্দ্র পাল ইম্পীরিয়ালিজ্‌মের একটা পরিশুদ্ধ রূপ কল্পনায় গড়ে তুলেছেন বাস্তবে যেটা সম্পূর্ণ মিথ্যা হয়ে গেছে: ". . . Let us suppose that the British Government in India were to be reconstituted on a basis which would give the freest possible scope of self-fulfilment to India and continue the association now known as the British Empire. It would be a federal constitution, the freedom of the federated parts being realised in and through the unity of the federated whole. Such a partnership between Great Britain and India . . . . would be preferable to isolated independence for India . . . . (p. xi).

ইম্পীরিয়ালিজ্‌মের যাদুদণ্ড ছুঁইয়ে ইংরেজ অনেক পাপকেই পুণ্য বলে প্রচার করতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর শ্যেনদৃষ্টিতে এই কুহকজাল ভেদ করে শাসক সম্প্রদায়ের প্রকৃত উদ্দেশ্যটিকে জেনে নিলেন, জানিয়ে দিলেন দেশবাসীকে,

> ভারতবর্ষের মত এত বড় দেশকে এক করিয়া তোলার মধ্যে একটা গৌরব আছে। ইহাকে চেষ্টা করিয়া বিচ্ছিন্ন রাখা ইংরাজের মত অভিমানী জাতির পক্ষে লজ্জার কথা।
>
> কিন্তু ইম্পীরিয়ালিজ্‌ম্‌ মন্ত্রে এই লজ্জা দূর হয়। বৃটিশ এম্পায়ারের মধ্যে এক হইয়া যাওয়াই ভারতবর্ষের পক্ষে যখন পরমার্থলাভ তখন সেই মহদুদ্দেশ্যে ইহাকে জাঁতায় পিষিয়া বিশ্লিষ্ট করাই 'হিউম্যানিটি'!
>
> ভারতবর্ষের কোন স্থানে তাহার স্বাধীন শক্তিকে সঞ্চিত হইতে না দেওয়া ইংরাজ সভ্যনীতি অনুসারে নিশ্চয়ই লজ্জাকর; কিন্তু যদি বলা যায় 'ইম্পীরিয়ালিজ্‌ম্‌' তবে যাহা মনুষ্যত্বের পক্ষে একান্ত লজ্জা তাহা রাষ্ট্র-নীতিকতার পক্ষে চূড়ান্ত গৌরব হইয়া উঠিতে পারে।
>
> নিজেদের নিশ্চিন্ত একাধিপত্যের জন্য একটি বৃহৎ দেশের অসংখ্য লোককে নিরস্ত্র করিয়া তাহাদিগকে চিরকালের জন্য পৃথিবীর জনসমাজে সম্পূর্ণ নিঃস্বত্ব নিরুপায় করিয়া তোলা যে কত বড় অধর্ম, কি প্রকাণ্ড নিষ্ঠুরতা, তাহা ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু এই অধর্মের গ্লানি হইতে আপনার মনকে বাঁচাইতে হইলে একটা বড় বুলির ছায়া লইতে হয়।

বঙ্গভঙ্গকে উপলক্ষ করে বিদেশী-বর্জন ও স্বদেশী-গ্রহণের যে আন্দোলন প্রচণ্ড রূপ ধারণ করেছিল অনেক আগে থেকেই তার প্রস্তুতি বাংলার মাটিতে দানা বেঁধে ওঠে। এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব কোন রাজনৈতিক নেতার চেয়ে কম নয়। আমাদের দেশকে যে সম্মান দিতে পারে নি সেই বিদেশীর কাছ থেকে সম্মান পাবার আশায় আবেদন-নিবেদন করে শুধু অনাদর আর অসম্মানই পাওয়া যেতে পারে। দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত স্বদেশকে অন্তরের সঙ্গে ভালোবাসতে না পারলে এ অপমান কিছুতেই ঘুচবে না। 'ভিক্ষায়াং নৈব

This Imperialism offers, therefore, an essentially higher ideal than Nationalism. . . . ." (p. xiv).

Introduction : *Nationality and Empire,* Bipin Chandra Pal.

নৈব চ'[১০] কবিতাটির মধ্যে (আষাঢ়, ১৩০৫) রবীন্দ্রনাথের সেই একনিষ্ঠ স্বদেশ-প্রেমের সুরটিই ধ্বনিত হয়ে উঠেছে—

তোমার যা দৈন্য, মাত, তাই ভূষা মোর
কেন তাহা ভুলি,
পর ধনে ধিক্ গর্ব—করি কর জোড়,
ভরি ভিক্ষা ঝুলি।
পুণ্য হস্তে শাক-অন্ন তুলে দাও পাতে,
তাই যেন রুচে।
মোটা বস্ত্র বুনে দাও যদি নিজ হাতে
তাহে লজ্জা ঘুচে।
সেই সিংহাসন যদি অঞ্চলটি পাত,
কর স্নেহ দান।
যে তোমারে তুচ্ছ করে সে আমারে, মাত,
কী করিবে দান।

সরলা দেবী (১৮৭২-১৯৪৫)ঃ ১৩০৫ সালের চৈত্র সংখ্যা প্রকাশ করে রবীন্দ্রনাথ ভারতীর সম্পাদকীয় দায়িত্ব ত্যাগ করলে তাঁর ভগিনী স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা সরলা দেবী তা গ্রহণ করেন এবং অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে দীর্ঘ নবছর সেই দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর সময়ে (বৈশাখ ১৩১২ থেকে) ভারতীতে একটি নতুন বিভাগ খোলা হয়; বিভাগটির নাম 'খেয়াল খাতা'। এই বিভাগে কি ধরনের লেখা প্রকাশিত হবে সে সম্বন্ধে প্রমথ চৌধুরী প্রথমেই লেখক ও পাঠকদের ধারণা অনেকটা পরিষ্কার করে দিতে চেষ্টা করেন। 'খেয়াল খাতা'র উদ্বোধনী রচনার এক জায়গায় তিনি লিখছেন, "খেয়াল খাতা ভারতীর চাঁদার খাতা। স্বেচ্ছায় স্বচ্ছন্দচিত্তে যিনি যা দেবেন তা' সাদরে গৃহীত হ'বে। আধুলি, সিকি, দু'আনি কিছুই ফেরৎ যাবে না, শুধু ঘষা পয়সা ও মেকি চলবে না। কথা যতই ছোট হোক, খাঁটি হওয়া চাই, তার উপর চকচকে হ'লে ত কথাই নেই।··· খেয়ালী লেখা বড় দুষ্প্রাপ্য জিনিষ। কারণ সংসারে বদখেয়ালী লোকের কিছু

১০ 'কল্পনা' গ্রন্থের অন্তর্গত।

কমতি নেই, কিন্তু খেয়ালী লোকের বড়ই অভাব।" এই বিভাগটিতে সে সময় স্বাদেশিকতামূলক অনেকগুলি চমৎকার রচনা প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্নভাবে জাতীয় উন্নতিসাধনের সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় ঠাকুর পরিবারের পুরুষদের সঙ্গে মহিলারাও প্রায় সমান অংশই গ্রহণ করেছিলেন। স্বদেশ ও স্বদেশবাসীর অবস্থা সম্বন্ধে ভারতীয় নারী-সমাজকে সচেতন করে তুলতে না পারলে এই প্রচেষ্টা যে সফল হতে পারে না এ ধরনের বিচার-বোধ প্রগতিশীল মনোভাবের শ্রেষ্ঠ পরিচয়। এই বিচার-বোধের সঙ্গে এক অসাধারণ তেজস্বিতার সমন্বয় ঘটেছিল সরলা দেবীর মধ্যে। পুঞ্জীভূত অন্ধ কুসংস্কারকে চূর্ণ করে ভারতের নারী-সমাজকে জাগিয়ে তোলার কাজে তিনি সেদিন যে শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন বাঙালী সে-কথা কোনদিন ভুলবে না। তাই তাঁর সম্পাদনাকালটি ভারতীর 'নির্দয় নব-যৌবন'-এর যুগ।

এই সময়ে সরলা দেবীর যে রচনাগুলি ভারতীতে প্রকাশিত হয় সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য, প্রবন্ধ—'সাদা কাজীর বিচার' (কার্তিক, ১৩০৯) এবং 'কংগ্রেস ও স্বায়ত্তশাসন' (বৈশাখ, ১৩১২); গান—'হিন্দুস্থান' (মাঘ, ১৩০৮) এবং 'বীরাষ্টমীর গান' (কার্তিক, ১৩১১); কবিতা—'মাতৃদ্রোহীর প্রতি' (শ্রাবণ, ১৩১৩) এবং 'ভয় নাই' (মাঘ, ১৩১৩) ও 'খেয়াল খাতা' বিভাগের একটি রচনা 'বাঙালীর পরীক্ষা' (আশ্বিন, ১৩১২)।

মুসলমান আমলে এ দেশে কাজীরা যে বিচার করতেন তাতে প্রায়ই ন্যায় বা নীতির মর্যাদা রক্ষা পেত না। ইংরেজ আমলেও যে উন্নত বিচার-প্রণালী প্রচলিত হল তা আসলে সেই কাজীর বিচারই, তফাৎ শুধু বিচারকের গায়ের রঙে। লঘু অপরাধে, বহু ক্ষেত্রে বিনা অপরাধেও ভারতবাসীকে গুরু শাস্তি ভোগ করতে হত; আর গুরু অপরাধে ইংরেজরা পেত লঘু শাস্তি, বহু ক্ষেত্রে মুক্তি। প্রবন্ধটির মধ্যে বিভিন্ন উদাহরণ আহরণ করে ইংরেজের তথাকথিত উন্নত বিচার-প্রণালীর এই বর্ণচোরা রূপটিকে সরলা দেবী চমৎকার ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

> তাঁহারা এদেশে চাকুরী করিতে আসিয়াছেন; ন্যায় যেখানে কুটুম্বগণের, ভাই বেরাদারগণের স্বার্থের বিরোধী হয় সেখানে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া হ-য-ব-র-ল-রূপে বিচার কার্য নিষ্পন্ন করাই এখন চাকুরী রক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায়, তাহাতে দুই-পাঁচটা নেটিভের মান, সম্ভ্রম, অর্থ, গৌরব, সর্বস্ব নষ্ট হউক বিচারপতিগণের তাহা দেখিবার অবসর কোথায়? দেশের শাসনকর্তাগণের

এই দুর্বলতা দেখিয়া বেসরকারী ইংরাজ-সমাজও ক্রমে সুর উচ্চ করিতেছে। কুলি ঠেঙ্গাইয়া তাহার হাড় ভাঙ্গিয়া দিলে যদি কোন ইংরাজের জেল হয়, তাহা হইলে ক্ষমতাপন্ন এংলোইণ্ডিয়ান ডিফেন্স সভা হইতে চুনা গলির জয়ঢাকবাহী ডিক্রুজ সাহেব পর্যন্ত একেবারে সেই বিচারের উপর খড়্গ-হস্ত।

কংগ্রেসের অধিবেশন হত বছরে মাত্র তিন দিন। এই তিন দিনে কিছু বক্তৃতা দেওয়া আর কিছু রেজল্যুশন পাশ করানো ছাড়া কংগ্রেস দেশের গঠন-মূলক কোন কাজে তখনো হাত দেন নি। অথচ স্বায়ত্তশাসন লাভের জন্যে আবেদন-নিবেদনের শেষ ছিল না। কিন্তু এই স্বায়ত্তশাসন যে আমরা নিজের জোরে এবং চেষ্টায় লাভ করতে পারি 'কংগ্রেস ও স্বায়ত্তশাসন' প্রবন্ধে লেখিকা সেই প্রসঙ্গ নিয়েই বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

"অতীত গৌরববাহিনী মম বাণি! গাহ আজি 'হিন্দুস্থান'"—গানটি 'হিন্দুস্থান' নামে ভারতীতে প্রকাশিত হয়। গানটির সম্বন্ধে পাদটীকায় লেখা আছে, "এই সংগীতটি জাতীয় মহাসমিতির সপ্তদশ অধিবেশনে ১৯০১ খৃষ্টাব্দে বাংলা, বেহার, আসাম, মাদ্রাজ, পঞ্জাব, গুজরাট প্রভৃতি ভারতবর্ষের নানা প্রদেশস্থ হিন্দু, পার্সি, জৈন, ক্রীশ্চান ও মুসলমান সকল ধর্মাবলম্বী ৫৬ সংখ্যক গায়কগণ কর্তৃক সমস্বরে গীত হয়।"

'বীরাষ্টমীর গান'-টির প্রতিটি চরণে বলিষ্ঠ স্বদেশ-প্রেমের সুর ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। শেষের কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত হল—

স্বদেশানুরাগে যেই জন জাগে, অতি মহাপাপী হোক না কেন,
তবুও সে জন অতি মহাজন সার্থক জনম তাহার জেনো।
দেশহিতব্রত এ পরশমণি, পরশিবে যারে বারেক যখনি,
রাজভয় আর কারাভয় তার ঘুচিবে তাহার তখনি জেনো।
মাতৃভূমি তরে যেই অকাতরে নিজ প্রাণ দিতে কভু নাহি ডরে
অপঘাত ভয় আশু তার যায় মরণে গোলোকে যায় সেই জন।

সরলা দেবী যে কয়েকটি কবিতা লিখেছেন সেগুলির মধ্যেও একটা সহজ আন্তরিকতা অবারিত ভাবে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। 'মাতৃদ্রোহীর প্রতি' এবং 'ভয় নাই' কবিতা দুটিতে তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাবে।

ও কি রে সাজ !
বিলাস-বসনে ভূষিত অঙ্গ
নাহিরে লাজ !
কাঙ্গালিনী ওই জননী তোদের,
নাহিরে ঠিকানা উদরান্নের ;
তারি স্থত তুমি গর্বে চলেছ
পরিয়া তাজ,
নাহিরে লাজ !

* * *

খাটিবি আয়,
জননীরে আজি রাখিতে সকলে
মরিবি আয়।
যে শোণিত ওরা লয়েছে শুষিয়া
পুরা তাহা আজি নিজ লহু দিয়া ;
মাতৃদ্রোহীর প্রায়শ্চিত্ত
মানিব তায়,
মরিবি আয়।

('মাতৃদ্রোহীর প্রতি' : ১ম ও শেষ স্তবক)

সারাটা বিশ্ব চকিত চক্ষে
চাহিয়া মোদের পানে
'পতিত দলিত এ জাতি কভু কি
পারিবে জিনিতে রণে ?'
লব শিরে কি গো কলঙ্ক ডালি !
সহিব পরের উপহাস গালি !
কভু নয়, নয়। মাঝ পথ হতে
আমরা কি ফিরি ভাই !
মায়ের মন্ত্রে দীক্ষিত সবে
কোন ভয় নাই, নাই।

('ভয় নাই'—২য় স্তবক)

বাঙালীর ভাবপ্রবণতা জগদ্বিখ্যাত; কিন্তু তার কর্মপ্রবণতাও যে অন্য কোন জাতির চেয়ে কম নয় তার প্রমাণ সে দিয়েছে স্বদেশী যুগে। সে সময় বাঙালী যে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয় সরলা দেবী তার উল্লেখ করে লিখেছেন,

> এক একটা ভাবের ঠেলায় অনেকটা কাজ অগ্রসর হইয়া যায়। এইবার বঙ্গভঙ্গ ব্যাপারে বাঙালী ভাবের সম্বন্ধে কাজের মাঝ গঙ্গে গিয়া পৌঁছিয়াছে। বিদেশী বস্তু বর্জন করিয়া স্বদেশী দ্রব্যজাত ব্যবহার করার সংকল্প আজ কয়েক বৎসর যাবৎ কতিপয় খেয়ালী লোকের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। এইবার বিজাতীয় অংকুশের পীড়নে দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই মাথার টনক নড়িয়াছে। রাজধানী হইতে আরম্ভ করিয়া বাংলার সমস্ত প্রধান নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে যে তুমুল উৎসাহের তরঙ্গ উঠিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, এ ভাব যদি স্থায়ী হয় তবে বাংলার ললাট-লিপিতে জর্জ নাথানিয়েল কার্জন তাহার মহামিত্র বলিয়া লিখিত ছিলেন।
>
> ('বাঙালীর পরীক্ষা' : 'ভাবের ঠেলা'।)
>
> …বাঙালীর পরীক্ষা এখনও শেষ হয় নাই, সবে আরম্ভ হইয়াছে। তবে জগতের চক্ষে এবার তাহার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার লক্ষণ উদ্ভাসিত হইতেছে। জগৎ যেন প্রতারিত না হয়, আমরা নিজেরা যেন নিজেকে বঞ্চনা না করি,—এ দৃঢ়তা, এ কার্যকারিতা, এ অকুতোভয়তা যেন আমরা শেষ পর্যন্ত রক্ষা করিতে পারি।
>
> তাই বলি মন জেগে থাক্
> পাছে আছেরে শ্বেত চোর!
> কালী নামের অসি ধর্, তারা নামের ঢাল,
> ওরে সাধ্য কি বৃটেনে তোরে করতে পারে জোর॥
>
> ('বাঙালীর পরীক্ষা' : 'শংকা নিবারণ')

হিরণ্ময়ী দেবী (১৮৬৮-১৯২৫): সরলা দেবীর সঙ্গে তাঁর জ্যেষ্ঠা ভগিনী হিরণ্ময়ী দেবীর নামও স্বাভাবিক ভাবেই এসে পড়ে। সাহিত্য জগতে তিনি পরিচিত না হলেও কর্ম-জগতে সুপরিচিত ছিলেন। বাংলা তথা ভারতের নারী-জাগরণের ইতিহাসে স্বর্ণকুমারী দেবী এবং তাঁর এই দুই কন্যার অবদান

যথেষ্ট। স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাংলার কোন কোন গ্রামে আত্মনির্ভরতার যে দুর্দমনীয় প্রেরণা জেগেছিল তার কিছু পরিচয় পাওয়া যায় হিরণ্ময়ী দেবীর 'মাতৃপূজা' নামক প্রবন্ধে (মাঘ, ১৩১২)। ভারত-মহিলা পরিষদে এটি তিনি পাঠ করেছিলেন।' সমসাময়িক তথ্যের দিক থেকে লেখাটি মূল্যবান। বাংলার গ্রামবাসী সাধারণ মহিলারাও যে দেশকে আত্মনির্ভর হতে কতখানি সাহায্য করেছিলেন লেখিকা তা স্বচক্ষে দেখে এসে বর্ণনা করেছেন।

কোন গ্রামের কয়েকজন মহিলা একত্রিত হয়ে একটি সমিতি গড়ে তোলেন। সমিতির কোন নাম ছিল না, চাঁদা ছিল না। মহিলারা 'মায়ের কৌটা' নামে একটা ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। প্রতিদিন এক আধটি করে পয়সা বা এক মুঠো চাল তাঁরা সেই কৌটায় রাখতেন। মাসের শেষে এগুলো কর্মকর্ত্রী সংগ্রহ করে নিতেন। সমিতির সমস্ত মহিলাকেই কিছু-না-কিছু শিল্পকাজ করার জন্যে সমিতি থেকে উপকরণ দেওয়া হত। তাঁরা প্রতিদিন অবসর মতো দুএক ঘণ্টা এই কাজে ব্যয় করে প্রস্তুত জিনিস কর্মকর্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দিতেন। এগুলো বিক্রয় করেও সমিতির বেশ আয় হত। এছাড়া ধনী গ্রামবাসীদের কাছ থেকেও এককালীন দান গ্রহণের ব্যবস্থা ছিল। সমিতির তিনখানি মাত্র খাতা ছিল; একটিতে গ্রামের সমস্ত বাড়ীর তালিকা থাকত, দ্বিতীয়টিতে শিল্পকর্মের জন্যে মহিলাদের উপকরণ দেওয়ার এবং তাঁদের কাছ থেকে গৃহীত শিল্পদ্রব্যের হিসাব রাখা হত আর তৃতীয়টি ছিল এককালীন দানের হিসাবের খাতা। সপ্তাহে একবার করে মহিলা-সমিতির সম্মিলন হত, এবং এই সম্মিলনেও সময়ের অপচয় হত না। সমিতির যে যথেষ্ট আয় হত তা বোঝা যায়, কারণ সেই আয়ের উদ্বৃত্ত অংশ দিয়ে গ্রামের একটি বালিকা-বিদ্যালয়ের সাহায্য হত।

এই প্রবন্ধে আর একটি মূল্যবান তথ্য আছে। সেটি লেখিকার ভাষাতেই জানাই—

> …আজ যে শিল্প-প্রদর্শনী বর্ষে বর্ষে ভারতের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হইতেছে—ভারতের শিল্পোন্নতির সহায়তা করিতেছে, ইহার প্রথম সূত্রপাত মহিলার দ্বারা। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার কতিপয় ভদ্রমহিলা সখি-সমিতি[১১] নামক একটি মহিলা-সমিতি স্থাপন করেন—সমিতির অন্যান্য উদ্দেশ্যের মধ্যে

১১ স্বর্ণকুমারী দেবীই ছিলেন এই সমিতির প্রতিষ্ঠাত্রী এবং সম্পাদিকা।

মহিলা শিল্পের উন্নতি করা একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্যে সমিতি হইতে বর্ষে বর্ষে মহিলা শিল্প-মেলা নামক একটি বার্ষিক প্রদর্শনীর অধিবেশন হইত। তথায় মহিলা শিল্পের একটি বিশেষ বিভাগ থাকিত ও এই মহিলা শিল্পের জন্য পারিতোষিক প্রদত্ত হইত। তদ্ভিন্ন আগ্রা, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, কাশী, কাশ্মীর, কটক, কৃষ্ণনগর, জয়পুর, বহরমপুর প্রভৃতি শিল্প-প্রসিদ্ধ স্থান হইতে তথাকার বিশেষ বিশেষ শিল্প আনীত হইত। ৫।৬ বৎসর এই শিল্প-মেলার অধিবেশনের পর, কলিকাতার Industrial Association হইতে সুবৃহৎ আকারে এইরূপ শিল্প-মেলার অধিবেশন হয়। এই মেলার অনুষ্ঠাতাগণ ইতিপূর্বে মহিলা শিল্প-মেলায় তাঁহাদের আত্মীয়াদের অভিভাবক রূপে সহায়তা করিতেন এবং Industiral Association হইতে অনুষ্ঠিত মেলার মহিলা-বিভাগে সখি-সমিতির মহিলাগণ বিশেষ সাহায্য করেন। এই অধিবেশনের পর মহিলা শিল্প-মেলার স্বতন্ত্র অধিবেশন আর হয় নাই। ক্রমে এই Industrial Association-এর অনুষ্ঠিত শিল্প-মেলা কংগ্রেসের সহিত যুক্ত হইয়া Industrial Exhibition-এ পরিণত হইয়াছে।

প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬) : ভারতীতে প্রকাশিত প্রমথ চৌধুরীর দুটি প্রবন্ধ এই প্রসঙ্গে খুবই মূল্যবান—"'বয়কট' ও 'স্বদেশীয়তা'" (আশ্বিন, ১৩১২) এবং 'তেল, লুন, লকড়ি'[১২] (মাঘ, ১৩১২)। এ দুটির মধ্যে প্রথমটি তাঁর কোন গ্রন্থে স্থান পায় নি। সবুজ-পত্র প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা সাহিত্যের আসরে প্রমথ চৌধুরী তাঁর অসাধারণ স্বকীয়তা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেন। কিন্তু বহু আগে থেকেই অন্যান্য রচনাতেও তাঁর এই স্বকীয়তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল[১৩]। বিলাতী দ্রব্য বয়কট ও স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার সম্বন্ধে তখন নেতাদের মধ্যে বেশ একটা মতভেদ দেখা দিয়েছিল[১৪]। "'বয়কট' ও 'স্বদেশীয়তা'" প্রবন্ধটিতে

১২ প্রবন্ধটি লেখকের 'নানা কথা' গ্রন্থে আছে।

১৩ "১৯১৩ সালের আগেও প্রমথবাবুর লেখা অল্পস্বল্প বাহির হইয়াছিল, এবং সে লেখায় স্বাতন্ত্র্য ও প্রচণ্ডতা কিছু কম ছিল না।"—'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' ডাঃ সুকুমার সেন, ৪র্থ খণ্ড, পৃ ২০১

১৪ এই মতভেদ পরবর্তীকালেও বিদ্যমান ছিল। তাই দেখা যায় ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের বাঁকিপুর অধিবেশনে স্বদেশী সম্বন্ধে প্রস্তাব উত্থাপন করতে গিয়ে বাংলার বিখ্যাত নেতা অম্বিকাচরণ মজুমদার বলেছিলেন স্বদেশী নাকি প্রতিহিংসা এবং প্রতিশোধস্পৃহার মধ্যে দিয়েই জন্মলাভ

প্রমথ চৌধুরী তাঁর রচনাভঙ্গির সহজাত সরসতার মধ্যে দিয়ে এই দুটি বিষয়ের প্রকৃত তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন।

স্বদেশী জিনিস ব্যবহার করতে হবে এবং করা উচিত এমনি একটা আদর্শবাদের কথা স্বদেশী আন্দোলনের বহু আগে থেকেই শোনা যাচ্ছিল; কিন্তু সে জিনিস যে আসবে কোথা থেকে তার কোন বাস্তব হদিস দেওয়া হয় নি। আদর্শবাদের হাইড্রোজেন গ্যাসে ফুলে উঠে তখন আমরা অনেকেই শুধু কল্পনার স্বদেশী আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছিলাম। বঙ্গভঙ্গের আঘাত খেয়ে যখন আমরা মর্তের মাটিতে এসে পড়লাম তখনই আমাদের যথার্থ চেতনা হল। এই প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরী লিখেছিলেন—

> আমাদের কোটি কোটি ইতর-সাধারণের পক্ষে দেশের কথা প্রধানতঃ পেটের কথা। তাদের ক্ষুধা নিবৃত্তির উপায় যদি না ক'রে দিতে পারি তাহলে আমাদের দূরে থাকাই ভাল। যারা পেটের জ্বালায় জ্বলছে তাদের উপরন্তু কথার জ্বালায় জ্বালাবার কোন দরকার নেই। শিল্পীর উন্নতি, ইংরেজীতে যাকে বলে supply, তার উপর নির্ভর করে। নিজের দেশের গড়া জিনিস চাওয়াটার চাইতে পাওয়াটাই হচ্ছে বিশেষ দরকার। আমরা সব পুঁথি-পড়া লোক demand-এর সৃষ্টি করতে পারি কিন্তু supply-এর সৃষ্টি করতে পারি নে। মনের ভাবকে আমরা বদলে দিতে পারি কিন্তু বস্তুজগৎকে আমরা কায়দা করতে পারি নে। পিপাসা বাড়লেই যে জলের পরিমাণ আপনি বেড়ে যাবে এমন কোন জাগতিক নিয়ম আমার জানা নেই। এই সব কারণে এতদিন আমাদের দ্বারা দেশীয় শিল্পের উন্নতির বিশেষ কোন সাহায্য হয় নি। শিল্পজাত দ্রব্য কাজে লাগে বলে, আমাদের আবশ্যকীয় এবং সুন্দর বলে আমাদের আদরের সামগ্রী। কলের হাত পা আছে, পেট আছে, কিন্তু চোখ নেই, সেই জন্য কলে গড়া জিনিস আমাদের কাজে লাগে, কিন্তু আমাদের সৌন্দর্যজ্ঞানকে পরিতৃপ্ত করতে পারে না। কিন্তু হাতে গড়া জিনিসে অনেক সময় উভয় গুণই বর্তমান থাকে। সুতরাং আমাদের মধ্যে যারা খালি কাযের লোক নয়, এমন দু'চারজন,—দেশীয়

করেছিল, কিন্তু পরে তা স্বদেশ-ভক্তিতে রূপায়িত হয়। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ তাঁর 'কংগ্রেস' গ্রন্থে অম্বিকাচরণের এই উক্তির প্রতিবাদ করেছেন।

শিল্পজাত দ্রব্যের আদর করতে শিখছিলুম; Economics ছেড়ে Aesthetics ধরে যতটুকু হয় স্বদেশী শিল্পের মর্যাদা রক্ষা করতে চেষ্টা কচ্ছিলুম। অরুচি রোগটা সৌখিন লোকেদের মধ্যেই হয়ে থাকে, সাধারণের মধ্যে সেটা চারিয়ে দেওয়া যায় না; এবং দেওয়াটাও ইচ্ছনীয় নয়। দু'মাস আগে আমাদের 'স্বদেশীয়তা' এই অবস্থায় ছিল।

তারপর বয়কট সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরী এক জায়গায় লিখেছেন—

বয়কটের ভিতর লোকসান আছে, স্বার্থত্যাগ আছে, অথচ আজকের দিনে ধনী, দরিদ্র, আবালবৃদ্ধবনিতা বাঙালীমাত্রেই বৃটিশ মাল বয়কট করব এ কঠিন পণ কেন ক'রে বসেছে? কারণ এই বঙ্গবিভাগে সকলের মনে এতটা আঘাত লেগেছে যে তারা দু'দিনের জন্যও নিজের স্বার্থ ভুলে নিজেদের জাতীয় জীবন অক্ষুন্ন রাখবার চেষ্টা করছে। কেবল Economics-এর দোহাই দিয়ে মানুষের মনে এ ভাব, এত দৃঢ়তা আনা যায় না। যে সকল বক্তা পার্টিসনের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে বয়কটকে জিইয়ে রাখবার চেষ্টা করছেন তাঁরা আমার মতে গোড়া কেটে আগায় জল ঢালছেন। দ্বিতীয় কথা, বয়কট, আমরা রাজার অবিচারের প্রতিকারের উপায় স্বরূপ মনে করি। ইংরাজ জাতের পকেটে টান পড়লে, চাই-কি বাঙালীর প্রতিও তাঁদের নজর পড়তে পারে, এই বিশ্বাসে, এই আশায় বয়কটের জন্ম। আমরা আর যত প্রকার রাজনৈতিক আন্দোলন করি সে সব ইংরাজের কাছে আমাদের শেখা। বয়কট হচ্ছে খাঁটি দেশী চিজ্—সেইজন্য দেশশুদ্ধ লোক এতে যোগদান করেছে।···

স্বদেশীয়তার ভিত্তি লাভের উপর। বয়কটের প্রাণ ক্ষতি স্বীকারের উপর। কেবল অর্থলাভের উপর স্বদেশীয়তা দাঁড়াতে পারে। কিন্তু বয়কটের পিছনে অনেকটা স্বজাতি-বৎসলতা থাকা চাই। স্বদেশীয়তা ধীরে-সুস্থে চর্চা করবার বিষয়। বয়কট আসন্ন বিপদ হ'তে উদ্ধার হ'বার সময়োপযোগী উপায়।···শেষ কথা এই যে, বয়কটের মুখ্য উদ্দেশ্য লাভ করি আর নাই করি এর গৌণ ফল অতি শুভ। এই ঝোঁকে আমাদের স্বদেশীয়তা প্রাণ লাভ করেছে।···যাঁরা বলেন বয়কট রাজনীতির কথা তাঁদের কথাও ঠিক; যারা বলেন স্বদেশীয়তা অর্থনীতির কথা তাঁদের

কথাও ঠিক। আর আমরা আপামরসাধারণ যারা মনে করি ও দুই-ই এক দেহের পৃথক অঙ্গ এবং আমাদের রাজনৈতিক উন্নতির ইচ্ছাই হচ্ছে সে দেহের প্রাণ, আমাদের মতই সকলের চাইতে বেশি ঠিক।

'তেল, নুন, লকড়ি' প্রবন্ধটিও এই জাতীয় রচনার একটি সুন্দর নিদর্শন। আমাদের সমাজে বিলাতী সভ্যতার প্রভাবের ফল, অন্ধ অনুকরণের পরিণাম ইত্যাদি বিষয় নিয়ে লেখক এতে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। সামান্য অংশ উদ্ধৃত হল—

> স্বদেশী আচার-ব্যবহার ছাড়বার সময় আমরা পুরুষরা পহিলা-সমিতি করি নি, এখন ফিরে ধরবার ইচ্ছেয় আমরা মহিলা-সমিতি পর্যন্ত গঠন করেছি। এই যথেষ্ট প্রমাণ যে আমাদের নূতন ভাব কার্যে পরিণত করতে হলে, ভাবনা-চিন্তা চাই, কি রাখব কি ছাড়ব তার বিচার চাই, পাঁচ জনে একত্র হ'য়ে কি করতে পারব আর কি করা উচিত তার একটা মীমাংসা করা চাই—এক কথায় ইংরেজ যে উপায়ে কৃতকার্য হয়েছে সেই উপায়—একটা পদ্ধতি অবলম্বন করা চাই।…আমাদের বিদেশীয়তার ভিতর হিসাব ছিল না, স্বদেশীয়তার ভিতর হিসাব চাই।…সমাজে থাকতে হলে বুদ্ধিবৃত্তির বিশেষ কোন চর্চা করবার দরকার নেই, প্রচলিত নিয়মের নির্বিচারে দাসত্ব স্বীকার করলেই হল, ছাড়তে হলেও দরকার নেই—নির্বিচারে নিয়ম লঙ্ঘন করলেই হল। কিন্তু ফিরতে হলে, মানুষ হওয়া চাই, কারণ যে ফেরে সে নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা কর্তব্য স্থির ক'রে নিয়ে স্বেচ্ছায় ফেরে।

ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৮-১৯২৯)ঃ শিক্ষিত বাঙালীর কাছে ললিতকুমারের পরিচয় অজানা নয়। ইংরেজী, বাংলা ও সংস্কৃত এই তিন সাহিত্যের রসধারাই তিনি আকণ্ঠ পান করেছিলেন। বিদগ্ধ প্রাবন্ধিক এবং সমালোচক হিসাবে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি যথেষ্ট সুনামের অধিকারী। ভারতীতে প্রকাশিত তাঁর দেশাত্মবোধক দুটি রচনার উল্লেখ করছি; একটি প্রবন্ধ—'প্রস্তাবিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়' (অগ্রহায়ণ, ১৩১২) এবং অপরটি ব্যঙ্গাত্মক কবিতা—'গোরাচাঁদ বনাম শ্যামা মা' (পৌষ, ১৩১২)। ললিতকুমার কবিতা বিশেষ লিখেছেন বলে জানা যায় না। তাই এখানে তাঁর লেখা এই দুষ্প্রাপ্য কবিতাটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হল। গোরাচাঁদ ইংরেজ ও শ্যামা মা বঙ্গজননী।

গোরাচাঁদ বনাম শ্যামা মা

(শ্যামা বিষয়ক)

ও হে গৌর গৌর হে, তোমার মুখে পড়ুক্ ছাই।
ইচ্ছে করে যাই হে মরে' লয়ে তোমার গুণের বালাই ॥
তোমার মুখে জ্ঞানের আলো, যে পায় সে না বাসে ভাল ;
আপন জনে খোলা মনে, হয়ে যায় ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই ॥
ভেদ বুদ্ধি ভেবে সার পাকা চাল চাললে এবার,
সোনার বাংলা চুরমার করলে তুমি দুটা দুঠাই ॥
শেল দিয়েছ মোদের বুকে, বল্ হে গৌর আর কি সুখে
সখা ভাবে ভজ্‌বো তোকে, তোমার প্রেমনীতিতে ফাই ফাই ॥
তোমার মুলুকের আমদানী, বসন ভূষণ চুড়ী চিরুনী,
ছড়ি জুতা, চোখরাঙানী, প্রেমের গৌর আর না চাই ॥
চুরুট সাবান পাঙ্গা লবণ, দোবরা চিনি লোহার বাসন,
সাগর জলে দিই বিসর্জন, তোমায় ভজ্‌লে ধর্ম নাই ॥
কালাপানির অতল জলে চায়ের রাশি দিল ফেলে,
স্বদেশ-ব্রতে প্রাণটা ঢেলে, মার্কিণ তুল্য কীর্তি নাই ॥
এখন গৌরচাদকে ছেড়ে দিয়ে ভজ্‌বো মোদের শ্যামা মায়ে,
কালী কালী নাম জপিয়ে মনের কালি মুছবো ভাই ॥
ঘুচেছে মোহ এতদিনে, সুজন কুজন লই হে চিনে,
গতি নাই রে শ্যামা বিনে, ঘরের ছেলে ঘরে যাই ॥
ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে, সাধের শ্যামা মাকে ঘিরে,
আবেগভরা চাপা সুরে, স্বদেশপ্রেমের গুণ গাই ॥
লাঞ্ছনার আর বাকী নাই, পর হয়েছে আপন ভাই,
সবাই মিলে কানমলা খাই, মিটেছে মোদের বিলাতী বাই ॥

বিজয়চন্দ্র মজুমদার (১৮৬১-১৯৪২) : বিজয়চন্দ্র মজুমদারের রচনা তখনকার নামকরা বহু পত্রিকাতেই প্রকাশিত হত। ভারতীতে প্রকাশিত তাঁর স্বাদেশিকতা-মূলক রচনাগুলির মধ্যে এই কটি উল্লেখযোগ্য—প্রবন্ধ : ইংরাজ-স্বার্থ

ও দেশের হিত' (শ্রাবণ, ১৩১২); ব্যঙ্গ-রচনা : 'বঙ্গচ্ছেদে লক্ষ্মী-বিষ্ণু সংবাদ' (আশ্বিন, ১৩১২); কবিতা : 'প্রার্থনা' (আশ্বিন, ১৩১৩) এবং 'নব-জীবন' (অগ্রহায়ণ, ১৩১৩)।

'ইংরাজ-স্বার্থ ও দেশের হিত' বঙ্গভঙ্গের ওপর লেখা একটি মূল্যবান প্রবন্ধ। প্রবন্ধের স্থরুতে লেখক বলেছেন যে এ দেশের নাম যখন ছিল ভারতবর্ষ তখন এ দেশ ছিল ভারতবাসীর ; তারপর যখন হল হিন্দুস্থান তখনো এদেশের লোকের পুরো অধিকার ছিল তাদের দেশের ওপর ; কিন্তু যখন এ দেশের নাম হল ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়া তখন থেকে ভারতবাসী তাদের দেশকে স্বদেশ বললে রাজদ্রোহের অপরাধ ঘটতে লাগল। এই প্রসঙ্গে এক জায়গায় বিজয়চন্দ্র লিখেছেন—

> পেটেণ্ট ঔষধ বিক্রেতা বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন, যে তাঁহার ঔষধ ক্রয় করিলে 'উপকার হইবে'। উপকার হইবে এ কথাটি সত্য ; কিন্তু সে উপকার ক্রেতার কি বিক্রেতার এ কথা বুঝিতে না পারিয়া অনেক বুদ্ধিহীন ক্রেতা অসন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। ইংরাজ সরকার যখন বৃটিশ-ইণ্ডিয়ার শাসন এবং পালনের জন্য কোন বিধান করেন, তখন যদি কেহ লুপ্ত ভারতবর্ষ অথবা সাবেক হিন্দুস্থানের বংশধরদিগের হিত বা অহিতের কথা লক্ষ্য করিয়া উহার সমালোচনা করেন তবে তিনি নির্বোধ। শাসনকর্তারা কোন ব্যবস্থাকে যখন 'উপকারী' বলেন, তখন উহাকে অহিতকর প্রপঞ্চ মনে করিবার পূর্বে যদি 'কাহার ?' এই বীজমন্ত্রটি উচ্চারণ করা যায়, তাহা হইলে মায়া-মোহ কাটিয়া যাইবে।

'বঙ্গচ্ছেদে লক্ষ্মী-বিষ্ণু সংবাদ' বঙ্গভঙ্গের ওপর একটি অপূর্ব ব্যঙ্গ-রচনা। বাংলা সাহিত্যের আসরে কবি এবং প্রবন্ধকার হিসাবে বিজয়চন্দ্রের স্থনাম ছিল। কিন্তু ব্যঙ্গ-রচনাতেও তাঁর যে যথেষ্ট দক্ষতা ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে এই রচনাটিতে। বিজয়চন্দ্রের এ ধরনের লেখার পরিমাণ খুবই অল্প। এটি তাঁর কোন গ্রন্থে স্থান পায় নি। তাই পত্রিকার পৃষ্ঠা থেকে সম্পূর্ণ রচনাটি এখানে উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না।

> মাথার উপর বঙ্গসাগররূপ টানাপাখার তরঙ্গ দুলিতেছে, শয্যা অতি স্থশীতল অনন্ত-দেহ, লক্ষ্মী তাঁহার স্থকোমল পদ্মহস্তখানি গায়ে বুলাইতেছেন ; কাজেই বিষ্ণু, মহাস্থখে ঘোর নিদ্রায় অভিভূত। সহসা চঞ্চলার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। ইতি প্রস্তাবনা।

লক্ষ্মী—(বিষ্ণুর গায়ে ধাক্কা দিয়া) ও গো, ও ঠাকুর, ঠাকুর ঠাকুর —(বিষ্ণুর গম্ভীর নাসিকা-গর্জন)। ওঠ ঠাকুর, স্তোত্র পাঠ কচ্চি ওঠ। মধুমুরনরকবিনাশন—নাঃ হুঁস্ই নেই। রমানাথ! লক্ষ্মীপতি! এ কি বেজায় ঘুম! একটু পায়ে সুস্সুড়ি দিয়ে দেখি—ও ঠাকুর, ওঠ, সুধাপান কর।

বিষ্ণু—আঃ বড্ড জ্বালাচ্চে; দু'শ বছরও পুরো নয়, এরি মধ্যে কাঁচা ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলে! দাও, চোখ বুঁজেই একটু সুধা পান করি। (তথাকরণ)।

লক্ষ্মী—দু'শ বছর ছেড়ে তুমি দু'হাজার বছর ধরে ঘুমোও; কিন্তু ঠাকুর বড় বিপদ, একবার ওঠ।

বিষ্ণু—মেয়ে মানুষের ওই দোষ; কেবল ভূমিকা। চট্ করে বলে ফেল না কি হয়েছে।

লক্ষ্মী—একবার চোখ মেলে চেয়ে দেখ—

বিষ্ণু—বলি, আগে ত কান পেতে শুনি।

লক্ষ্মী—শুনলে হ'বে না, দেখতে হবে।

বিষ্ণু—ঘুম ভাঙাবার ফিকির দেখ! আমি তাকিয়ে তোমার রূপ দেখলেই হয়েছে আর কি! লক্ষ্মীটি, বলে ফেল, শুনছি।

(সহসা দূরে চড়্ চড়্ শব্দ)

লক্ষ্মী—ওই ঠাকুর, গেল গেল সব গেল! বাংলা দেশটা ফেটে দু'খানা হয়ে গেল!

বিষ্ণু—আঃ বেজায় বদখৎ আওয়াজ। সরস্বতীকে একটুখানি বীণা বাজাতে বল ত!

লক্ষ্মী—হায় ঠাকুর, সে কি আর আছে! একবারও ঘর-সংসারের খবর নেবে না, কেবলই ঘুমুবে।

বিষ্ণু—সে কি, সরস্বতী নেই কিরকম?

লক্ষ্মী—একটা দৈত্য তাকে টপ্ ক'রে গিলে ফেলেছে—

বিষ্ণু—দৈত্য, দৈত্য! তাই ত! নামটা কি?

লক্ষ্মী—উনিবরষটি একৃট্!

বিষ্ণু—নামটা বেজায় কটমটে! নারদকে খবর দাও ত, পুরাণ খুলে দেখুক, এটা আবার কোন্ অসুর!

লক্ষ্মী—একি তোমার প্রত্নতত্ত্বের সময় হল? একবার ওঠ ঠাকুর,—মধুমরনরকবিনাশন, —

বিষ্ণু—এ নূতন দৈত্যটার নামে কিন্তু এমন মিঠে কবিতা রচনা হয় না। শব্দটার ট-বর্গ আর—

লক্ষ্মী—এবার ধল্‌লে অলংকার শাস্ত্র! হা কপাল!

বিষ্ণু—অলংকারের মায়া কাটিয়েছ না কি? তাই বাংলা দেশের উপর এতটা মমতা বটে? তারা তোমার পূজা বন্ধ করে দিলে, অর্দ্ধনগ্না বর্বর-রমণী বলে অপমান কল্লে; তার উপর আবার সেই গাউন-পরা মেঞ্চেষ্টার-নন্দিনীকে তোমার আসনে বসিয়ে দিলে, এখন সেই দেশের উপর এত মমতা!

লক্ষ্মী—তাই ত বলছিলাম ঠাকুর, একবার তাকিয়ে দেখ; কি ছিল, কি হয়েছে! গয়াসুর মাথা তুললেও এমন হয় না! (একটু ক্রন্দন) হাজার হোক্ ওরা আমারি পেটের ছেলে। একদিন অপমান করেছিল বটে, আবার আমার পায়ে ফুলচন্দন দিচ্চে।

বিষ্ণু—সেই সুসভ্য পোষাক-পরা বিলাতী-সুন্দরীকে তাড়িয়ে?

লক্ষ্মী—তবে আর বল্‌ছি কি ঠাকুর।

বিষ্ণু—একেই বলে মেয়ে মানুষ। এই অভিমান এই অনুরাগ! সাধে তোমাকে লোকে চঞ্চলা বলে। ফের দেখবে দু'মাস না যেতে যেতেই বাঙালীরা ও মাগীর কুহকে পড়বে। রাক্ষসী কত মায়া জানে। কখনো ধম্‌কাবে, কখনো আদর করবে। তারপর তোমার ঐ জলা দেশের ছেলেগুলো! ওদের যত মিষ্টি কথা সব কবিতায়। মাতৃভক্তি ওদের বক্তৃতার সামগ্রী।

(নেপথ্যে—"বন্দেমাতরম্")

লক্ষ্মী—মন যে বড় চঞ্চল হচ্ছে, আমি যাই!

বিষ্ণু—যেও না। সরস্বতীকে গিলে খেয়েছে; তোমাকে জেলে দেবে। শুনতে পাচ্চ না, যে ঐ "বন্দেমাতরং" বড় চড়া সুরে ধরেছে, অল্পেই গলা ভেঙে আসবে, তখন আবার পুনর্মূষিক হয়ে পড়বে। আমি চোখ বুঁজে আছি বলে আওয়াজটা ঠিক বুঝতে পাচ্চি। আমার কথা শোনো—৫/৬ মাস পরীক্ষা ক'রে দেখ যে সত্যি-সত্যিই ওরা মলিন-বসনা মার প্রতি ভক্তিমান হয়েছে কি না।

লক্ষ্মী—যে আজ্ঞে ঠাকুর।

(বিষ্ণুর পদসেবায় প্রবৃত্তা)

[বিষ্ণুর পার্শ্ব-পরিবর্তন ও নিদ্রা।]

বিজয়চন্দ্রের 'প্রার্থনা' ও 'নবজীবন' কবিতা দুটিও তাঁর কোন গ্রন্থে স্থান পায় নি। কবির উদ্দীপ্ত স্বদেশ-প্রীতির পরিচয় দুটি কবিতার মধ্যেই সুস্পষ্ট।

দেবী,

জীবন তুচ্ছ করিতে শিখাও, জীবন করিব ধন্য
সকলের আগে সেবিতে চরণ
সকলের আগে লভিতে মরণ
সেবকবর্গ মাঝারে আমারে কর গো অগ্রগণ্য।
জয়-পরাজয় মান-অপমান
না গণিয়া মনে হব আগুয়ান ;
অরির প্রহারে বক্ষেতে ক্ষত লভিব তোমারি জন্য।
শুনি, পুরাকালে হইল যখনি
বীরের শোণিতে সিক্ত অবনী,
কে পারে গণিতে—সে শোণিতে কত জনমিল বীর সৈন্য।
আজিকে আমার রুধিরধারায়—
তোমার চরণতলের ধরায়
দেখি জাগে কিনা, লভিয়া শক্তি নবীন ভক্ত অন্য।

('প্রার্থনা'—১ম ও ২য় স্তবক)

আসিয়াছি আমি জাগিয়া প্রভাতে
প্রবেশিতে নব জগত-সভাতে,
শুভ্র পুণ্য- বসন অঙ্গে
পরিয়ে দে মা।
করিয়ে আশিস্ শিরে উষ্ণীষ
জড়িয়ে দে মা।

কর্মের পথ রুধিয়া আমার
দাঁড়ায়ে উচ্চ জড়তা-পাহাড়,
ঠেলিয়া চরণে সে বাধা ভীষণ
সরিয়ে দে মা,
আছে তার পরে নিরাশা-সাগর
তরিয়ে দে মা।
সময়ের পথে হইব যাত্রী,
দেহ গো শস্ত্র জগত-ধাত্রী ;
প্রীতির ধর্মে অটুট বর্ম
গড়িয়ে দে মা,
তূণেতে আমার শর সাধনার
ভরিয়ে দে মা।
('নব জীবন'—সম্পূর্ণ)

শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯) : দেশের দরিদ্র শ্রমজীবীদের অবস্থার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি যদি সম্ভব করে তোলা না যায় তাহলে জাতীয় জাগরণের ক্ষেত্রে শক্তিমান মস্তিষ্কের সৃষ্টি-ধর্মী ক্রিয়াশীলতাও সার্থক হয়ে উঠতে পারে না। এ সত্যের প্রকৃত উপলব্ধির প্রথম পরিচয় বোধ হয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর লেখাতেই পাওয়া যায়। তাঁর রচনাতে শ্রমজীবীদের প্রতি শুধু যে একটা আন্তরিক দরদ প্রকাশ পেয়েছে তাই নয়, তাদের দুর্দশা দূর করার উপায় সম্বন্ধে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়ও সুস্পষ্ট। ভারতীতে প্রকাশিত তাঁর একটি প্রবন্ধের কথা আমরা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করব। 'অনুকরণ ও অনুসরণ' শীর্ষক এই প্রবন্ধটিতে (কার্তিক, ১৩১১) লেখক এই কাজ দুটির প্রকৃত মূল্য নিরূপণ করতে চেষ্টা করেছেন। লেখাটি পরে তাঁর কোন গ্রন্থে স্থান পায় নি। অবশ্য অনুকরণ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের লেখাই শ্রেষ্ঠ। সেকথা অন্যত্র আলোচিত হয়েছে। এখানে শ্রমজীবীদের অবস্থা সম্বন্ধে শিবনাথ শাস্ত্রীর বক্তব্য তাঁর প্রবন্ধটি থেকে উদ্ধার করে দিলাম।

…একটা বিষয়ে আমাদের এইরূপ অপর জাতিদিগের অনুসরণ করা আবশ্যক হইয়াছে। সেটি বর্তমান শ্রমীবৃন্দের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার। মাস্

এডুকেশন্, মাস্ এডুকেশন্ বলিয়া মধ্যে মধ্যে এক একবার চীৎকার শুনিতে পাই, কিন্তু প্রকৃত কথা এই—এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট বা দেশের লোক কাহারও প্রকৃত অনুরাগ বা আগ্রহ নাই।…

দারিদ্র্যের তাড়নায় প্রজাবৃন্দ বৃকতাড়িত মেষযূথের ন্যায়! জ্ঞানালোক নাই, উদ্ভাবনী শক্তি নাই, ফলাফল ভাবিবার সামর্থ্য নাই; হাতের কাছে যে দ্বার খোলা পাইতেছে, তাহাতেই মাথা ঢুকাইবার চেষ্টা পাইতেছে, এবং তাড়া খাইয়া ঘরে আসিয়া অনাহারে থাকিতেছে। প্রজাসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার ভিন্ন এ অবস্থা কখনই অপনীত হইবে না।

কূপমণ্ডুকতা ত্যাগ করে জগতের সঙ্গে তাল রেখে এগোতে গেলে যে উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোধর্মের প্রয়োজন তা মানুষ লাভ করতে পারে একমাত্র প্রকৃত শিক্ষার মধ্যে দিয়ে। সেই শিক্ষাই যদি দেশবাসী না পায় তবে তারা "Survival of the unfittest-এর দৃষ্টান্ত স্বরূপ জগতে থাকিবে।"

অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯)ঃ বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রহসন রচয়িতা এবং অভিনেতা হিসাবে অমৃতলাল বসুর পরিচয় সর্বজনবিদিত। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের সময় তিনি যে প্রকৃত স্বদেশসেবী হিসাবে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন এ কথা আজ হয়তো অনেকেরই মনে নেই। সে সময়ে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তিনি কিছুদিনের জন্যে দেশের কাজে মেতে উঠেছিলেন। "ওরা জোর করে দেয় দিক-না বঙ্গ বলিদান"—গানটি সেই সময়ের রচনা। সমসাময়িক চিত্রনাট্য 'সাবাস বাঙালী'-র (১৩১২) মধ্যেও তাঁর স্বদেশ-প্রীতির পরিচয় সুস্পষ্ট। অমৃতলালের অনেক রচনা এখনো বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠাতে ছড়িয়ে আছে। একটি চমৎকার ব্যঙ্গ-কবিতা ভারতীর পৃষ্ঠা থেকে এখানে উদ্ধৃত হল। কবিতাটির নাম 'প্রোক্লামেশন্'[১৫] (জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২)। ইংরেজ-সরকারের ব্যবহার ও তার অপশাসনের রূপটিকে কবিতায় এমন সরসভাবে ফুটিয়ে তোলার পরিচয় তখনকার অন্য কারো লেখায় বিশেষ পাওয়া যায় নি।

বিনয়ে শুধাও গিয়া সিংহাসন তলে।
মহাসভা-সভ্য সেই ইংরাজের দলে॥

১৫ ১৩১৩ সালে বসুমতী অফিস হতে প্রকাশিত 'অমৃত-গ্রন্থাবলী'র ১ম খণ্ডে কবিতাটি সংকলিত হয়েছিল।

প্রথমে বলেন রাণী যে-সব বচন।
সম্রাজ্ঞী রূপেতে পরে করান স্মরণ॥
স্ব-পুত্র সম্রাট হ'য়ে দিয়াছেন রায়।
অক্ষরে অক্ষরে যাহা রহিবে বজায়॥
সেই সব বচনের প্রকৃত কি অর্থ।
হ'বে কি রক্ষিত তাহা কখনো যথার্থ॥
মেনে লব রাজ-বাক্য জ্ঞান করি বেদ।
শ্বেত কৃষ্ণে কিছুমাত্র রবে না প্রভেদ॥
বাজার গরম এই চাকরীর হাটে।
কোরা কালো ব'সে যাবে ধলো গোরা-পাটে॥
করিয়া গোরার কাজ কালোর বেতন।
হ'বে কি কখনো ঠিক গোরার মতন॥
মিষ্টার ফুলার যদি বধে কেষ্টা কুলি।
সত্য কি মরিবে গোরা ফাঁসী-কাষ্ঠে ঝুলি॥
কেষ্টার ঘুষির বৃষ্টি নাশিলে ফ্লার।
হ'বে কি সিদ্ধান্ত পিলে ফেটেছিল তার॥
জিজ্ঞাসা করিও ভাল ক'রে কসামাজা।
ইংরাজ-বণিক ছাড়া আর কে কে রাজা॥
মাঞ্চেষ্টার যদি হয় কেষ্টারে বিরূপ।
ভূপের ব্যবস্থা তাতে হইবে কিরূপ॥
মরে যদি কেষ্টা তাঁতি ক'রে কুলিগিরি।
তার পুত্র স্বত্র-কর্ম পাবে কি গো ফিরি॥
দুর্ভিক্ষ যদ্যপি দেশে ব্যাড়ে ব্যাড়াজাল।
তবু কি রপ্তানি বন্ধ হবে কভু চাল।
অতি কচি ছেলেদের লুটিতে পকেট।
কতদিনে হ'বে বন্ধ আসা সিগারেট॥
কেবল পকেট নয় ইঁচড়ে বখাট।
দোকানে কোকেন চলে শীঘ্র আনে খাট॥

মরিলে কলুর কলু কেরোসিন তেলে।
কলুনীর চুলো কি গো রাজা দেবে জেলে॥
কখনো দেবে না হাত ধর্ম্মেতে প্রজার।
এ কেমন কথা শুনি মুখেতে রাজার॥
অত্যাচার করিবে না যদি অর্থ হয়।
জিজ্ঞাসিও সে কথা কি বেশী অতিশয়॥
"ডিফেন্ডার অফ্ দি ফেথ্" যাহার উপাধি
কোন্ লাজে সে হইবে ধর্ম্মেতে বিবাদী॥
খৃষ্টানের মত পার্শী হিন্দু মুসলমান।
পাবে কি রাজার দ্বারে টান দান মান॥
ব্রহ্মহত্যা হয় যদি চীনের ক্যাণ্টনে।
যাবে কি শাসিতে চীনে গোরার পল্টনে॥
জাতি ধর্ম্ম বর্ণ ভেদ না করি বিচার।
বিদ্যার কৌশলে পদ বাড়িবে প্রজার॥
বহুদিন হ'তে মনে আছে এক ধাঁধাঁ।
এ কথাটি কে কাহারে বলিতেছে দাদা॥
ইংরাজ জাতির ভাব,—ভূ-পালের ভাষ।
অমৃত-সমান কথা শুনে হিন্দু-দাস॥
এ বর্ণের অর্থ কি গো নহে চতুর্ব্বর্ণ।
যাদের পৈতৃক সত্ত্বে নাহি দিবে কর্ণ॥
"কাষ্ট্ ক্রিড্ কলারের" এইরূপ মানে।
এক বোকা করিয়াছে খামকা এখানে॥
মহা সভা সভ্যদলে বোলো ভাল করে।
বোকার বোকাত্ব যেন কার্য্যে দেন ধরে॥
আরো নানা কথা আছে সেই ঘোষণায়।
তন্নতন্ন মানে বুঝে এস সমুদায়॥
তাৎপর্য্যটি একবার হয়ে গেলে ধার্য্য।
কোন কার্য্যে ভবিষ্যতে হ'বে না আশ্চর্য্য॥

"রাইট্ রাইট্" ব'লে না ক'রে চিৎকার।
মর্মে মর্মে কৃষ্ণচর্মে দানিব ধিৎকার॥
হিন্দুর চক্ষেতে রাজা দেব-শক্তি-ময়।
মারো কাটো ভালবাস তবু গাব জয়॥

রাধাকান্ত বসু ঃ রাধাকান্তের সাহিত্যিক পরিচয় বিশেষ না থাকলেও রচনাভঙ্গি সুন্দর ও সরস। ১৩১০ সালের পৌষ মাসের ভারতীতে 'কার্তিকেয়ের বক্তৃতা' নামে রাধাকান্তের একটি চমৎকার ব্যঙ্গ-রচনা প্রকাশিত হয়। একদিন স্বর্গে পরীক্ষিৎ জনমেজয়ের হাতে জীর্ণ পুঁথির বদলে একটা সুন্দর কাগজ দেখলেন। প্রশ্ন করে জানলেন সেটা "স্বর্গস্থিত জনৈক মানব-সম্পাদিত 'দৈববার্তা' নামক সংবাদ-পত্র"। মর্ত ভ্রমণ সম্বন্ধে শ্রীমান কার্তিকেয় স্বর্গের 'দেব হলে' যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন এই কাগজে সেটা ছাপা হয়েছে। পরীক্ষিতের অনুরোধে জনমেজয় সেটা আবার গোড়া থেকে পড়তে সুরু করলেন। শ্রীমান কার্তিকেয়ের বক্তৃতা শোনার জন্যে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর থেকে আরম্ভ করে স্বর্গত মধুসূদন, ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিম, রাণাড়ে প্রভৃতি সকলেই সমবেত হয়েছেন। সভাপতি ব্রহ্মার অনুরোধে শ্রীমান কার্তিকেয় তাঁর বক্তৃতা সুরু করলেন। কি ভাবে তিনি স্বর্গ হতে ঝাঁপ দিয়ে ইডেন্ গার্ডেনে এসে পড়লেন এবং কি ভাবে নানা অভিজ্ঞতা অর্জন করলেন সে সব কথা বলে তিনি সাহেব এবং বাবুদের প্রসঙ্গ তুললেন। এমন সময়—

একজন দেবতা উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহাশয়, ভূমণ্ডলে 'সাহেব' বা কে এবং 'বাবু' বা কে ? ইঁহাদের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধই-বা কি ?'

শ্রীমান কার্তিকেয় উত্তর করিলেন, 'সাহেব এবং বাবু উভয়েই দুইটি ভিন্ন জাতি। সাহেব হইলেন রাজা, বাবু হইলেন প্রজা। বাবু হইলেন খাদ্য, সাহেব হইলেন খাদক। সাহেবেরা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ব্যতীত সমস্ত অঙ্গই চাপা দিয়া রাখেন পাছে 'নেটিভদের' (অর্থাৎ বাবুদের) হাওয়া গায়ে লাগে। বাবুরা আমাদিগেরই মত। কিন্তু কতিপয় বাবুও সাহেব হইয়া যান, যখন তাঁহারা সাহেবদিগের দেশে একবার পদার্পণ করেন। জগতে যত স্থান আছে তন্মধ্যে ভারতভূমি অবতারের ভূমি। পূর্বে এ স্থানে মাত্র নয় জন অবতার ছিল, কিন্তু কালের ও ভারতের মৃত্তিকার কৃপায় অধুনা যে যে সাহেব এখানে পদার্পণ করেন, তিনিই এক একটি অবতার হইয়া

উঠেন, এবং একটি-না-একটি নেটিভের প্লীহা ফাটাইয়া তাহার স্বর্গের সোপান নির্মাণ করেন। ভারতবর্ষে ইহাদের ও ইহাদের শংকর বংশধর ফিরিঙ্গীদের সংখ্যা বড় ন্যূন নহে। সেই জন্য আমি এই সাহেবগণকে দশ অবতার শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে চাই। যথা—প্রথম অবতার বড়লাট, ইহার অস্ত্র মিষ্ট বাক্য, ইহার বধ্য করদ রাজা। দ্বিতীয় অবতার প্রদেশিক লাট, ইহার অস্ত্র সহানুভূতি, ইহার বধ্য প্রজাদের স্বত্ব। তৃতীয় অবতার হাইকোর্টের বড় জজ, ইহার অস্ত্র বে-আইন, ইহার বধ্য নেটিভ হিতৈষী জজ্। চতুর্থ অবতার মিউনিসিপালিটির বড় কর্তা, ইহার অস্ত্র বাই-ল, ইহার বধ্য করদাতারা। পঞ্চম অবতার জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্, ইহার অস্ত্র পুলিশ, ইহার বধ্য জমীদার, দোষী নির্দোষ প্রভৃতি জেলার সমস্ত লোক। (ইনি পূর্ণাবতার !)। ষষ্ঠ অবতার বণিক সভার কর্তা সাহেব, ইহার অস্ত্র বাণিজ্য, ইহার বধ্য বেচারা বড়লাটটি (প্রথম অবতার) পর্যন্ত। সপ্তম অবতার চা-কর, ইহার অস্ত্র প্রলোভন, ইহার বধ্য কুলি রমণী ও পুরুষ। অষ্টম অবতার গোরা সৈন্য, ইহার অস্ত্র সবুট পদাঘাত, ইহার বধ্য পাখা টানা কুলি। নবম অবতার বড় দোকানদার, ইহার অস্ত্র বিজ্ঞাপন, ইহার বধ্য ধনী বাবু; এবং দশম অবতার কাগজের সম্পাদক, ইহার অস্ত্র প্রবল আড়ম্বর, ইহার বধ্য নেটিভ কাগজগুলা এবং খোদ গবরমেণ্ট।

পুলিশ, গোরাসৈন্য এবং ফিরিঙ্গীদের অত্যাচারে এ দেশের নাগরিক জীবনের শান্তি, শালীনতা ও সম্মান বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। এই সময়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত নানা রচনায় শারীরিক শক্তি প্রয়োগ করেই এই অত্যাচার অবিচারের প্রতিবিধান করার পরিষ্কার নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছে। ভারতীতে প্রকাশিত এই ধরনের তিনটি রচনার নাম উল্লেখযোগ্য—রমেশচন্দ্র বসুর 'বিলাতী বুটের আত্মকাহিনী' (মাঘ ১৩০৯), সুরেশচন্দ্র চৌধুরী ও রমেশচন্দ্র বসুর 'কিঞ্চিৎ উত্তম-মধ্যম' (কার্তিক, ১৩১০) এবং হরিশচন্দ্র চক্রবর্তীর একটি কবিতা—'শ্মশান কালী' (পৌষ, ১৩১৩)। এই ধরনের রচনা থেকে গুপ্ত সমিতি-গুলি পরোক্ষভাবে যে কিছুটা প্রেরণা লাভ করেছিল তা অস্বীকার করা যায় না। সমিতিগুলির বৈপ্লবিক কর্মপন্থা পরবর্তীকালে অনেকেই সমর্থন করতে পারেন নি। তাই দেখা যায়, সরলা দেবীর পর স্বর্ণকুমারী দেবী যখন আবার ভারতীর সম্পাদকীয় দায়িত্ব গ্রহণ করলেন তখন থেকে স্বাদেশিকতা এবং ইংরেজের প্রতি আনুগত্যের ব্যাপারে ভারতীর সুর বেশ বদলে গেল।

রমেশচন্দ্র বসু : রমেশচন্দ্র বসুর 'বিলাতী বুটের আত্মকাহিনী' একটি উপভোগ্য রচনা। সাহিত্যিক হিসাবে পরিচিত না হলেও লেখায় যে তাঁর কিছুটা হাত ছিল তা এটি পড়লেই বোঝা যায়।

কলকাতার হোয়াইট্ওয়ে লেড্লার দোকানে অনেক জোড়া বিলাতী বুট এসে জড় হল। সেগুলির মধ্যে প্রায় সবই সাহেবরা কিনে নিয়ে গেল। যে ক-জোড়া বাকী ছিল সেগুলির এক জোড়া গেল এক বলিষ্ঠ বাঙালীর পায়ে। বুট জোড়া তখন লজ্জায় নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বললে, "এ দেশে এসে যদি দু'চারজন দুর্ভিক্ষ-পীড়িত জীর্ণ-শীর্ণ প্লীহারোগগ্রস্ত পাঙ্খাকুলিকে নিরপরাধে নিরাপদ স্থানে প্রেরণ করতে না পারলেম, অথবা অর্দ্ধানশন-ব্রতচারী নেটিভ্ কেরাণীকুল নিপাত ক'রে তা'দের ভবযন্ত্রণা তিরোহিত করতে না পারলেম, তবে এ ভবে এসে করলেম কি ?"

বাঙালী ভদ্রলোকটি তাঁর বাড়ীর যেখানে বুট জোড়া খুলে রাখলেন সেখানে আর একজোড়া পুরাণো ছেঁড়া বুট পড়ে ছিল। নতুন বুট তার কাছ থেকে জানতে পারল যে যাঁর পায়ে সে উঠেছে তাঁর নাম পবন, তিনি সাধারণ ভেতো বাঙালী নন; "এ বাবু সাহেবদের মতো হাঁটুতে-খাটুতে পিটুতে-ঠেঙ্গাতে বেশ দক্ষ।" পবন বাবুর পরিচয় দিতে গিয়ে পুরানো বুট তার অতীত জীবনের একটা ঘটনা নতুন বুটকে শুনিয়ে দিলে।

কন্টেম্প্ট্ অব কোর্ট অপরাধে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিচারের সময় ফুল্-বেঞ্চের শুনানীর দিন সহরের নেটিভ্রা, বিশেষ করে স্কুল-কলেজের ছেলেরা হাইকোর্টে ভিড় করে। পবন বাবুও ছিলেন তাদের মধ্যে। তিনি তখন কলেজের ছাত্র। ভিড় দেখে লোক তাড়ানোর জন্যে পুলিশকে হুকুম দেওয়া হল। "ইংরাজ রাজত্বে পুলিশ চিরকালই প্রবলের মিত্র—দুর্বলের শত্রু—গরীবের যম—ধনীর গোলাম।" তারা রুলের গুঁতো দিয়ে হুকুম তামিল করতে চেষ্টা করল। পুলিশের এই ব্যবহারে ছেলেরাও ক্ষেপে উঠল। পবন বাবুর সামনে এক ভদ্রসন্তান লাঞ্ছিত হচ্ছেন দেখে তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। তখন তিনি জিম্নাষ্টিক শিক্ষা করেন, আর 'বারের প্লে'-তে তাঁর খুব সুনাম। লোকে তাঁকে বীর পবন বল্ত। তাঁর কাছে উপযুক্ত শিক্ষা পেয়ে পুলিশ তখন আগের লোকটিকে ছেড়ে দিয়ে তাঁকেই গ্রেপ্তার করল। দ্বিরুক্তি না করে পবন বাবু চললেন তাদের সঙ্গে।

পথে যেতে যেতে গ্রেপ্তারী লোককে দু'এক ঘা রুলের গুঁতো দিয়ে পুলিশগিরি ফলানো অথবা রাস্তার লোকেদের পুলিশের প্রতাপ জানানো পুলিশের একটা স্বভাব। তারা পবনবাবুকেও রুলের গুঁতো দেবার উদ্যোগ করলে তিনি সুযোগ বুঝে দুই হাতের দুই ধাক্কায় তাদের ফেলে দিয়ে বীর দর্পে দণ্ডায়মান হ'লেন। তা' দেখে একজন সাহেব কনেষ্টবল্ দৌড়ে এসে চাবুক তুলে তাঁ'কে মারতে উদ্যত হ'লে পবনবাবু জিম্‌নাষ্টিকের কৌশল ধরে 'সমারসল্ট্' খেয়ে সাহেব কনেষ্টবল্‌কে জোড়া পায়ে ক্যাঁৎ ক'রে সবুট আঘাতে তা'র গর্বোন্নত বক্ষের ভার-সহত্বের পরীক্ষা করলেন! বুঝতেই পারছ আমি তখন তাঁর পায়ে, সুতরাং আমিও অনিচ্ছায় সশরীরে সজোরে সাহেব পুঙ্গবের বুকে গিয়ে পড়লাম। আহা, কি দুর্দৈব ঘটনা! সাহেব পুঙ্গব আমার পতন প্রভাব সহ্য করতে না পেরে ভিড়ের মধ্যে যেন কুরুক্ষেত্রের ঘটোৎকচের ন্যায় পড়ে গেলেন। সেই অবসরে পবনবাবু বেমালুম গা ঢাকা দিয়ে সরে পড়লেন। কিছু দূর গিয়ে একখানা গাড়ী ভাড়া ক'রে বাড়ী এলেন। সেদিন সুরেন্দ্র বাবুর কারাবাসের জন্যে তিনি যেমন বিশেষ দুঃখিত হয়েছিলেন, সাহেব সোজা ক'রে তেমনি মহা আনন্দিত হলেন। আমি কিন্তু মহা দুঃখিত। নেটিভের হাতে শ্বেতাঙ্গের নিগ্রহ দেখে আমার মনে বড় কষ্ট হ'ল। বিদেশে আমাদের ন্যায় সাহেবদের আত্মীয় অন্তরঙ্গ মিত্র আর কে আছে বল? আমি মনে ভাবলেম, 'হায়, যা'র শীল যা'র নোড়া, তারই ভাঙলেম দাঁতের গোড়া।' বিলাতী বুট হ'য়ে শেষে বিলাতী লোককে ঠেঙ্গালেম। বস্তুতঃ আমার সে দিনের সে কষ্ট আর রাখবার স্থান ছিল না। আমি দুঃখ আর মনঃকষ্টে ক্রমে ফেটে চটে গেলাম! তাই দেখে পবনবাবু আমায় বাতিল করলেন।···বোধ হয় বাঙালী কর্তৃক সাহেব সোজা করা তাঁদের জাতীয় ইতিহাসে এই প্রথম ব'লে—অথবা বাহুবলহীন ভীরু বাঙালীর পদাঘাত বলের প্রথম নিদর্শন-কীর্তির মূল আমি, এই কারণে পবনবাবু আমাকে হতাদরে 'হল্‌ওয়েল মনুমেণ্টের' মতো সদর রাস্তায় ফেলে না দিয়ে আপন কক্ষেরই এক পার্শ্বে রক্ষা করলেন।

পুরাণো বুটের কাছে পবনবাবুর পরিচয় পেয়ে নতুন বুট তখন একটু আশ্বস্ত হল। ভাবলে, তার বিলাতী বুট-জন্ম তাহলে একেবারে নিষ্ফল হবে না। সে সময়ে পথে ঘাটে এই ধরনের অন্যায় অত্যাচার এমন এক সাংঘাতিক রূপ ধারণ

করেছিল যে তার প্রতিকারের একমাত্র উপায় স্বরূপ শারীরিক শক্তি প্রয়োগ করার নির্দেশ রবীন্দ্রনাথকে পর্যন্ত দিতে হয়েছে।

'কিঞ্চিৎ উত্তম-মধ্যম (বিলাতী ঘুষি বনাম দেশী কিল)' রচনাটির নামকরণ থেকেই রচনার বিষয়-বস্তুর পরিষ্কার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। এতে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করে বাঙালীর শক্তি এবং সাহসের পরিচয় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

হরিশচন্দ্র চক্রবর্তী : স্বদেশী মোকদ্দমায় ময়মনসিংহের রাজেন্দ্রলাল সাহার কারাদণ্ড হয়। তাঁর মুক্তির দিন অনেকেই তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে জেলের ফটকের সামনে ভিড় করেন। কিশোরদের সংখ্যাই ছিল বেশী। ময়মনসিংহের পুলিশ সাহেব নিষ্ঠুরভাবে তাদের ওপর ঘোড়া চালিয়ে এবং মারধোর করে অনেক বালককে আহত করেন। এই ঘটনাটিই হরিশচন্দ্র চক্রবর্তীর 'শ্মশান কালী' কবিতাটির ভিত্তি।

আজি মাগো খুলি রাখ মণিময় হার,
গলে পর নরমুণ্ডমালা,
ভয়ংকরী নীল ঘোরা শ্যামাঙ্গিনী কালী
সাজ তুমি কপালকুণ্ডলা।
করে লহ ক্ষিপ্ত অসি ফেলে হেম বাঁশী,
দৈত্য বধি' রক্ত পান কর মাগো আসি।
শুভদে, বরদে, শ্যামা, শুভংকরী কালী
সন্তানের শিরে তুলি কলংকের ডালি,
কেমনে মা সহি' আছ এতদিন সুখে—
দানবের পদাঘাত শত শেল বুকে ?
তুচ্ছ মোর এ শোণিত দিতেছি হে ঢালি'
আজি মাগো সাজ তুমি শ্মশানের কালী।

কবি হিসাবে হরিশচন্দ্র চক্রবর্তীর পরিচয় অজ্ঞাত। তবু এখানে তাঁর কবিতাটি উদ্ধৃত করলাম এই জন্যে যে এ ধরণের উত্তেজনাপূর্ণ কবিতা ভারতীতে অল্পই প্রকাশিত হয়েছে।

স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২) : ১৩১৫ সাল থেকে স্বর্ণকুমারী আবার ভারতী সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ১৩২১ সাল পর্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে এই দায়িত্ব পালন করে তিনি মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের হাতে তা অর্পণ করেন। লেখিকা হিসাবে বাংলা সাহিত্যের আসরে তাঁর নিজস্ব একটি স্থান আছে। গল্প, উপন্যাস, কবিতা নাটক সবই তিনি রচনা করেছেন; কিন্তু প্রবন্ধ সমালোচনাতেও যে তাঁর মন্দ হাত ছিল না এই সময়কার ভারতীর পৃষ্ঠাগুলিতে তার কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।

স্বর্ণকুমারী দেবীর এই দ্বিতীয়বার ভারতী সম্পাদনার কালটি রাজনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গুপ্ত-সমিতিগুলির অসংখ্য অদৃশ্য শিকড় তখন সারা বাংলার মাটিতে ছড়িয়ে পড়েছে; আর সেই শিকড়গুলিকে উৎখাত করার জন্যে চলেছে সরকারী দমননীতির পৈশাচিক নির্মমতা। স্বদেশী ডাকাতি, হত্যা, ধর-পাকড়, দণ্ড-নির্বাসন এবং ফাঁসি বাঙালীর নিরীহ স্বাভাবিক জীবনযাত্রার রূপটিকে চূর্ণ করে দিয়েছে। কতকগুলি পত্রিকা তখন রাজনীতির ক্ষেত্রে উগ্র রকমের শাক্ত মতবাদ প্রচার করতে সুরু করেছে; এগুলির মধ্যে যুগান্তর, সন্ধ্যা, বন্দেমাতরম্ এবং নিউ ইণ্ডিয়ার নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য[১৬]। সরকারী কোপে পড়ে কয়েকটি পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়, আর কয়েকটি পত্রিকা সুর বদলে অস্তিত্ব বজায় রাখে। নব্য-ভারত প্রসঙ্গে আমরা লক্ষ্য করব দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী স্বয়ং প্রথম দিকে নিহিলিজ্‌ম্-এর সমর্থক ও প্রচারক ছিলেন; কিন্তু কিছুকাল পরেই তাঁর এ মত বদলে যায় এবং তখন থেকে আবার ইংরেজ-আনুগত্যের

১৬ ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে যুগান্তর পত্রিকাটির প্রচার সংখ্যা ১৮,০০০ বৃদ্ধি পায়। এর থেকে সহজেই বোঝা যায়, বিপ্লবী কর্ম-চিন্তা তখন বাঙালীর মনকে কতখানি প্রভাবিত করেছিল, ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুনকে জ্বালিয়ে তোলার জন্যে এই পত্রিকাটি সশস্ত্র গণ-অভ্যুত্থানের আদর্শ ও কর্ম-পদ্ধতি প্রচার করত। সন্ধ্যা ছিল এ ব্যাপারে তার সহযোগী; এবং এই উদ্দেশ্যে লুণ্ঠন ও ডাকাতির জন্যে বিপ্লবীদের স্পষ্ট নির্দেশ দিত। এই প্রসঙ্গে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই আগষ্টের যুগান্তরে সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত হয় :

"দেশের মধ্যেই অস্ত্র আছে, তাহা সহজেই পাওয়া যায়, আর বোমা তৈরীর ব্যবস্থা তো আছেই। কিন্তু এই সম্পর্কে সম্পূর্ণ গোপনতা অবলম্বন করিতে হইবে।" দ্রষ্টব্য—'ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস'—সুপ্রকাশ রায়। পৃ—১০১।

সুরই তাঁর লেখায় প্রাধান্য পায়। এই সুর-পরিবর্তনের কারণ সম্বন্ধে পূর্ব-প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। আবার কোন কোন পত্রিকা শাক্ত মত প্রচার করলেও সন্ত্রাসবাদকে গোড়া থেকেই সমর্থন করে নি। বিদেশী ঘুষির বদলে দেশী কিল দেবার নির্দেশ দিলেও কোন বৈপ্লবিক দল গঠন তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। ভারতী এই জাতীয় পত্রিকা। তাই দেখা যায় দেশে যখন বৈপ্লবিক অরাজকতা দেখা দিল, তখন ভারতীর কাছে তা শক্তির অর্থহীন অপচয় বলেই মনে হল। স্বর্ণকুমারীর দ্বিতীয়বার সম্পাদনাকালের সুরু থেকেই ভারতীর এই সুর-পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য করি। ইংরেজ-রাজের অবসান ঘটানোর কল্পনা বাতুলতা বলে উল্লেখ করা হয় এবং ইংরেজের অনুগত হয়েই যে আমরা সুখ-শান্তির অধিকারী হতে পারব এ কথাও আবার নতুন করে প্রচার করা হয়। অবশ্য ইংরেজ-সরকারের অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে স্পষ্ট কথাও কিছু কিছু প্রকাশিত হয়েছে এবং ভ্রান্ত বলে উল্লেখ করলেও কোন কোন বিপ্লবীর দেশের জন্য আত্মদানের মহত্ত্বকে অভিনন্দিত করা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে স্বর্ণকুমারীর তিনটি প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য—'লর্ড কার্জন ও বর্তমান অরাজকতা' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৫), 'আমাদের কর্তব্য' (ভাদ্র, ১৩১৫) এবং 'কর্তব্য কোন্ পথে ?' (পৌষ, ১৩১৫)।

'লর্ড কার্জন ও বর্তমান অরাজকতা' প্রবন্ধে কাজনের শাসন-কালে দেশে অরাজকতার কারণগুলি অনুসন্ধান করতে গিয়ে লেখিকা বরিশাল কন্‌ফারেন্সের কথা উল্লেখ করে লিখেছেন—

> ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে লর্ড কার্জন চলিয়া গেলেন, কিন্তু তাঁহার রাজনীতি ভারতে স্থায়ী হইয়া গেল। তাহার ফলে দেশের অসন্তুষ্টি, স্বদেশী আন্দোলন, ছাত্রগণের পথেঘাটে বন্দেমাতরম্ মন্ত্রোচ্চারণ বাড়িতে লাগিল। গভর্ণমেণ্ট ইহাতে ভীত হইলেন। শাসনকারী ও শাসিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে প্রকৃত পরিচয় থাকিলে গভর্ণমেণ্টের এরূপ ভয়ের সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু তাঁহারা দেশের অবস্থা, দেশের লোককে প্রকৃত ভাবে জানেন না। অতএব এদেশের সহিত পাশ্চাত্ত্য দেশের তুলনা করিয়া বন্দেমাতরম্ উচ্চারণকারী-দিগকে সামান্য অপরাধে গুরুদণ্ড দিতে লাগিলেন। বালকের কার্যে কারণে-অকারণে তাঁহারা বৃদ্ধের কার্যগুরুত্ব অর্পণ করিয়া বিষম শাসন আরম্ভ করিলেন। বিষময় ফল ফলিল। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে বৈশাখ মাসে বরিশাল কন্‌ফারেন্স

> পুলিশের অন্যায় বাধাতে বন্ধ হইয়া গেল। নিরস্ত্র বালকগণ পুলিশের ভীষণ লগুড়াঘাতে ক্ষত-বিক্ষত রক্তাক্ত হইয়া উঠিল। সেই সময়ে সেই অন্যায় পীড়নে একান্ত পীড়িত হইয়া বালক মনোমোহন সর্বান্তঃকরণে অভিশাপ দিয়াছিল, গভর্ণমেণ্ট অন্যায় করিয়া আজ যে রক্তপাত করিলেন, এই রক্ত আমার ভবিষ্যৎ ভ্রাতৃগণের দেহে একদিন প্রবল শক্তিতে সঞ্চারিত হইয়া উঠিবে।
>
> তখন একথা পীড়িতের আর্তনাদ, পাগলের প্রলাপোক্তি বলিয়া মনে হইয়াছিল। কিন্তু আজ দেখিতেছি এইরূপ অত্যাচার অবিচার শান্তিপ্রিয় ধর্ম-ভীরু বঙ্গবালকগণকেও পাশ্চাত্ত্য অরাজকতার মন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছে। বাহু-বলহীন পাঠানুরাগী, নিরীহ রাজভক্ত জাতিকেও জঘন্য বিদ্রোহিতা পাপে লিপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। ইংরাজ শাসন যে আমাদের পক্ষে প্রকৃত মঙ্গলকর, ইংরাজ রাজ্যলোপ কল্পনা করাও যে আমাদের পক্ষে অহিতজনক, এই ক্ষণিক অত্যাচারে তাহা পর্যন্ত ভুলিয়া গিয়া অবোধ বালকগণ হত্যারূপ পাপকার্য দ্বারা নিজের ও দেশের সর্বনাশ করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। হায়! ইহা অপেক্ষা দেশের শোচনীয় অবস্থা আর কি হইতে পারে!

শান্তিপ্রিয় বাঙালী বালকেরা যে পাশ্চাত্ত্য অরাজকতার মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছে তার মূল কারণ যে সরকারী দমন-নীতি ও অবিচার এ-কথা লেখিকা পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ করলেও তিনি বাঙালী বালকদের এই 'পাপকার্যকে' সমর্থন করতে পারেন নি ; এই প্রসঙ্গে তাঁর ইংরেজ-আনুগত্যের সুরটিও লক্ষণীয়।

'আমাদের কর্তব্য' প্রবন্ধেও স্বর্ণকুমারী স্পষ্ট ভাষায় সন্ত্রাসবাদের নিন্দা করেছেন। তাঁর মতে, দেশকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলার একমাত্র উপায় হল বিদেশী দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশী শিল্পের প্রসার ও উন্নতি সাধন। 'কর্তব্য কোন্ পথে' প্রবন্ধে স্বর্ণকুমারীর ইংরাজ-আনুগত্যের ভাবটি সবচেয়ে বেশি প্রকট ; এবং এই আনুগত্য দেখানর পক্ষে তিনি যে যুক্তি দিয়েছেন তা অত্যন্ত দুর্বল। তিনি লিখেছেন,

> অন্ততঃ ইহা সুস্পষ্ট যে উক্তরূপ মারকাট সংকল্পে রাজপক্ষের ক্ষতি অপেক্ষা প্রজাপক্ষের ক্ষতি শত-সহস্রগুণে অধিক। ইংরাজ যদি আজ প্রজা-দমন অভিপ্রায়ে তোপের মুখে সমস্ত ভারতবাসীকে উড়াইয়া দিতে চায়—আমাদের এমন সাধ্য নাই যে আমরা তাহা প্রতিরোধ করি।...বস্তুতঃ

তাঁহাদের অনুগ্রহের উপর, ন্যায় বিচারের উপরই আমাদের একান্ত ভরসা।
এ সত্য মিথ্যা বলিয়া কল্পনা করিলে চলিবে না।

ভারতবাসী যত দুর্বলই হোক, আর ইংরেজ যত শক্তিশালীই হোক তোপের মুখে এতবড় একটা দেশের সমস্ত অধিবাসীকে উড়িয়ে দিতে চাওয়াটা যে একটা অসম্ভব কল্পনামাত্র সন্ত্রাসবাদীদের কাজের সমালোচনা করতে গিয়ে লেখিকা তা চিন্তা করতে পারেন নি।

অনুপমা দেবী (১৮৮৩-১৯৫১) ঃ বাংলা সাহিত্য-ক্ষেত্রে নিরুপমা দেবী নামেই ইনি বিখ্যাত। 'গুরুদক্ষিণা' (অগ্রহায়ণ, ১৩১৫) গল্পটি ছাড়া স্বদেশী আন্দোলন নিয়ে ভারতীতে এঁর আর কোন গল্প প্রকাশিত হয় নি। উপন্যাস রচনায় কৃতিত্ব দেখালেও গল্প রচনায় এঁর তেমন হাত ছিল না। এই গল্পটিতে শান্তি এবং অহিংসার মাধ্যমে স্বদেশী শিল্প প্রচারের আদর্শকেই তুলে ধরা হয়েছে।

ছদ্মনামে প্রকাশিত কয়েকটি রচনা ঃ স্বদেশী আন্দোলনের সময় ভারতীতে ছদ্মনামে কয়েকটি রচনা প্রকাশিত হয়। সেগুলির মধ্যে—শ্রীঅহিফেনানন্দের 'যক্ষ-যুধিষ্ঠির সংবাদ' (আশ্বিন, ১৩১২), জ্যাঠার 'খেয়াল' (আশ্বিন, ১৩১২), শ্রীপাগলের 'মানুষ বলীবর্দ' এবং 'ফুলার চাঁদ' (আষাঢ়, ১৩১৩) এবং শ্রীস্বদেশীর 'ফুলার বস্তি' (আষাঢ়, ১৩১৩) উল্লেখযোগ্য। লেখাগুলি 'খেয়াল-খাতা' বিভাগের অন্তর্গত।

বাঙালীর সঙ্গে ইংরেজের সম্পর্কটা ক্রমশ কি জাতীয় হয়ে উঠেছে এবং বাঙালী যে সে সম্বন্ধে বেশ সচেতন এই তথ্যটাই চমৎকার রসিকতার মধ্যে দিয়ে জ্যাঠা প্রকাশ করেছেন তাঁর 'খেয়াল' নামক রচনায়। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালীর চিত্তে এই ধরণের সচেতনতার পরিচয় অবশ্য উনিশ শতকের শেষের দিক থেকেই বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এখানে শুধু তাঁর রচনাটি থেকেই কিছুটা অংশ উদ্ধৃত হল।

পূর্বেই বলিয়াছি, বাঙালী জ্যাঠা হইয়া গিয়াছে। জ্যাঠা বাংলা সোজা চক্ষে কাহারও প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে না। সরল ভাবে, উদার ভাবে কোন একটা জিনিষের সমালোচনা করিতে পারিবে না। তাহার কারণ

হইতেছে জ্যাঠা হইলে বুড়া হয়, বুড়া হইলে দূর-দৃষ্টি (long sight) হয়, কাছের সামগ্রীটা তাহারা চক্ষে দেখিবে না—এইটে আমাদিগের দাদার কথা।

দাদা আসিয়া বলিলেন—ভাই! তোমাদের আমি প্রাণের অধিক ভালবাসি। জ্যাঠা উত্তর দিল—কোঁকর্ কোঁ,—আমাদিগের মৌলভি-দাদা আসিয়াছেন। জ্যাঠা একটা গাহিয়া উঠিল—'নাথ! তোমার সে ভালবাসা, মৌলভি-দাদার—পোষা।'

দাদা বলিলেন,—মিথ্যার জন্য প্রাচ্যজাতি চির-প্রসিদ্ধ। জ্যাঠার চক্ষু প্রাচ্য ছাড়িয়া পাশ্চাত্ত্যে চলিয়া গেল,—কেন-না নিকটে তো দেখিতে পাইবে না,—দেখিল, পাশ্চাত্ত্য নীতিরূপ তক্র-সমুদ্রে সত্য-মৎস্য খাবি খাইয়া বেড়াইতেছে, আর লণ্ডনের ইষ্ট-এণ্ড হইতে ওয়েষ্ট-মিনিষ্টারের চূড়া পর্যন্ত সর্বস্থানে বসিয়া সত্যবানগণ সেই মৎস্যটিকে ধরিয়া তাহার মস্তক উদরস্থ করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

...আসল কথা, জ্যাঠা ভ্রাতুষ্পুত্রের ভাল্‌বাসা-আলিঙ্গনটি একদিনও সুবিধার চক্ষে দেখিতে পাইলেন না। নিরুপায়ে দাদার ভালবাসা অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই ভালবাসা-ভ্রমর-তাড়িত দাদা সাগরতীর হইতে হিমালয়ের প্রান্তদেশ পর্যন্ত নৃত্য করিতে করিতে প্রেমবিহ্বল চিত্তে বলিতেছেন—আহা, জ্যেষ্ঠতাত! আমার ঠাকৃরুণদিদির কি সুকোমল সুশ্যামল অঙ্গ! জ্যাঠা হরি স্মরণ করিতে করিতে চক্ষু কপালে তুলিলেন।

অন্যান্য কয়েকজন লেখক: এই সময় ভারতীতে আরও অনেকের স্বাদেশিকতামূলক রচনা প্রকাশিত হয়। যেমন, প্রবন্ধ—শ্রীশচন্দ্র সেনের 'আমাদের বর্তমান কর্তব্য' (ফাল্গুন, ১৩০৯), বিপিনচন্দ্র পালের 'আবেদন ও আন্দোলন' (ফাল্গুন, ১৩১৩), ভূতনাথ ভাদুড়ীর 'শব-সাধন' (কার্তিক, ১৩১৩), গিরিজাভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের 'স্বদেশী-প্রসঙ্গ' (অগ্রহায়ণ, ১৩১৩) ও 'স্বরাজ-সমস্যা' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪) এবং অরবিন্দ ঘোষের 'কারাগৃহ ও স্বাধীনতা' (আষাঢ়, ১৩১৬); কবিতা—গঙ্গাচরণ দাশগুপ্তের 'মাতৃহীনের প্রার্থনা' (কার্তিক, ১৩১০), 'মাতৃভূমির প্রতি' (আশ্বিন, ১৩১২) ও 'স্বদেশের প্রতি' (পৌষ, ১৩১২), যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর 'কুরুক্ষেত্র' (আশ্বিন, ১৩১১), মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'রাখী-বন্ধন' (কার্তিক, ১৩১২), 'ভিক্ষা' (অগ্রহায়ণ, ১৩১২) এবং 'উদ্বোধন' (পৌষ, ১৩১২)।

বিষয়-বস্তু এবং প্রকাশভঙ্গির দিক থেকে এই রচনাগুলি কোন বৈশিষ্ট্যের দাবি করতে পারে না। আন্দোলনের স্বরূপ বা দেশের সমসাময়িক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে নতুন কোন চিন্তা-ধারণার আলোকপাতও এগুলিতে লক্ষ্য করা যায় না। আলোচনার ধারাও গতানুগতিক।

কয়েকটি বিভাগ: বিভিন্ন সাময়িক প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনার জন্যে ভারতীতে তখন কয়েকটি বিভাগ ছিল। স্বদেশী আন্দোলন বা জাতীয়তাবোধ সম্পর্কে এগুলি থেকে কিছু কিছু মূল্যবান তথ্য জানা যায়।

কলকাতার গোলদীঘির সঙ্গে বাংলার সাংস্কৃতিক আর রাজনৈতিক ইতিহাসের অনেক কথা জড়িয়ে আছে। 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর সঙ্গে এই স্থানটির ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা কোন শিক্ষিত বাঙালীর কাছেই অজানা নয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক সম্বন্ধের কথাও অনেকেই জানেন। এখানে সরলা দেবীর সময়ের ভারতীর 'সাময়িক-কথা' বিভাগ থেকে (বৈশাখ, ১৩১২) একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সমসাময়িক ঘটনা। গোলদীঘিতে জাতীয় সঙ্গীত। গানটি ইংরেজীতে রচিত ; এবং, যতদূর জানা যায়, রচয়িতা হলেন টহলরাম গঙ্গারাম। ১৩১২ সালের বৈশাখ মাসে কিছুদিন ধরে প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় গানটি এখানে গাওয়া হত। প্রায় পাঁচ-ছ শ ছাত্র এই সঙ্গীতানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করত। গান গেয়ে গোলদীঘিতে গণ্ডগোল সৃষ্টি করার জন্যে টহলরামকে দুবার নাকি গুণ্ডার হাতে মার খেতে হয়, কিন্তু কিছুতেই তাঁকে নিরস্ত করা যায় নি। ভারতীর সমালোচক মন্তব্য করছেন, "আশ্চর্যের বিষয়, ইনি খৃষ্টীয় কিম্বা মুসলমান ধর্মের বিরুদ্ধে কিছুই বলেন নাই, তথাপি উক্ত সম্প্রদায়ের গুণ্ডার দল ইহাকে কেন তাড়া করিল, তাহার সদুত্তর কেহ দিতে পারিতেছেন না।" ভারতীতে ইংরেজী গানটির যে বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয় তার কিছুটা অংশ উদ্ধৃত হল।

ভারতের সন্ততিবর্গ প্রীতিতে ঐক্য
অনুভব করুন। তাঁহারা যেন
তাঁহাদের কর্তব্য পালনে শিথিল না হন।
তাঁহাদের চিত্ত জ্ঞানে উদ্ভাসিত হউক
এবং তাঁহাদের গুণরাশি উজ্জ্বল হইয়া
প্রকাশিত হউক।

যদিও ভারতবাসী নানা প্রকারে
অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছেন,
তথাপি হে তেজঃপুঞ্জ প্রভাবশালী কৃষ্ণ!
হে বরেণ্য, অসমসাহসী রামচন্দ্র!
তোমরা এই দুর্দিনে ভারতবাসীকে
ত্যাগ করিও না,
ভগবান এই নিরাশ্রয় দেশের
উপর সদয় হউন।

সে সময়ে দেশের চারিদিকে যে সমস্ত রাজনৈতিক ঘটনা ঘটত সেগুলির সমালোচনা প্রকাশিত হত ভারতীর 'রাজ্যের কথা' বিভাগে। তিলক, চিদাম্বরম্ পিল্লে, দুর্গাচরণ সান্যাল প্রভৃতির দণ্ড, আলিপুরের মামলা, হ্যারিসন্ রোডের বোমার মোকদ্দমা, নরেন্দ্র গোস্বামীর মৃত্যু, বারীন্দ্রের বিচার, কানাইলালের বিচার ও ফাঁসি, ক্ষুদিরামের ফাঁসি ইত্যাদি তখনকার চাঞ্চল্যকর অনেক ঘটনার সমালোচনা ১৩১৫ এবং ১৩১৬ সালের ভারতীর এই বিভাগটিতে প্রকাশিত হয়েছে। এই সমস্ত সমালোচনার মধ্যে একটি বিষয় লক্ষ্য করার মতো—ইংরেজ আনুগত্যের সুরটি লেখায় মাঝে মাঝে অতিরিক্ত মাত্রায় প্রাধান্য পেলেও এবং সন্ত্রাসবাদের প্রতি বিদ্বেষ-বাণী ঘোষিত হলেও সন্ত্রাসবাদীদের অনেকের মধ্যেই যে নির্ভীক নিঃস্বার্থ আত্মদানের আদর্শটি ফুটে উঠেছিল সমালোচনায় তার প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধার ভাব প্রকাশ পেয়েছে। এখানে ১৩১৫ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা থেকে কানাইলাল দত্তের ফাঁসির দিনের বর্ণনাটি উদ্ধৃত হল—

কানাইলালের ফাঁসির দিন প্রত্যূষে চারিদিকে শঙ্খ বাজিয়া উঠিয়াছিল —এবং ফাঁসির পরে মহাসমারোহে কালীঘাটে তাহার সংকার ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। সহস্র সহস্র যুবক কানাইলালের ভ্রাতার সহিত মিলিয়া ফুলশোভিত মৃতদেহ চন্দন চিতায় তুলিয়া ঘৃতাহুতিদানে দাহ করিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশ-সঙ্গীতে এবং বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে আকাশ কম্পিত হইয়া উঠিয়াছে। কেবল পুরুষ নহে তাহাকে দেখিবার জন্য বহু সম্ভ্রান্ত রমণী শ্মশানে সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহারা অশ্রুপাত করিতে করিতে তাঁহার মুখে চরণামৃত দিয়াছেন। ফুল বিক্রেতাগণ বিনামূল্যে কানাইয়ের দেহ ফুল-সজ্জিত

করিয়াছে। কালীমন্দিরের নিকট দিয়া লইয়া যাইবার সময় মন্দিরের একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আসিয়া তাহার কণ্ঠে ফুলমাল্য প্রদান করেন এবং মন্দিরে দেবীর নিকট তাহার সদ্গতি প্রার্থনায় মন্ত্র উচ্চারিত হইতে থাকে। কানাইলাল আমৃত্যু তাঁহার অবিচলিত সাহস দেখাইয়া গিয়াছেন। ফাঁসির রজ্জু কণ্ঠলগ্ন করিবার সময় তাঁহার মুখে যে সুগম্ভীর হাস্যের ভাব প্রকাশিত হইয়াছিল—দেহ ভস্ম হইবার পূর্ব পর্যন্ত সে হাসি তাঁহার মুখে শোভিত ছিল।

শবদাহের পর দগ্ধাস্থিখণ্ড ও চিতাভস্ম গ্রহণের জন্য দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়িয়া গিয়াছিল। একজন ধনী স্বর্ণপাত্র পূর্ণ করিয়া তাহা লইয়া গিয়াছেন।

......এরূপ দণ্ড দৃষ্টান্তে ভীত হওয়া দূরে থাক,—যুবকবৃন্দ এই মৃত্যু পুণ্যময় সৌভাগ্যময় আদর্শ মৃত্যু বলিয়া মনে করিতেছে। ইহা দেখিয়া কোন কোন ইংরাজী সংবাদপত্র এরূপ স্থলে হিন্দুর সংকার ক্রিয়া পর্যন্ত রুদ্ধ করিয়া দিতে বলেন। চমৎকার কথা! এইরূপ উপদেশই যে বিদ্রোহিতা সৃজন করে এ জ্ঞানটুকু তাঁহাদের নাই।

ইংরেজ এদেশে আসার আগে পর্যন্ত শিল্প-প্রধান দেশ হিসাবে ভারতের সুনাম ছিল সর্বজন-স্বীকৃত। আঠার শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইংলণ্ডে যে শিল্প-বিপ্লব দেখা দেয় তার জন্যে প্রয়োজনীয় মূলধনের বৃহত্তম অংশ গড়ে তোলে ভারত থেকে শোষিত অর্থ। তারপর ধীরে ধীরে ইংলণ্ডের শিল্পপতিরা ভারতের মতো একটা শিল্প-প্রধান দেশকে শুধু কাঁচামাল উৎপাদন এবং সরবরাহকারী দেশে পরিণত করল।[১৭] এই উদ্দেশ্যেই ১৮১৩ সাল থেকে ভারতে ব্যবসা করার একচেটে অধিকার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত থেকে কেড়ে নেওয়া হয়।

১৭ ১৮৪০ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী পার্লামেন্টের কাছে একটি আবেদন জানায়। আবেদনে কয়েকটি শুল্ক তুলে নেওয়ার জন্যে প্রার্থনা করা হয় যেগুলি তখন ভারতীয় শিল্পের খুবই ক্ষতি করছিল। এই সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্যে House of Commons থেকে একটি Select Committee গঠন করা হয়। এই কমিটি যে সমস্ত সাক্ষ্য গ্রহণ করেন সেগুলির মধ্যে বৃটিশ শিল্প-পতিদের ধ্বংসাত্মক মনোভাবটি পরিষ্কার হয়ে ওঠে এবং কি ভাবে তাঁরা ভারতীয় শিল্পের ধ্বংস সাধন করেন তার কথাও বলা হয়। G. G. De H. Larpent সাক্ষ্য দেবার সময় মুক্ত-কণ্ঠেই স্বীকার করেন, "We have destroyed the manufactures of

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের সুরু থেকেই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালীর মধ্যে বিদেশী শোষণের এই নতুন রূপটি সম্বন্ধে সচেতনতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দেশের পরিবর্তিত অর্থনৈতিক ভিত্তিতে স্বদেশী শিল্পকে পুনর্জীবিত করে তোলার চেষ্টা দেখা দেয় তখন থেকেই। নানা প্রতিকূলতা আর সাময়িক ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে বিকশিত হয়ে এই শিল্প-চেতনার একটা বলিষ্ঠরূপ ফুটে উঠল স্বদেশী আন্দোলনের সময়।

তখন স্বদেশী শিল্পের কি পরিমাণ উন্নতি হয়েছিল ১৩১৬ সালের মাঘ মাসের ভারতীর 'সাময়িক-প্রসঙ্গ' থেকে তার সামান্য পরিচয় দেওয়া হল।

> শিল্পোন্নতি সমিতির বৈঠক।—মহাসমিতির অধিবেশনের অব্যবহিত পরেই দ্বার-বঙ্গেশ্বরের অধিপতিত্বে শিল্প-সমিতির বৈঠক বসিয়াছিল। লালা হরকিষণ অভ্যর্থনা বিভাগের কর্তা ছিলেন। দ্বার-বঙ্গেশ্বর তাঁহার বক্তৃতায় যে সকল বিষয়ের সমাবেশ করিয়াছেন তন্মধ্যে অনেকগুলি সমীচীন মন্তব্য আছে।···মহারাজ তৎপরে তন্তুনির্মিত শিল্পের কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে ১৮৮০ সনে মাত্র ৪৮০০ তাঁত ছিল। ২৮ বৎসরে কি প্রকার উন্নতি হইয়াছে তাহা নিম্নলিখিত তালিকায় দেখাইয়াছেন। ১৮৯০ সনে ৭৯৬৪; ১৯০১ সনে ১৫,৩৩৬; ১৯০৫ সনে ২১,৩১৮ এবং ১৯০৮ সনে ৩০,৮২৪টি তাঁত বৃদ্ধি পাইয়াছে। শিল্পপ্রদর্শনী দ্বারা আমাদের কি উপকার হয়, চিনির কারখানা হওয়া কতদূর বাঞ্ছনীয়, যৌথ ও সমবায় শক্তিতে দেশের শক্তি কিরূপ নিয়োজিত হওয়া উচিত ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করিয়া মহারাজ বলিতেছেন, 'প্রকৃষ্ট উপায়ে দেশের ধনবৃদ্ধি করাই স্বদেশীর উদ্দেশ্য।'

ভারতীর পৃষ্ঠা থেকে প্রসঙ্গত এখানে আর একটি মূল্যবান তথ্য উদ্ধার করে দিয়ে এই পত্রিকা সম্বন্ধে আলোচনা শেষ করছি।

India. [And then the witness quoted the views of the Court of Directors, stated in Lord William Bentinck's minute of May 30, 1824. 'The sympathy of the Court is deeply excited by the report of the Board of Trade, exhibiting the gloomy picture of the effects of a commercial revolution productive of so much present suffering to numerous classes in India, and hardly to be paralleled in the history of commerce.']"

Economic History of India in the Victorian Age.
—Romesh Ch. Dutt, p. 110.

ভারতে স্বদেশী শিল্পের উন্নতি।—ম্যাঞ্চেষ্টারে বণিক সমিতির বাৎসরিক অধিবেশনে সভাপতি অ্যাশওয়ার্থ সাহেব বলিয়াছেন—১৯০৭ সালের তুলনায় ১৯০৮ সালের ছয় মাসের মধ্যে ভারতে তিন ক্রোড় নব্বুই লক্ষ টাকার কম বিলাতী বস্ত্র রপ্তানী হইয়াছে। কিন্তু এই সালের শেষ ছয় মাসে আরও সর্বনাশ হইয়াছে। এই কয় মাসে ম্যাঞ্চেষ্টার প্রায় ১৯ ক্রোড় দশ লক্ষ টাকার ক্ষতি স্বীকার করিয়াছে। এ বৎসরের অবস্থা আরও শোচনীয়।

'চয়ন', ভারতী—জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬।

প্রবাসী

"বঙ্গদেশের বাহিরে এরূপ মাসিকপত্র বাহির করিবার ইহাই প্রথম উদ্যম"[১]—এলাহাবাদের কায়স্থ কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ সুপণ্ডিত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (১৮৬৫-১৯৪৩) এবং তাঁর সহযোগিবৃন্দের এই উদ্যম যে কতখানি সফল হয়েছিল সেকথা আজ প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙালীর কাছেই সুবিদিত। সে সময়ে কলকাতা থেকে প্রকাশিত ভারতী, বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়) প্রভৃতি প্রথম পর্যায়ের পত্রিকাগুলির সগোত্র হিসাবে প্রবাসীর নাম করা যায়। অবশ্য কয়েক বছর পরেই প্রবাসীর কার্যালয় কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়।[২] কিন্তু প্রথম প্রায় সাড়ে পাঁচ বছর এটি এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত হত। এই সময় সম্পাদক মহাশয়কে নানারকম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু সমস্ত প্রতিকূলতাকে দূরে সরিয়ে নিয়মিত এরূপ একটি মাসিকপত্র সম্পাদনা করা সাধারণ উদ্যমের পরিচয় নয়।

এলাহাবাদের কায়স্থ পাঠশালা হিন্দুস্থানী লালাদের কলেজ ছিল। ১৮৯৫ সালে রামানন্দ এই কলেজের অধ্যক্ষের কাজ গ্রহণ করে এখানে আসেন। উত্তর-ভারতের বিশেষ করে এলাহাবাদ, বারাণসী, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানে পুরুষানুক্রমে বহু বাঙালী বসবাস করে আসছেন। এঁদের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ অর্থাৎ বাঙালীত্ব অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে কয়েকজন বিশিষ্ট বাঙালী 'প্রবাসী বাঙালী সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন; রামানন্দ ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

এলাহাবাদের সাউথ রোড থেকে ১৩০৮ সালের বৈশাখ মাসে প্রবাসীর প্রথম আত্মপ্রকাশ। তখন এটি চিন্তামণি ঘোষের ইণ্ডিয়ান প্রেস থেকে ছাপা হত। এখানে রামানন্দের বন্ধুদের মধ্যে নাম করা যায়, মদনমোহন মালব্য, তেজ বাহাদুর সাপ্রু, সচ্চিদানন্দ সিংহ প্রভৃতির। প্রবাসী প্রকাশের চেষ্টায় এবং অন্যান্য ব্যাপারেও রামানন্দের প্রধান সাহায্যকারী ছিলেন মেজর বামনদাস বসু। অবশ্য পত্রিকা-সংক্রান্ত ব্যাপারে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এলাহাবাদ হাইকোর্টের উকিল কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনও তাঁকে যথেষ্ট সহায়তা করেন। তবু তাঁর প্রচেষ্টার

১ 'সূচনা'—প্রবাসী, বৈশাখ ১৩০৮।

২ কার্তিক, ১৩১৩ (?)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) : ১৩১৪ সালের আগে রবীন্দ্রনাথের কোন উল্লেখযোগ্য স্বাদেশিকতামূলক রচনা প্রবাসীতে প্রকাশিত হয় নি। এই সাল থেকে ১৩১৬ পর্যন্ত তাঁর কয়েকটি মূল্যবান লেখা প্রবাসীর পৃষ্ঠায় পাওয়া যাচ্ছে— 'ব্যাধি ও প্রতিকার' (শ্রাবণ, ১৩১৪), 'যজ্ঞভঙ্গ' (মাঘ, ১৩১৪), 'পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনী উপলক্ষ্যে সভাপতির বক্তৃতা' (ফাল্গুন, ১৩১৪), 'সমস্যা' (আষাঢ়, ১৩১৫), 'সদুপায়' (শ্রাবণ, ১৩১৫), 'পূর্ব ও পশ্চিম' (ভাদ্র, ১৩১৫) এবং 'শিবাজী ও গুরু গোবিন্দ সিংহ' (চৈত্র, ১৩১৬)।[৪]

কাজের মধ্যে উত্তেজনা থাকতে পারে কিন্তু কর্মশূন্য উত্তেজনা হল অক্ষমের আস্ফালন। বঙ্গভঙ্গের পর থেকে স্বদেশী-আন্দোলনের মধ্যে কর্মের চেয়ে উত্তেজনার মাত্রা ক্রমশ বেড়ে উঠেছিল। নেতাদের মধ্যে অনেকেই এই উত্তেজনাকে প্রশ্রয় দিচ্ছিলেন। রাজনৈতিক মতের দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে দেশবাসী হারাচ্ছিল কর্মপথের সন্ধান। যেখানে আত্মশক্তির অভাব সেখানে পরমুখাপেক্ষিতা অপরিহার্য হয়ে ওঠে। আর বাঙালীর এই চরিত্রগত দুর্বলতার পূর্ণ সুযোগ ইংরেজ-সরকার গ্রহণ করতে ভোলে নি। রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে দেশবাসীকে সচেতন করে দিলেন 'ব্যাধি ও প্রতিকার'[৫] প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে।

> ভাবিয়া দেখ দেখি ইংরেজের উপরে আমাদের কতখানি শ্রদ্ধা কতখানি ভরসা জমিয়া উঠিয়াছে যে আমরা ঠিক করিয়া বসিয়াছিলাম যে

৪ 'পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনী উপলক্ষ্যে সভাপতির বক্তৃতা', 'সমস্যা', 'সদুপায়' এবং 'পূর্ব ও পশ্চিম'—এই চারটি প্রবন্ধ যে-যে সালের যে-যে সংখ্যার প্রবাসীতে ছাপা হয় সেই-সেই সালের সেই-সেই সংখ্যার বঙ্গদর্শনেও প্রকাশিত হয়েছিল। 'পূর্ব ও পশ্চিম' প্রবন্ধটির বঙ্গদর্শনে নাম ছিল 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য'—আকার সংক্ষিপ্ত।

৫ প্রবন্ধটি রবীন্দ্ররচনাবলীর ১০ম খণ্ডের পরিশিষ্টে সংকলিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার' প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য ; বঙ্গদর্শন—বৈশাখ, ১৩০৮। 'ব্যাধি ও প্রতিকার' নামে একটি গ্রন্থও ১৩১৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রকাশিত হয়। লেখক—দেবকুমার রায়চৌধুরী। এই গ্রন্থটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, "গ্রন্থকার এই গ্রন্থে নিপুণভাবে ও সরল ভাষায় ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থার বিচার করিয়া যে প্রাজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে দেশের প্রধানবর্গের নিকট হইতে তিনি সাধুবাদ লাভ করিয়াছেন ;—তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া পাঠকবর্গকে এই গ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ করি।" (প্রবাসী—আশ্বিন, ১৩১৪)

আমরা বন্দেমাতরম্ হাঁকিয়া তাহাদের দক্ষিণ হাতে আঘাত করিব তবু তাহাদের সেই হাতের ন্যায়দণ্ড অন্যায়ের দিকে কিছুমাত্র টলিবে না।

কিন্তু এই সত্যটা আমাদের জানা দরকার যে, ন্যায়দণ্ডটা মানুষের হাতেই আছে এবং ভয় বা রাগ উপস্থিত হইলেই সে হাত টলে। আজ নিম্ন আদালত হইতে সুরু করিয়া হাইকোর্ট পর্যন্ত স্বদেশী মামলায় ন্যায়ের কাঁটা যে নানা ডিগ্রির কোণ লইয়া হেলিতেছে ইহাতে আমরা যতই আশ্চর্য হইতেছি ততই দেখা যাইতেছে আমরা হিসাবে ভুল করিয়াছিলাম।

এর পর রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার প্রসঙ্গ তুলেছেন। তিনি এ কথা মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন যে আমাদের অক্ষমতার আর দুর্ভাগ্যের মূল রয়েছে আমাদেরই পাপের মধ্যে। হিন্দু-মুসলমানের সম্বন্ধের মধ্যেও আমাদের এই পাপ অনেক দিন ধরে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিল। বাইরে থেকে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক মিলনের একটা প্রচেষ্টাকে আমরা গড়ে তুলেছি বটে, কিন্তু তা আন্তরিক হয় নি বলে সার্থক হয় নি; তুচ্ছ আচার-ব্যবহারগত বিধি-নিষেধ আমাদের সমস্ত চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়েছে। তাই,—

আর মিথ্যা কথা বলিবার কোনো প্রয়োজন নাই। এবার আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে হিন্দু-মুসলমানের মাঝখানে একটা বিরোধ আছে। আমরা যে কেবল স্বতন্ত্র তাহা নয়। আমরা বিরুদ্ধ।

আমরা বহু শত বৎসর পাশে পাশে থাকিয়া এক ক্ষেতের ফল, এক নদীর জল, এক সূর্যের আলোক ভোগ করিয়া আসিয়াছি। আমরা এক ভাষায় কথা কই, আমরা একই সুখ-দুঃখে মানুষ—তবু প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিবেশীর যে সম্বন্ধ মনুষ্যোচিত, যাহা ধর্মবিহিত, তাহা আমাদের মধ্যে হয় নাই। আমাদের মধ্যে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া এমন একটি পাপ আমরা পোষণ করিয়াছি যে একত্রে মিলিয়াও আমরা বিচ্ছেদকে ঠেকাইতে পারি নাই। এ পাপকে ঈশ্বর কোনো মতেই ক্ষমা করিতে পারেন না।...

তর্ক করিবার বেলায় বলিয়া থাকি, কি করা যায়, শাস্ত্র ত মানিতে হইবে। অথচ শাস্ত্রে হিন্দু-মুসলমান সম্বন্ধে পরস্পরকে এমন করিয়া ঘৃণা করিবার ত কোনো বিধান দেখি না। যদি বা শাস্ত্রের সেই বিধানই হয় তবে সে শাস্ত্র লইয়া স্বদেশ স্বজাতি স্বরাজের প্রতিষ্ঠা কোনো দিন হইবে না।

সমস্ত ভারতবর্ষের কাঁধের ওপর থেকে ইংরেজের ভারকে নামাতে হলে এই পাপকে আগে দূর করতে হবে। কারণ "ইংরেজ আমাদের ব্যাধির একটা লক্ষণমাত্র; লক্ষণের দ্বারা ব্যাধির পরিচয় লইয়া ঠিকমত প্রতিকার করিতে না পারিলে গায়ের জোরে অথবা বন্দেমাতরম্ মন্ত্র পড়িয়া সন্নিপাতের হাত এড়াইবার কোন সহজ পথ নাই।" দেশের কাজের জন্যে অজ্ঞ-মূর্খ সমস্ত দেশবাসীকে প্রস্তুত করে তুলতে না পারলে আমাদের যে পদে পদে ব্যর্থ হতে হবে এ সত্য দেশনায়কেরা কিছুকাল পরে উপলব্ধি করেছিলেন; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বাস্তব দৃষ্টিতে সেদিনই তা স্পষ্টরূপে ধরা পড়েছিল।

> যাহাদিগকে আমরা 'চাষা বেটা' বলিয়া জানি, যাহাদের সুখ-দুঃখের মূল্য আমাদের কাছে অতি সামান্য, যাহাদের অবস্থা জানিতে হইলে আমাদের গবর্ণমেণ্টের প্রকাশিত তথ্য-তালিকা পড়িতে হয়, সুদিনে-দুর্দিনে আমরা যাহাদের ছায়া মাড়াই না, আজ হঠাৎ ইংরেজের প্রতি স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিবার বেলায় তাহাদের নিকট ভাই সম্পর্কের পরিচয় দিয়া তাহাদিগকে চড়া দামে জিনিষ কিনিতে ও গুর্খার গুঁতা খাইতে আহ্বান করিলে আমাদের উদ্দেশ্যের প্রতি সন্দেহ জন্মিবার কথা।

'ব্যাধি ও প্রতিকার' নাম দিয়েই রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধটির একটি সমালোচনা প্রকাশ করেন ১৩১৪ সালের আশ্বিন সংখ্যার প্রবাসীতে। এখানে সেটির উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। রামেন্দ্রসুন্দর রবীন্দ্রনাথের মতকে বহুলাংশেই মেনে নিয়েছেন, কিন্তু স্বদেশী-আন্দোলনকে একেবারে নিষ্ফল বলে তিনি গ্রহণ করতে পারেন নি। এই আন্দোলনের প্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথ নিজেই যে প্রচুর প্রেরণা আর ভাবাবেগ সঞ্চার করেছিলেন সে কথার উল্লেখ করে তিনি এক জায়গায় লিখেছেন,

> এই দুই বৎসরের আন্দোলনকে আমি নিষ্ফল আন্দোলন বলিতে প্রস্তুত নহি। সম্ভবতঃ রবীন্দ্রবাবুও প্রস্তুত নহেন—কেন না এই ভাবের তরঙ্গ প্রবাহিত করিতে যে কয়জন লোকে চেষ্টা করিয়াছেন, তিনি তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম অগ্রণী। জনসঙ্ঘ মধ্যে ভাবের প্রবাহ পরিচালনার প্রধান অধিকার সাহিত্যের। রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী ভাষার সাহায্যে যে সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহাতে এই স্রোতে নূতন নূতন তরঙ্গ উৎপন্ন হইয়াছে,—সময়ে সময়ে তুফানের সৃষ্টি হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। তুফানে

তরণী ছাড়িয়া দিয়া আজ যদি তিনি সামাল সামাল করিতে থাকেন, তাহা হইলে সম্পূর্ণ দোষ নিরপরাধ আরোহীদের উপর ষোল আনা না চাপাইয়া স্বয়ং কতকটা গ্রহণ করিবেন।

রামেন্দ্রসুন্দরের মতে, উত্তেজনারও একটা গুরুত্ব আছে। কোন জাতি যখন জড়তার ভারে পঙ্গু হয়ে আসে তখন ভাবের উত্তেজনা তার শিরা উপশিরায় আবার নতুন প্রাণ-স্পন্দন এনে দিতে পারে। বাঙালীর জাতীয়-জীবনেও পক্ষাঘাতের লক্ষণ দেখা দিয়েছিল,

এমন সময়ে ভাবের বৈদ্যুতি প্রয়োগে সেই পক্ষাঘাত দূর করা আবশ্যক, এবং ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন স্বয়ং বৈদ্যুতিক ব্যাটারি হাতে লইয়া রোগীর শয্যা পার্শ্বে বসিয়া আছেন, তখন আমরা একেবারে ভরসা হারাই নাই। উত্তেজনা বলে রোগীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অস্বাভাবিক আক্ষেপ দেখিয়া ডাক্তার যদি কিঞ্চিৎ চিন্তিত হইয়া থাকেন, আমরা বরং পক্ষাঘাত নাশের লক্ষণ দেখিয়া আশান্বিত হইয়া উঠিয়াছি।

রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন নিষ্ঠাবান হিন্দু; তাই হিন্দু-মুসলমানের সমস্যা সমাধানে রবীন্দ্রনাথের প্রগতিশীল মনোভাব তিনি সমর্থন করতে পারেন নি।

বাংলাদেশের স্বদেশী ও বয়কটের প্রস্তাব কংগ্রেসের নরমপন্থীরা সহজে মেনে নেন নি। মূলতঃ এই প্রস্তাব উত্থাপনের ব্যাপার নিয়েই ১৯০৭ সালে সুরাট কংগ্রেসে গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়। লোকমান্য তিলক, খাপর্দে, অরবিন্দ প্রভৃতির নেতৃত্বে তখন চরম-পন্থী দল বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। ২৬শে ডিসেম্বর গণ্ডগোলের মধ্যে দিয়ে অধিবেশনের প্রথম দিনটি ব্যর্থ হয়ে যায়। ২৭শে ডিসেম্বর আবার অধিবেশন আরম্ভ হলে তিলক যখন একটা সংশোধনী প্রস্তাবের ওপর বক্তৃতা করার জন্যে উঠে দাঁড়ান তখন সভামণ্ডপে ভীষণ কাণ্ড বেঁধে যায়। দু দল পরস্পরের প্রতি চেয়ার এবং জুতা ছুঁড়তে থাকেন; একপাটি জুতা গিয়ে পড়ে মঞ্চের ওপর ফিরোজ শা মেটার কোলে। এই ভাবে দারুণ বিশৃংখলার মধ্যে দিয়ে সুরাটের অধিবেশন পণ্ড হয়ে যায়। এই ঘটনার জন্যে দায়ী বা দোষী উভয়দলই এ কথা সত্য। কিন্তু সে-সময় নরমপন্থীদের মধ্যে একটা দাম্ভিক মনোভাব গড়ে উঠেছিল যার বশবর্তী হয়ে তাঁরা চরমপন্থীদের প্রায় সব ব্যাপারেই অন্যায় আপত্তি তুলতেন। চরমপন্থীরা যে ভুঁইফোড় নয়—দেশের রাজনৈতিক অবস্থাবৈচিত্র্যে তাঁদের আবির্ভাব যে স্বাভাবিক এবং তাঁদের

মতও যে বিশেষ একটি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত এ কথা নরমপন্থীরা গলার জোরে অস্বীকার করতে চাইতেন। কিন্তু তাঁদের এই দক্ষতার অন্ধ অভিমানই যে সেবারের কংগ্রেসের মর্মান্তিক পরিণতির জন্যে দায়ী রবীন্দ্রনাথ এ কথা তাঁর 'যজ্ঞভঙ্গ'[৬] প্রবন্ধে সেদিন স্পষ্ট ভাষাতেই ঘোষণা করেছিলেন।

> বিরুদ্ধ পক্ষের সত্তাকে যথেষ্ট সত্য বলিয়া স্বীকার না করিবার চেষ্টাতেই এবার কংগ্রেস ভাঙিয়াছে।...আমাদের পুরাণে একটি যজ্ঞভঙ্গের ইতিহাস আছে। দক্ষ যখন তাঁহার যজ্ঞে সতী অর্থাৎ সত্যকে অস্বীকার করিয়া মঙ্গলকে অপমানিত করিয়াছিলেন তখনই প্রচণ্ড উপদ্রব উপস্থিত হইয়া তাঁহার যজ্ঞ বিনষ্ট হইয়াছিল। দক্ষ কেবল নিজের দক্ষতার প্রতি অন্ধ অভিমান বশত জগতে যে যুগে এবং যে ক্ষেত্রেই সত্যকে এবং শিবকে স্বীকার কর, অনাবশ্যক মনে করিয়াছে সেই কালে এবং সেইখানেই কেবল যে কর্ম পণ্ড হইয়াছে তাহা নহে মহান্ অনর্থ ঘটিয়াছে।[৭]

বিভিন্ন জেলায় প্রাদেশিক সমিতির সম্মিলনীর সূত্রপাত ১৮৯৫ সালে। ১৯০৭ সালে পাবনায় প্রাদেশিক সম্মিলনীর সভাপতিরূপে রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। দেশের রাজনৈতিক দুর্যোগময় অবস্থার কথা চিন্তা করে রবীন্দ্রনাথ সভাপতি হতে রাজী হন। সে-সময় নানারকম কটূক্তি তাঁকে সহ্য করতে হচ্ছিল—কি রাজনীতির ক্ষেত্রে, কি সাহিত্যের ক্ষেত্রে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁকে আক্রমণকারীদের নেতা ছিলেন কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। পাবনা

৬ রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০ম খণ্ডের পরিশিষ্টে সংকলিত।

৭ "এবারকার কংগ্রেসের যজ্ঞভঙ্গের কথা তো শুনিয়াছই—তাহার পর হইতে দুই পক্ষ পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করিতে দিনরাত নিযুক্ত রহিয়াছে। অর্থাৎ বিচ্ছেদের কাটা ঘায়ের উপর দুই দলে মিলিয়াই নুনের ছিটা লাগাইতে ব্যস্ত হইয়াছে। কেহ ভুলিবে না, কেহ ক্ষমা করিবে না—আত্মীয়কে পর করিয়া তুলিবার যতগুলি উপায় আছে তাহা অবলম্বন করিবে।·এখন দেশে দুই পক্ষ হইতে তিন পক্ষ দাড়াইয়াছে—চরমপন্থী, মধ্যপন্থী এবং মুসলমান—চতুর্থ পক্ষটি গবর্মেণ্টের প্রাসাদ-বাতায়নে দাঁড়াইয়া মুচকি হাসিতেছে। ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়। আমাদিগকে নষ্ট করিবার জন্য আর কারো প্রয়োজন হইবে না—মর্লির ও নয় কিচেনারেরও নয়, আমরা নিজেরাই পারিব।"

—বিলাতে জগদীশচন্দ্র বসুকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র থেকে উদ্ধৃত। শিলাইদহ, ২৩শে পৌষ, ১৩১৪। প্রবাসী—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫।

প্রাদেশিক সম্মিলনীতে সভাপতিত্ব করার ব্যাপার নিয়েও তাঁকে অনেক বিরূপ সমালোচনা সহ্য করতে হয়।

এই সভার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল রবীন্দ্রনাথ এখানে ইংরেজী ভাষার পরিবর্তে বাংলায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন; এর আগে প্রাদেশিক সম্মিলনীতে ইংরেজীতে বক্তৃতা করাই ছিল রীতি।

বক্তৃতার[৮] প্রথমেই সুরাটের যজ্ঞভঙ্গের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই ঘটনা আমাদের যা শিক্ষা দিয়েছে তা যেন আমরা ঠিকমতো গ্রহণ করতে পারি। বিরুদ্ধকে এক সাথে মিলিয়ে, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যকে গড়ে তুলতে পারলেই আমরা যথার্থ শক্তিশালী হয়ে উঠব। বঙ্গবিভাগকে রহিত করার জন্যে আমরা যে পরিমাণ চেষ্টা করছি, আত্মবিভাগকে দূর করার জন্যে আমাদের তার চেয়ে অনেক বেশি সচেষ্ট হয়ে উঠতে হবে। এই প্রসঙ্গে তিনি extremism বা চরমনীতির যে ব্যাখ্যা দিলেন তা অভিনব। যদিও তখন উত্তেজনার মুহূর্তে অনেকেই তাঁর এই মতকে প্রশংসা করতে পারেন নি তবু আজ অস্বীকার করার উপায় নেই যে বাস্তব পরিস্থিতির সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণের অপূর্ব দক্ষতা তাঁর এই বক্তৃতায় প্রকাশ পেয়েছিল। প্রয়োজনবোধে কিছুটা বিস্তৃত অংশ এখানে উদ্ধৃত হল,

> কিন্তু, ভ্রাতৃগণ, extremist বা চরমপন্থী বা বাড়াবাড়ির দল বলিয়া দেশে একটি দল উঠিয়াছে, এইরূপ যে একটা রটনা শুনা যায় সে দলটা কোথায়? জিজ্ঞাসা করি এ দেশে সকলের চেয়ে বড় এবং মূল extremist কে? চরমপন্থিত্বের ধর্মই এই যে একদিক চরমে উঠিলে অন্যদিক সেইটানেই আপনি চরমে উঠিয়া যায়। এটা আমাদের নিজের কাহারো দোষে হয় না, এটা বিশ্ববিধাতার নিয়মেই ঘটে। বঙ্গবিভাগের জন্য সমস্ত বাংলাদেশ যেমন বেদনা অনুভব করিয়াছে এবং যেমন দারুণ দুঃখভোগের দ্বারা তাহা প্রকাশ করিয়াছে ভারতবর্ষে এমন বোধহয় আর কখনো হয় নাই। কিন্তু প্রজাদের সেই সত্য বেদনায় রাজপুরুষ যে কেবল উদাসীন তাহা নহে, তিনি ক্রুদ্ধ, খড়্গহস্ত।···

৮ বক্তৃতাটি 'সমূহ' গ্রন্থে সংকলিত হয়—১৩১৫। পৃথক গ্রন্থের আকারেও মুদ্রিত হয়েছিল।

এতই বধিরভাবে সমস্ত বাংলাদেশের চিত্তবেদনাকে একেবারে চূড়ান্ত করিয়া দেওয়া ইহাই কি রাজ্যশাসনের চরমপন্থা নহে? ইহার কি একটা প্রতিঘাত নাই? এবং সে প্রতিঘাত কি নিতান্ত নির্জীব ভাবে হইতে পারে?

এই স্বাভাবিক প্রতিঘাত শান্ত করিবার জন্য কর্তৃপক্ষ তো কোন শান্তনীতি অবলম্বন করিলেন না—তিনি চরমের দিকেই চড়িতে লাগিলেন। আঘাত করিয়া যে ঢেউ তুলিয়াছিলেন সেই ঢেউকে নিরস্ত করিবার জন্য ঊর্ধ্বশ্বাসে কেবলি দণ্ডের উপর দণ্ড চালনা করিতে লাগিলেন; তাহাতে তাঁহারা যে বলিষ্ঠ এ প্রমাণ হইতে পারে কিন্তু স্বভাব তো এই প্রবল রাজাদের প্রজা নহে। আমরা দুর্বল হই আর অক্ষম হই বিধাতা আমাদের যে একটা হৃৎপিণ্ড গড়িয়াছিলেন সেটা তো নিতান্তই একটা মৃৎপিণ্ড নহে, আমরাও সহসা আঘাত পাইলে চকিত হইয়া উঠি; সেটা একটা স্বাভাবিক প্রতিবৃত্তি ক্রিয়া, যাহাকে ইংরেজিতে বলে reflex action. এটাকে রাজসভায় যদি অবিনয় বলিয়া জ্ঞান করেন তবে আঘাতটা সম্বন্ধেও বিবেচনা করিতে হয়।...

অতএব একদিকে যখন লর্ড কার্জন, মর্লি, ইবেট্শন্; গুর্খা, প্যুনিটিভ পুলিস ও পুলিসরাজকতা; নির্বাসন, জেল ও বেত্রদণ্ড; দলন, দমন ও আইনের আত্মবিস্মৃতি; তখন অপরপক্ষে প্রজাদের মধ্যেও যে ক্রমশই উত্তেজনা বৃদ্ধি হইতেছে, যে উত্তাপটুকু অল্পকাল পূর্বে কেবলমাত্র তাহাদের রসনার প্রান্তভাগে দেখা দিয়াছিল তাহা যে ক্রমশই গভীর অস্থিমজ্জার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে, তাহারা যে সর্বপ্রকার বিভীষিকার সম্মুখে একেবারে অভিভূত না হইয়া অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছে ইহাতে আমাদের যথেষ্ট অসুবিধা ও অনিষ্টের আশংকা তাহা মানিতেই হইবে। কিন্তু সেই সঙ্গে এইটুকু আশার কথা না মনে করিয়া থাকিতে পারিব না, যে বহুকালের অবসাদের পরেও স্বভাব বলিয়া একটা পদার্থ এখনো আমাদের মধ্যে রহিয়া গেছে; প্রবলভাবে কষ্ট পাইবার ক্ষমতা এখনো আমাদের যায় নাই—এবং জীবনধর্মে যে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার নিয়ম বর্তমান এখনো আমাদের মধ্যে তাহা কাজ করিতেছে। জীবনধর্ম কলের নিয়ম নহে, তাহার প্রতি নির্বিচার ব্যবহার করিলে সে হঠাৎ অভাবনীয়রূপে অসুবিধা ঘটাইয়া থাকে,

কিন্তু তৎসত্ত্বেও নিজেদের জাতীয় কলেবরের মর্মস্থানে চরম আঘাত পড়িতে থাকিলে চর্মপ্রান্তেও তাহার প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ প্রকাশ না হওয়াই আমাদের পক্ষে মঙ্গল এ কথা কোন্ মুখে বলিব ?

ইংরেজ-সরকার এইভাবে যখন চরমনীতির আশ্রয় গ্রহণ করলেন তখন তার পরিণতি যে কোথায় কিভাবে ঘটবে তা ভাবতে পারেন নি। তাই,

> চতুর্দিকে শাসননীতির এরূপ অদ্ভুত দুর্বলতা প্রকাশ পাইতে থাকিলে গবর্মেণ্ট নিজের চালে নিজেই কিছু কিছু লজ্জাবোধ করিতে থাকে, তখন লজ্জানিবারণের কমিশন্ রিপোর্টের তালি দিয়া শাসনের ছিন্নতা ঢাকিতে চায়, যাহারা আর্ত তাহাদিগকে মিথ্যুক বলিয়া অপমানিত করে এবং যাহারা উচ্ছৃংখল তাহাদিগকেই উৎপীড়িত বলিয়া মার্জনা করে। কিন্তু এমন করিয়া লজ্জা কি ঢাকা পড়ে ? অথচ এই সমস্ত উদ্দাম উৎপাত সম্বরণ করাকেও ত্রুটি স্বীকার বলিয়া মনে হয় এবং দুর্বলতাকেও প্রবলভাবে সমর্থন করাকেই রাজপুরুষ শক্তির পরিচয় বলিয়া ভ্রম করেন।...Extremist নাম দিয়া আমাদের মাঝখানে যে একটা সীমানার চিহ্ন টানিয়া দেওয়া হইয়াছে সেটা আমাদের নিজের দেওয়া নহে। সেটা ইংরাজের কালো কালীর দাগ। সুতরাং এই জরিপের চিহ্নটা কখন কতদূর পর্যন্ত ব্যাপ্ত হইবে বলা যায় না।...অতএব ইংরেজ তাহার নিজের প্রতি আমাদের মনের ভাব বিচার করিয়া যাহাকে extremist দল বলিয়া নির্দেশ করিবার চেষ্টা করিতেছে সেটা কি একটা দল না দলের চেয়ে বেশি—তাহা দেশের একটা লক্ষণ ? কোনো একটা দলকে চাপিয়া মারিলে এই লক্ষণ আর কোনো আকারে দেখা দিবে অথবা ইহা বাহির হইতে ভিতরে প্রবেশ করিবে।...আমাদের রাজারাও সেইরূপ মনে করিতেছেন extremism বলিয়া একটা বিশেষ রাসায়নিক উৎক্ষেপক পদার্থ একদল লোক তাহাদের ল্যাবরেটরিতে কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করিয়া তুলিতেছে, অতএব কয়েকটা দলপতি ধরিয়া পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেটের হাতে সমর্পণ করিয়া দিলেই উৎপাত শান্ত হইতে পারিবে।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিপিনচন্দ্র পালের মতের যতই গরমিল থাক এক জায়গায় যে একটা বড় রকমের মিল ছিল তা রবীন্দ্রনাথের এই ধরনের উক্তির মধ্যে দিয়ে পরিষ্কার হয়ে পড়েছে। ইংরেজ-অত্যাচারের ফলে দেশে বৈপ্লবিক জাগরণ

যে স্বাভাবিক, অত্যাচার প্রবলতর হলে এ জাগরণও যে ত্বরান্বিত হবে—এ কথা উভয়েই সমর্থন করেছেন। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণে এমন সুস্পষ্ট নির্ভীক মন্তব্য সে-সময়ের খুব কম সমালোচনাতেই পাওয়া যায়।

১৩১৪ সালের শেষের দিকে যখন বোমা তৈরি আর হত্যাকাণ্ডের তাণ্ডব সুরু হল ঠিক সেই সময়েই রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শনে 'পথ ও পাথেয়' প্রবন্ধটি প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধে তিনি এক দিকে যেমন ইংরেজের শাসননীতিতে ধর্মহীনতার কথা উল্লেখ করলেন তেমনি দেশের উত্তেজিত অসংযত যুবশক্তির ক্রিয়াকলাপকেও সমর্থন করতে পারলেন না। প্রকৃত দেশহিত যে কি এবং কি করে তা সাধন করতে হয় এই ছিল 'পথ ও পাথেয়'র আলোচ্য বিষয়। কিন্তু তখন অনেকেই তাঁর মতে সায় দিতে পারেন নি। এবং হয়তো-বা তাঁকে ভুল বুঝেছিলেন। তাই 'সমস্যা'* প্রবন্ধে তিনি নিজের মতকে আরো পরিষ্কার করে দেশবাসীর চোখের সামনে তুলে ধরলেন।

দেশের তদানীন্তন অবস্থার জন্যে ইংরেজ যে সম্পূর্ণ দায়ী এ কথা তিনি কোনদিন অস্বীকার করেন নি। এই প্রবন্ধে যে ভাবে এবং যে ভাষায় তিনি ইংরেজের অত্যাচার ও তার অনিবার্য পরিণতির কথা বললেন তা সে যুগে অনেক বিপ্লবীর পক্ষেও বলা সহজ ছিল না—

> ভারতবর্ষের পক্ষে চরম হিত যে কি তাহা বুঝিবার বাধা যে কেবল আমরা নিজেরা উপস্থিত করিতেছি তাহা নহে, বস্তুত তাহার সর্বপ্রধান বাধা আমাদের প্রতি ইংরেজের ব্যবহার। ইংরেজ কোনোমতেই আমাদের প্রকৃতিকে মানব-প্রকৃতি বলিয়া গণ্য করিতেই চায় না।···অক্ষম যখন অস্থি-মজ্জায় জলিয়া জ্বলিয়া মরে, যখন হাতে হাতে অপমানের প্রতিশোধ লওয়ার কাছে মানবধর্মের আর-কোনো উচ্চতর দাবি তাহার কাছে কোনোমতেই রুচিতে চাহে না, তখন কেবল ইংরেজের রক্তচক্ষু পিনাল-কোড্ই ভারতবর্ষে শান্তি বর্ষণ করিতে পারে এত শক্তি ভগবান ইংরেজের হাতে দেন নাই। ইংরেজ জেলে দিতে পারে, ফাঁসি দিতে পারে, কিন্তু স্বহস্তে অগ্নিকাণ্ড করিয়া তুলিয়া তার পরে পদাঘাতের দ্বারা তাহা নিবাইয়া দিতে পারে না—যেখানে জলের দরকার সেখানে রাজা হইলেও তাহাকে

৯ 'রাজা প্রজা' গ্রন্থে সংকলিত—১৩১৫।

জল ঢালিতে হইবে। তাহা যদি না করে, নিজের রাজদণ্ডকে যদি বিশ্ব-বিধানের চেয়ে বড়ো বলিয়া জ্ঞান করে তবে সেই ভয়ংকর অন্ধতাবশতই দেশে পাপের বোঝা স্তূপীকৃত হইয়া একদিন সেই ঘোরতর অসামঞ্জস্য একটা নিদারুণ বিপ্লবে পরিণত না হইয়া থাকিতেই পারে না।···য়ুরোপের যে-কোন জাতি হোক্-না কেন সকলেরই কাছে ইংরেজের উপনিবেশ প্রবেশদ্বার উদ্‌ঘাটিত রাখিয়াছে আর এশিয়াবাসী মাত্রই যাহাতে কাছে ঘেঁসিতে না পারে সেজন্য তাহাদের সতর্কতা সাপের মতো ফোঁস্ করিয়া ফণা মেলিয়া উঠিতেছে।···এক পক্ষে বড় বড় বেতন, মোটা পেন্সন এবং লম্বা চাল— অন্য পক্ষে নিতান্ত ক্লেশে আধ-পেটা আহারে সংসার-যাত্রা নির্বাহ;— অবস্থার এই অসঙ্গতি একেবারে গায়ে গায়ে সংলগ্ন। শুধু অন্নবস্ত্রের হীনতা নহে, আমাদের তরফে সম্মানের লাঘব এত অত্যন্ত অধিক, পরস্পরের মূল্যের তারতম্য এত অতিমাত্র, যে, আইনের পক্ষেও পক্ষপাত বাঁচাইয়া চলা অসাধ্য; এমন স্থলে যত দিন যাইতেছে ভারতবর্ষের বক্ষের উপর বিদেশীর ভার ততই গুরুতর হইতেছে; উভয়পক্ষের মধ্যেকার অসাম্য নিরতিশয় অপরিমিত হইয়া উঠিতেছে, ইহা আজ আর কাহারো বুঝিতে বাকি নাই। ইহাতে একদিকে বেদনা যতই দুঃসহ হইতেছে আর এক দিকে অসাড়তা ও অবজ্ঞা ততই গভীরতা লাভ করিতেছে। এইরূপ অবস্থাই যদি টিকিয়া যায় তবে ইহাতে একদিন না একদিন ঝড় আনিয়া উপস্থিত করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

রবীন্দ্রনাথ দ্বিধাহীন ভাষাতেই জানিয়ে দিলেন, বিপ্লবের আগে ফ্রান্সে বা আমেরিকায় যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল আমাদের দেশের অবস্থাও প্রায় সেই রকম। কিন্তু তা হলেও একটা বড় রকমের পার্থক্য আছে, আর সেই পার্থক্যের জন্যে আমাদের বিপ্লবও সার্থক হতে পারে না। এদেশে বিপ্লবের ভবিষ্যৎ ব্যর্থতার রূপটিকে তিনি স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন; তাই বৈপ্লবিক উত্থানকে স্বাভাবিক বলে মেনে নিলেও তাকে সমর্থন না করে তিনি 'সফলতার সদুপায়' জানিয়েছেন। তিনি প্রশ্ন তুললেন, আমাদের দেশে যারা বিপ্লব করবে তারাই তো বিচ্ছিন্ন। "এক বাংলা দেশেই হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান যে নিজের ভাগ্য মিলাইবার জন্য প্রস্তুত এমন কোনো লক্ষণই দেখা যাইতেছে না। তবে স্বাধীন হইবে কে?" অনেকে বলতেন, স্বাধীনতা না পেলে জাতীয় ঐক্য গড়া যায় না।

ইংরেজই তো প্রধান বাধা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মত হল ইংরেজ আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দিলেও জাতীয় ঐক্য স্থাপনের শক্তিটি কেড়ে নিতে পারে নি। আর যদি এই ঐক্য স্থাপনের জন্যে স্বাধীনতার প্রতীক্ষায় বসে থাকতে হয় "তবে এ সমস্যার কোন মীমাংসাই নাই ; কারণ, বিচ্ছিন্ন কোন দিনই মিলিতের সঙ্গে বিরোধ করিয়া জয়লাভ করিতে পারে না।" তাছাড়া, বড় কথা হল—এই বিরোধ কি প্রকৃতই ইংরেজের সৃষ্টি ? নিজেদের মধ্যে এই বিরোধের বীজ অনেক আগেই আমরা নিজের হাতেই বপন করেছিলাম পারস্পরিক সংস্কারবদ্ধ আচরণ এবং ব্যবহারের সংকীর্ণতার মধ্যে দিয়ে[১০] ; আজ ইংরেজ তাতেই জলসেচন করেছে মাত্র। এই দিক থেকে ইংরেজ আমাদের মঙ্গল করেছে ; এই বিরোধের রূপটিকে স্পষ্ট করে তোলায় আমরা মিলিত হবার সুযোগ পেয়েছি।

বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষ্যে স্বদেশী আন্দোলন যখন সুরু হয় তখনও আমরা উচ্ছ্বাস ও উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে জাতীয় মিলনের চত্বরটিকে পাকা না করে তাতে ফাটল ধরাতে ইংরেজকে সাহায্য করেছি। বিলাতী বর্জন তখন আমাদের কাছে যত প্রয়োজন ছিল তার চেয়ে অনেক বেশী প্রয়োজন ছিল আত্মবিচ্ছেদ যাতে না ঘটে সেই দিকে লক্ষ্য রাখা। কিন্তু সে উদ্দেশ্য অলক্ষ্যেই থেকে গেছে। স্বদেশী-গ্রহণের নীতি আমাদের একটা জাতীয়-অবিষ্কার বলে রবীন্দ্রনাথ আনন্দ প্রকাশ এবং দেশবাসীকে সে বিষয়ে উৎসাহ দান করলেও কোনদিনই আনন্দে আত্মহারা হতে প্রশ্রয় দেন নি। তাই যখন আত্মবিস্মৃত উত্তেজনাই দেশে প্রকট হয়ে উঠল তখন তিনি দেশবাসীকে সচেতন করে দিয়ে বললেন,

> সত্য কথাটা এই যে ইংরেজের উপরে রাগ করিয়াই আমরা দেশের লোকের কাছে ছুটিয়াছিলাম, দেশের লোকের প্রতি ভালোবাসাবশতই যে গিয়াছিলাম তাহা নহে। এমন অবস্থায় 'ভাই' শব্দটা আমাদের কণ্ঠে ঠিক বিশুদ্ধ কোমল সুরে বাজে না— যে কড়ি সুরটা আর সমস্ত স্বরগ্রাম ছাপাইয়া কানে আসিয়া বাজে সেটা অন্যের প্রতি বিদ্বেষ। তাই বলিতেছি,

১০ 'ব্যাধি ও প্রতিকার' প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

বিলাতী ব্যবহারই দেশের চরম অহিত নহে, গৃহবিচ্ছেদের মত এতবড় অহিত আর কিছু নাই। ('সদুপায়' [১১])।

বিরোধের মধ্যে দিয়ে মিলনের সত্যকে বিকশিত করে তোলার যে মন্ত্র ভারতবর্ষকে একটা শাশ্বত স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে রবীন্দ্রনাথ তার মর্ম শুধু জীবনে উপলব্ধিই করেন নি, তাকে জগতে প্রতিষ্ঠা করার জন্যেও আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। ইংরেজ যে-ভারতবর্ষে এসেছে সে তো কোন একটা সম্প্রদায় বিশেষের ভারতবর্ষ নয়, সেখানে সকলের সমান অধিকার।

> যে-ভারতবর্ষ অতীতে অঙ্কুরিত হইয়া ভবিষ্যতের অভিমুখে উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিতেছে, ইংরেজ সেই ভারতের জন্য প্রেরিত হইয়া আসিয়াছে। সেই ভারতবর্ষ সমস্ত মানুষের ভারতবর্ষ— আমরা সেই ভারতবর্ষ হইতে অসময়ে ইংরেজকে দূর করিব, আমাদের এমন কী অধিকার আছে। বৃহৎ ভারতবর্ষের আমরা কে। এ কি আমাদেরই ভারতবর্ষ। সেই আমরা কাহারা। সে কি বাঙালি, না মারাঠি, না পাঞ্জাবি, হিন্দু না মুসলমান।… ইংরেজের মধ্যে যাহা সকলের চেয়ে বড়ো এবং সকলের চেয়ে ভালো তাহা আরামে গ্রহণ করিবার নহে, তাহা আমাদিগকে জয় করিয়া লইতে হইবে। ইংরেজ যদি দয়া করিয়া আমাদের প্রতি ভালো হয়, তবে তাহা আমাদের পক্ষে ভালো হইবে না। আমরা মনুষ্যত্ব দ্বারা তাহার মনুষ্যত্বকে উদ্বোধিত করিয়া লইব। ('পূর্ব ও পশ্চিম' [১২])

এখানে একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে, ভারতবর্ষের মাটিতে রবীন্দ্রনাথ যে-ইংরেজের অধিকারকে স্বীকার করেছেন সে বণিক-ইংরেজ নয়, রাজা-ইংরেজ নয়— মানুষ-ইংরেজ; তাই আমাদের মনুষ্যত্ব দিয়ে তার মনুষ্যত্বের উদ্বোধনও সম্ভব।

ভারতবর্ষের মাটিতে সম্প্রদায়গত একটা বিচ্ছিন্নতার ভাব বহুকাল ধরেই আধিপত্য চালিয়ে এসেছে। মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রে এই ভাবটাই সর্বাধিক প্রশ্রয় পেয়েছিল। হিন্দু বা শিখ রাজারা মোগলের সঙ্গে যে-সব যুদ্ধ করেছেন তার মূলে ছিল প্রতিহিংসা বা আত্মরক্ষার প্রেরণা। একমাত্র শিবাজীর দ্বারা

১১ 'সমূহ' গ্রন্থে সংকলিত—১৩১৫।

১২ 'সমাজ' গ্রন্থে সংকলিত—১৩১৫।

ইংরাজী সাহিত্যের সহিত পরিচিত হইবার পূর্বে আপনার অভাব সম্বন্ধে আমাদের সমাজের বিশেষ কোন অভিজ্ঞতা ছিল বলিয়া মনে হয় না। বরং জ্ঞানের অভাবেই অনেকগুলি কুৎসিত রীতিনীতি এদেশে প্রশ্রয় পাইয়া আসিয়াছে। যে সমাজে পনেরো-আনা লোক শূদ্র, এবং শূদ্রকে কোন প্রকার বিদ্যাদান করা ধর্মবিরুদ্ধ সংস্কার বলিয়া অতি পুরাকাল হইতে পরিগণিত হইয়াছে,...যে সমাজে বিভিন্ন বর্ণের লোক এখনো এক সঙ্গে এক পংক্তিতে বসিয়া আহার করাকে ঘোরতর বিপ্লব বলিয়া মনে করে, যে সমাজে জাতিভেদজনিত সংস্কারাদি গ্রামের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়া পরস্পরের সৌহার্দ্যের অন্তরায় হইয়াছে...সেই সমাজের প্রতি পল্লীতে পল্লীতে মনুষ্যত্ব-চর্চার সমস্ত ব্যবস্থা ধর্মভাবে রক্ষিত হইত এ কথা রবিবাবুর ন্যায় লোকের লেখনী হইতে নির্গত হইয়াছে দেখিয়া লজ্জায় ও দুঃখে মরিয়া যাইতে ইচ্ছা হয়।...

পূর্বে সমাজ কি কি জিনিসকে অভাব বলিয়া মনে করিত তাহা আমরা জানি না। অভাব কথাটি relative, absolute নহে। আজ যে সমস্ত জিনিসকে আমরা অভাব বলিয়া মনে করিতেছি শতবর্ষ পূর্বে আমাদের বৃদ্ধ পিতামহেরা সে সমস্ত জিনিসকে অভাব বলিয়া মনে করিতেন কিনা সন্দেহ। আবার তাঁহারা যে সমস্ত জিনিসকে তখন অভাব বলিয়া মনে করিয়াছেন বল্লাল সেন কিম্বা আদিশূরের সময় বাঙালী জাতি তাহাকে অভাব মনে করিত কিনা সে বিষয়ে প্রমাণাভাব। এরূপস্থলে এ বিষয়ে তর্ক করা নিষ্ফল।...রবিবাবু যে 'পূর্বে'র কথা মনে করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন সেই পূর্বকালে আমাদের দেশে জ্ঞানের কিরূপ বিস্তৃতি ছিল এবং সমাজ-বিজ্ঞান ও রাজনীতিশাস্ত্রের সহিত আপামর সাধারণের কিরূপ পরিচয় ছিল তাহা সম্যক অনুসন্ধান করিলে রবিবাবু আর অভাবাদি সম্বন্ধে এ দাম্ভিকতার কথা উচ্চারণ করিতে সাহসী হইতেন না।

পৃথ্বীশচন্দ্র সামাজিক অভাববোধকে রিলেটিভ্ বলে উল্লেখ করে যে-ভাবে সেটিকে বিশ্লেষণ করলেন তাতে তাঁর বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় ফুটে উঠেছে এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু ঠিক এই কারণেই তাঁর সরকার-মুখাপেক্ষিতাকেও সমর্থন করা যায় না। মনে হয় তাঁর বাস্তবদৃষ্টি সম্পূর্ণ মোহমুক্ত ছিল না বলেই 'স্বদেশী-সমাজে' রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের মর্মটি তিনি অনুধাবন

করতে পারেন নি। পৃথ্বীশচন্দ্র 'Atrophy of the Moral Faculty বা নৈতিক শক্তির ক্ষয়' নামে আমাদের যে ব্যাধির কথা বললেন সেটা কোন নতুন ডায়গ্‌নসিস্ নয়। রবীন্দ্রনাথও এ কথা অস্বীকার করেছেন বলে মনে হয় না। পৃথ্বীশচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধে এই ব্যাধি দূর করার কোন উপায় নির্দেশ করেন নি; শুধু বলেছেন "ধীরে ধীরে সাবধানে আমাদের নৈতিক জীবনকে সবল করিয়া লইতে হইবে।" কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই রোগের একমাত্র অব্যর্থ মহৌষধ নির্দেশ করেছেন—আত্মচেষ্টা।

ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী: ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর বেশির ভাগ রচনা নব্যভারতে প্রকাশিত হয়। ইনি ছিলেন দিল্লী হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ। অধ্যাপনার বিষয় ছিল ইতিহাস ও দর্শন। কিন্তু অন্যান্য বিষয়েও, বিশেষ করে রাজনীতি এবং অর্থনীতিতে তাঁর পাণ্ডিত্যের অভাব ছিল না।

প্রবাসীতে তিনি মাঝে মাঝে লিখতেন। এই পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর চারটি প্রবন্ধের উল্লেখ করছি—'ভারতের স্বরাষ্ট্র' (বৈশাখ, ১৩১৪), 'স্বদেশী ও বহিষ্কার (জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪), 'প্রজাশক্তির অভিব্যক্তি' (আষাঢ়, ১৩১৪) এবং 'ভারতে বৃটিশ শান্তি' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৫)।

ইংরেজ-সরকারের অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে এই বিশিষ্ট শিক্ষাবিদের একটা অনমনীয় বলিষ্ঠ প্রতিবাদ তাঁর বহু লেখাতেই ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। ধীরেন্দ্রনাথের এই প্রতিবাদের সুর সপ্তমে উঠেছে প্রবাসীর এই লেখাগুলিতে। স্বদেশের অবস্থা তাকে যে কি পরিমাণ চিন্তিত করে তুলেছিল এই লেখাগুলি পড়লেই তা বোঝা যায়—আর নিঃসন্দেহে বোঝা যায় তিনি ছিলেন চরমপন্থী; সন্ত্রাসবাদীদের কিছুটা উগ্রতাও যে তাঁর মধ্যে ছিল না এ কথাও জোর করে বলা যায় না। অন্তত এই চারটি প্রবন্ধ সেই সাক্ষ্যই বহন করে।

শাসন পরিচালনার স্বার্থে ইংরেজ-সরকার যে ভেদ-নীতি (divide and rule policy) গ্রহণ করেছিল গোড়া থেকেই অনেকের কাছে তার স্বরূপটি ধরা পড়ে যায়। তাঁরা পরিষ্কার ভাষাতেই এই নীতির সম্বন্ধে দেশবাসীকে সচেতন করতে চেষ্টা করেন। 'ভারতের স্বরাষ্ট্র' প্রবন্ধে ধীরেন্দ্রনাথেরও সেই চেষ্টার পরিচয় পাওয়া গেল। মুসলমান সম্প্রদায়কে উদ্দেশ করে তিনি লিখলেন,

"আর কেন ভাই, সোজা পথে ঘরে এস, দুই ভাইয়ে মিলিয়া মায়ের কষ্ট দূর করি," হিন্দুদের প্রেরণা দিয়ে বললেন,

> আর রক্ত দেখিয়া মূর্চ্ছা গেলে চলিতেছে না। জননীর, ভগিনীর সম্মান রক্ষার জন্যও তোমাকে অস্ত্র ধরিতে শিখিতে হইতেছে। সরকার যখন তোমার রক্ষার ভার লইতে নারাজ তখন তোমাকেই আত্মরক্ষার ভার লইতে হইবে।...মনুষ্যত্ব লাভের জন্যই স্বরাষ্ট্র চাই, অতএব স্বরাজ আমার অবশ্য-প্রাপ্তব্য

'স্বদেশী ও বহিষ্কার' প্রবন্ধে লেখক যে মত প্রকাশ করলেন তাকে নিঃসন্দেহেই 'চরম' অ্যাখ্যা দেওয়া যায়। বাংলায় এই মতের সমর্থকরা তখন দলে ভারি। রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর মতের সমর্থকদের সঙ্গে এর একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। মত-পার্থক্যের ভিত্তিতে তখন যে দুটি দল দেশে গড়ে উঠেছিল তাদের মধ্যে একদল মনে করতেন স্বরাজ আগে, অপর দল মনে করতেন স্বদেশী আগে। ধীরেন্দ্রনাথ মতের দিক থেকে যে এই 'স্বরাজ-আগে'-দলভুক্ত এ কথা তাঁর এই প্রবন্ধটি থেকে পরিষ্কার জানা যায়।

> যাহার স্বদেশ বলিয়া দাবী করিবার কিছুই নাই, কোনো ভূমিখণ্ডকে স্বদেশ বলিয়া দাবী করিতে গেলেই অমনি বিদেশী আসিয়া চোখ রাঙাইয়া নাকের সম্মুখে তরবারি ঘুরায়, তাহার স্বদেশী—তাহা যতই কেন 'হনেষ্ট' হউক না—কবন্ধের শিরঃপীড়ার ন্যায় নিতান্তই অলীক। সুতরাং 'স্বরাজ' স্বদেশীর অপরিহার্য আশ্রয়।

তাঁর মতে বিদেশী দ্রব্য সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে না পারলে স্বদেশীর প্রতিষ্ঠা লাভ সম্ভব নয়। কিন্তু বিদেশী বর্জন বা তাঁর ভাষায় 'বহিষ্কার'কে সার্থক করে তুলতে হলে আমাদের কর্তব্য কি সে সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করেছেন,

> আমরা যদি এমন গণ্ডগোল—অবশ্য ভিক্ষার ঝুলির আন্দোলন নহে—উপস্থিত করিতে পারি যাহাতে ইংরাজ বুঝিবে যে ভারত শাসন আর ভারত শোষণ নহে, ভারতের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিতে হইলে উপনিবেশের সম্বন্ধের ন্যায় ঘরের খাইয়া বনের মোষ তাড়াইতে হইবে, তবে অচিরাৎ ইংলণ্ডের রাজনীতিক্ষেত্রে ভারতের মুক্তির জন্য অনেক বক্‌স্টন্ গ্রেন্‌ভিল শার্পের আবির্ভাব হইবে। কেননা পকেটে হাত পড়িলেই ইংরেজের মনুষ্যত্ব খোলে। আমরা যদি হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত, গুজরাত

হইতে আরাকান পর্যন্ত এমন অগ্নি প্রজ্বলিত করিতে পারি যাহাতে ইংরাজ বুঝিবে যে আমাদের স্বরাজের ন্যায্য দাবী অগ্রাহ্য করিয়া আর ভারতশাসন সম্ভব নয়, তাহা হইলেই কেবল দোকানদার ইংরাজের ন্যায়বুদ্ধি জাগ্রত হইবে।···অবস্থার পরিবর্তনে অন্য অস্ত্রের প্রয়োজন হইবে না তাহা বলিতেছি না, কিন্তু এখনকার মত বহিষ্কার-অনলই যথেষ্ট। এই আগুনেই এখন ভারতের রাজনৈতিক গগন জ্বলিয়া উঠুক।

যে ভারতব্যাপী গণ্ডগোল উপস্থিত করার কথা লেখক বললেন তার কোন পরিকল্পনা বা তাকে বাস্তবে রূপায়িত করার কোন উপায় সম্বন্ধে তিনি বিশেষ কিছু জানালেন না। তা ছাড়া এই বর্জননীতির অর্থনৈতিক দিকটা লেখক মোটেই চিন্তা করেন নি। দেশে স্বদেশী পণ্য উৎপাদন ঠিক মতো সম্ভব না হলে বিদেশী-বর্জনও সার্থকতা লাভ করতে পারে না। "অবস্থার পরিবর্তনে অন্য অস্ত্রের প্রয়োজন হইবে না তাহা বলিতেছি না"—এই উক্তির মধ্যে সন্ত্রাসবাদের সমর্থন অস্পষ্ট নয়। মনে রাখতে হবে এই বছরের (১৩১৪) শেষের দিক থেকে বাংলায় সন্ত্রাসবাদীদের ক্রিয়াকলাপ প্রকট হয়ে ওঠে। এই সঙ্গে ধীরেন্দ্রনাথের 'প্রজাশক্তির অভিব্যক্তি' প্রবন্ধটিও স্মরণীয়। অত্যাচারের ফলে কিভাবে অত্যাচারিত স্বাভাবিক নিয়মেই প্রতিশোধ আর প্রতিকারের শক্তি অর্জন করে সে কথার উল্লেখ করে লেখক ইংরেজ সরকারকে বলছেন,

> আজ কুমিল্লাবাসী দু'জন হিন্দুকে নির্যাতন করিয়া তুমি জঘন্য পরিতোষ প্রাপ্ত হইতেছ, 'পঞ্জাবী'র সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারীর প্রতি জুলুম করিয়া স্বীয় প্রতিহিংসার চরিতার্থতা সম্পাদন করিতেছ, কিন্তু অন্ধ তুমি দেখিতেছ না যে ইহাতে সমগ্র হিন্দুস্থানের মাংসপেশী দৃঢ় হইতেছে। তোমার এই ঘৃণিত অত্যাচারে আজ ভারত জননীর ধমনীতে যে রস সঞ্চারিত হইতেছে, শিরায় শিরায় যে বিদ্যুৎপ্রবাহ ঘনীভূত হইতেছে, যেদিন তোমাকে তাহার হিসাব লইতে হইবে সেদিন তোমার ঐ রাঙা মুখ কালি হইয়া যাইবে, ও মুখে আর সেদিন ভ্রূকুটি থাকিবে না, দাঁত-কপাটি লাগিয়া যাইবে। ইহাই প্রকৃতির প্রতিশোধ। নিজেরা আইন পদদলিত করিতেছ, কিন্তু তাহা বলিলে sedition, sedition বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেছ।···দেড়শত বছর লাগিলেও ভারতেরও প্রকৃতি জাগিয়াছেন।···

যদি রুষিয়ার রাজপন্থা অবলম্বন কর, তবে রুষ-প্রজার বিষদন্তের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাক। ইহা তোমার আমার ঘরের কথা নহে, প্রকৃতির নিয়ম।

বুঝতে অসুবিধা হয় না সরকারী অত্যাচারের প্রকৃতি অনুসারে প্রতিবিধান হিসেবে তিনি রাশিয়ার নিহিলিজম্‌ও সমর্থন করেন। এ ধরণের লেখা যে তখন গুপ্ত-সমিতির সভ্যদের যথেষ্ট প্রেরণা দিয়েছিল এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

ভারতে শান্তির নামে যে মনুষ্যত্বহীন জড়তা ইংরেজ-সরকার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল এবং যে চেষ্টায় অনেকটা সার্থকও হয়েছিল, 'ভারতে বৃটিশ শান্তি' প্রবন্ধে ধীরেন্দ্রনাথ সেই প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন।

দেড়শত বৎসর পূর্বে যখন ইংরেজ এ দেশের রাজ্যভার গ্রহণ করে, ঐতিহাসিকগণ বলিতেছেন, তখন পরস্পরে বিবাদ করিয়া আমরা উচ্ছন্ন যাইতেছিলাম, সুতরাং ইংরেজদের পক্ষে সকলের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল। আর এই দেড়শত বৎসর পরেও শুনিতেছি, ইংরেজ চলিয়া গেলে, আমরা পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করিয়া বিনাশ পাইব। তবে জিজ্ঞাসা করি এই দেড়শত বৎসর ইংরাজ-শাসনের শান্তিতে বাস করিয়া আমাদের লাভটা হইল কি? মনুষ্যত্বের দিকে কি এক পদও অগ্রসর হই নাই? তাই যদি হয়, তবে যতদিন এই শান্তি থাকিবে, ততদিনই তো আমাদের মনুষ্যত্ব চাপা পড়িয়া থাকিবে, প্রকৃত শান্তি লাভ হইবে না; ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এ শান্তির বিড়ম্বনায় প্রয়োজন কি?

বিজয়চন্দ্র মজুমদার (১৮৬১-১৯৪২): বিজয়চন্দ্রের গদ্য রচনাতেও যে একটা 'সহজ দক্ষতা' ছিল তার একটি নিদর্শন ভারতীর পৃষ্ঠাতে পাওয়া গেছে। তিনি ছিলেন প্রধানত কবি। প্রবন্ধ রচনাতেও তাঁর নৈপুণ্য নগণ্য নয়। প্রবাসীর পৃষ্ঠা থেকে এখানে তাঁর সরস চিত্র রচনার আর একটি উদাহরণ সংগ্রহ করে দেওয়া হল। এ ধরণের লেখা তাঁর বোধ হয় আর নেই।

'ফ্যানি ডস্' নামে তাঁর এই রচনাটি প্রকাশিত হয় ১৩১২ সালের কার্তিক সংখ্যায়। রচনাটি সংস্কৃত দুর্মল্লিকার লক্ষণাক্রান্ত। এতে হিন্দু পরিবারে ইংরেজী আদব-কায়দার অন্ধ অনুকরণের অবশ্যম্ভাবী মর্মস্পর্শী পরিণতির একটি চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে। চিত্রটি প্রাণবন্ত ও ব্যঙ্গরসাত্মক। শুধু একটি চরিত্র—প্রিয়নাথের স্ত্রী মন্দাকিনী—গোড়া থেকেই হিন্দু-সামাজিকতার মর্যাদা

বজায় রেখেছে এবং নিজের স্বামীকেও স্বাজাত্য ও স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত না হতে সহধর্মিনীর কর্ত্তব্য পালন করেছে। সামান্য অংশ এখানে উদ্ধৃত হল। এতে ঘটনামূলক পরিণতির একটি ইংগিতও পাওয়া যেতে পারে।

১ম অংক।

২য় দৃশ্য।

(মিষ্টার সান্যালের ড্রয়িং রুম)

(প্রিয়নাথ সান্যাল, মন্দাকিনী, পাঁচকড়ি দত্ত এবং লোনেক্-জ্যাকেট্-আদি ভূষিতা সান্ধ্যপোষাক পরিহিতা অবলা।)

অবলা। মিসেস্ সাণ্ডেল্! মিষ্টার ডসের বাড়ীতে কাল ইভিনিং পার্টি হবে। সেখানে গেলে খুব আনন্দ লাভ কত্তে পার্বেন।

মন্দা। আমার যাওয়া হবে না।

অবলা। কেন ?

মন্দা। আমি ছেলেটিকে রেখে কি করে বেড়াতে যাই ?

অবলা। ছেলেরা যদি বার্ডেন হয় তা হলে ত লাইফ মিজারেব্‌ল্ হল। আয়া বাড়ীতে ছেলে রাখবে।

মন্দা। (স্বগত) একেই ডান্ বলে। (প্রকাশ্যে) না, ছেলের অসুখ।

পাঁচকড়ি। (স্বগত, মন্দাকিনীর দিকে তাকাইয়া) বেশ মুখখানি—ছেলেবেলায় দেখেছিলুম ; তা এখন পোষাকটায় মাটি করেছে।

অবলা। মিষ্টার সাণ্ডেল ! তা হলে আমরা মিসেস্ সাণ্ডেলের সঙ্গের আনন্দ হারাচ্ছি ?

মন্দা। (স্বগত) পোড়ারমুখীর বাংলা দেখ না !

পাঁচকড়ি। আমিও রাত জাগতে পারি নে, আমারও হয়তো যাওয়া হবে না।

অবলা। তুমি না গেলেও আমাকে যেতে হবে। সামাজিকতা নষ্ট কত্তে পারি নে।

প্রিয়নাথ। কি কি হবে ?

অবলা। সাধারণ রকম আমোদ প্রমোদ হবে। দুর্ভাগ্য এই, আমরা অনেক

সভ্য আমোদ জানি নে। বল্‌-টা প্রচলিত হলে আমরা কোন অংশে ইংরাজ জাতি অপেক্ষা হীন থাক্‌তাম না।

মন্দা। (স্বগত) যমের অরুচি।

(ঝির প্রবেশ)

ঝি। মা ঠাকুরুণ! খোকাবাবু কাঁচ্চে।

মন্দা। আমি যাই। (উঠিয়া প্রস্থান)।

অবলা। (বিরক্তি সহকারে) ঐ উয়োম্যান্‌টা ভদ্রলোকের বাড়ীতে থাকার অনুপযুক্ত। লেডি-কে বলে মা-ঠাকরুণ! শেম্‌! বেবিকে বলে খোকা! ফাই! তারপর ড্রয়িংরুমে এসে লেডিকে ডেকে নেওয়া! দি আইডিয়া!!

প্রিয়নাথ। (মাথা চুলকাইয়া) তা মাপ কর্বেন।

অবলা। আর একদিন আসা যাবে; আজ মিষ্টার ডসের সঙ্গে Wild হটেলে যাবার কথা আছে। (দরজার দিকে তাকাইয়া) ঐ যে মিষ্টার ডস্‌ আসছেন। কাম্‌ ইন্‌ মিষ্টার ডস্‌!

(ভোলানাথ দাসের প্রবেশ; এবং একে একে সকলের সঙ্গে হা-ডুডু; এবং সকলের প্রত্যুত্তরে হা-ডুডু।)

বঙ্গবিভাগ এবং এই বিভাগ-জনিত সরকারী মনোভাব ও অত্যাচার সে-সময়ের আরো কয়েকজন বিখ্যাত কবির মতো বিজয়চন্দ্রের কবিসত্তাকেও নিদারুণ আঘাত করেছিল। এই আঘাতের বেদনার মধ্যে দিয়ে অনেকগুলি কবিতার জন্ম। আবার দেশের তদানীন্তন রাজনৈতিক ঘটনা বা জাতীয় দোষ-ত্রুটি নিয়েও তিনি কয়েকটি বিদ্রূপাত্মক কবিতা লিখেছেন। প্রবাসীতে তাঁর এই ধরণের ছটি কবিতা প্রকাশিত হয়। 'লাট-বিদায়' (অগ্রহায়ণ, ১৩১২), 'আয়, আজি আয় মরিবি কে!' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৩), 'এ জগতে যদি বাঁচিবি' (আষাঢ়, ১৩১৩), 'ঠিক বলেছ' (পৌষ, ১৩১৩), 'মনের কথা' (বৈশাখ, ১৩১৪) এবং 'অগ্নিমন্ত্র' (শ্রাবণ, ১৩১৪)। এই ছটি কবিতার মধ্যে তিনটি বিদ্রূপাত্মক এবং তিনটি বীররসাত্মক। প্রথমে বীররসাত্মক কবিতাগুলির নিদর্শন দিচ্ছি। নির্ভীক স্বদেশ-নিষ্ঠায় এবং প্রগাঢ় আবেগময়তায় এগুলি প্রথম শ্রেণীর দেশাত্মবোধক

কবিতার মধ্যে গণ্য হতে পারে। চরমপন্থীদের মনোভাবের সঙ্গে কবির মনোভাবের খুব মিল আছে।

দেশের শত্রু নিধন করে বীরের মতো মৃত্যু বরণ করার জন্যে কবি দেশবাসীকে আহ্বান জানাচ্ছেন,

পিশিতে অস্থি শোষিতে রুধির,
নিশীথে শ্মশানে পিশাচ অধীর।
থাকিতে তন্ত্র সাধন-মন্ত্র
প্রেত ভয়ে, ছি ছি, ডরিবি কে ?
মড়ার মতন না লভি মরণ
সাধকের মত মরিবি কে ?
আয়, আজি আয় মরিবি কে !
অসুর নিধনে কিসের তরাস ?
পশুর নিনাদে তোরা কি ডরাস ?
না গণি বিজন কানন ভীষণ
বিষম বিপদ বরিবি কে ?
নিষ্ঠুর অরি সংহার করি
বীরের মতন মরিবি কে ?
আয়, আজি আয় মরিবি কে !

('আয়, আজি আয় মরিবি কে !')

'এ জগতে যদি বাঁচিবি'-কবিতাটিও এই জাতীয়; কবি এতে জাতীয় চরিত্রের হীনতার কথাও উল্লেখ করেছেন,

ছি ছি মিথ্যা গরিমা গাহিয়া,
নিজে আত্ম-মহিমা কহিয়া,
হইবি শ্রেষ্ঠ ভবে কি ?
ওড়ে ফুৎকারে কিরে হীনতা ?
তেজ ধিক্কারে নিজ নীচতা ;
গুরু-বচন-দম্ভে হবে কি ?

হইতে উচ্চ শুধু কি তুচ্ছ
বচনগুচ্ছ রচিবি ?
কর্মের পর নির্ভর কর্
এ জগতে যদি বাঁচিবি।
সহি চরণ দলন, ধীরতা ?
করি বেদনে রোদন, বীরতা ?
কাজ কিরে ভীরু বড়াইয়ে ?
সহে ভীষণ তাড়ন, মানুষে ?
হলে পাষাণ পীড়ন, সান্দ্র সে
দেয় অগ্নির কণা ছড়ায়ে।
মায়ের আশিস্ লভিতে পারিস্
শূর সম যদি রাজিবি।
মায়ের উপর নির্ভর কর্
এ জগতে যদি বাঁচিবি।

'অগ্নিমন্ত্র' বিজয়চন্দ্রের আর একটি অগ্নিগর্ভ কবিতা। 'আয়, আজি আয় মরিবি কে'—কবিতাটির সঙ্গে এর ভাবগত মিল থাকলেও এটি আরো উগ্র ধরণের। সরকারী অত্যাচার কবিকে যে কি পরিমাণ বিক্ষুব্ধ করেছিল তার পরিচয় কবিতাটির প্রতিটি ছত্রে ফুটে উঠেছে। নৃতত্ত্ববিদ্ কবির প্রারম্ভিক বক্তব্য সমেত সম্পূর্ণ কবিতাটি উদ্ধৃত হল।

(আর্যেরা প্রাচীন কালে অনার্যদিগকে কি প্রকার তাড়না করিতেন, তাহাতে মতভেদ আছে। কিন্তু গণ্ড-শবরাদি জাতির মধ্যে এখনও যে প্রকার ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষ, তাহাতে তাড়না অস্বীকার করা যায় না। গণ্ডাদি জাতির লোক কদাচ ব্রাহ্মণের জল পর্যন্ত স্পর্শ করে না। অনার্যদিগের শরীরে কিছু কিছু আর্য চিহ্ন দেখিয়া ফরসাইথ্ সাহেব আর্য-কৃত অনেক পাপ অনুমান করেন। নিম্বপুরম্ ও বুড়িগুণ্ঠ (বেলেরি) প্রভৃতি স্থানের বিশাল ভগ্নস্তূপ হইতে অনার্য-নাশ অনুমিত হয় (J. R. A. S. 1899)। অনার্যেরা ভস্মে বিষ বিকীর্ণ করিয়া আর্য-সমাজ জর্জরিত করিতেছে; এইরূপ কল্পনায় কবিতাটি লিখিত। স্বদেশী আন্দোলনের দিনে এই বিরোধী কথা পড়িতে অরুচি হইবে কি ?)

(১)

হবে পরীক্ষা তোমার দীক্ষা
অগ্নি-মন্ত্রে কি না ?
তৃণ বলি তোরে গরবে হেলায়
দলিতেছে অরি চরণ তলায় ;
পোড়াতে অরিকে পুড়িয়া মরিতে
পারিবি কি না ?
দগ্ধ ভস্মে গ্রাসিতে বিশ্ব
পারিবি কি না ?
লভ গো মৃত্যু জিনিতে শত্রু
যে করে তোমারে ঘৃণা :
তবে পরীক্ষা তোমার দীক্ষা
অগ্নি-মন্ত্রে কি না ।

(২)

ভীষণ-কান্তি আসিছে মরণ
মহা অরণ্যে করি বিচরণ ;
কৃষ্ণ হস্তে শাণিত অস্ত্র
ধরিবি কি না ?
নাশিয়া অরির ঘৃণিত শরীর
মরিবি কি না ?
পাশব আচার নিষ্ঠুরতার
নিশ্চয় আছে সীমা ।
কর পরীক্ষা তোমার দীক্ষা
অগ্নি-মন্ত্রে কিনা ।

(৩)

ধেয়ে আয় যারা মরিতে পারিস্,
শ্মশানের ধূমে বিলাইতে বিষ,

মরণে আদেশ দিতেছে স্বদেশ,
পালিবি কি না ?
সৃজি হলাহল শোণিত তরল
ঢালিবি কি না ?
জাগে অপমান বিন্ধ্য সমান ;
ঘোচে কি মরণ বিনা
আজি পরীক্ষা তোমার দীক্ষা
অগ্নি-মন্ত্রে কি না।

পরবর্তী যুগে কাজী নজরুলের হাতে যে অগ্নি-বীণা বেজে ওঠে এই কবিতায় সেই সুরেরই পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে। স্বদেশী-যুগে বিশেষ করে তিনজন কবির কবিতায় এই সুর-ঝঙ্কার সুস্পষ্ট—গোবিন্দচন্দ্র দাস, বিজয়চন্দ্র মজুমদার এবং কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত। তবে এঁদের কবিতার সঙ্গে নজরুলের কবিতার সুরের মিল থাকলেও একটা প্রকৃতি-গত পার্থক্য আছে। স্বদেশী-যুগের কবিতাগুলিতে দেশ ও কালের প্রভাব সীমিত। বঙ্গবিচ্ছেদ এবং এই বিচ্ছেদ-বেদনাই কবিদের প্রেরণা দিয়েছে, তাঁদের অনুভূতির পরিমণ্ডল রচনা করেছে। তাই দেখা যায়, বিভক্ত বঙ্গের পুনর্মিলনের পর থেকে এ ধরনের কবিতা রচনার প্রয়োজনও তাঁরা আর অনুভব করেন নি। অবশ্য তার আগে থেকেই এ ধরণের কবিতা সংখ্যায় অনেক কমে এসেছিল ; তার একটি কারণ গুপ্ত-সমিতির ক্রিয়াকলাপের মধ্যে দিয়ে স্বদেশী-আন্দোলনের রূপ-পরিবর্তন এবং তার ফলে সরকারী অত্যাচারের নিষ্ঠুরতা বৃদ্ধি। লেখার মধ্যে দিয়ে তখন যাঁরা দেশবাসীর মনে উত্তেজনার আগুন ছড়াচ্ছিলেন, তাদের কৃষ্ণ হস্তে শাণিত অস্ত্র ধারণ করতে প্রেরণা দিচ্ছিলেন তাঁরা এর পরিণতি সম্বন্ধে খুব ওয়াকিফহাল ছিলেন বলে মনে হয় না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে নিতান্ত সীমিত প্রয়োজন-বোধের মধ্যেই এগুলির জন্ম হয়েছিল।

কিন্তু নজরুলের কবিতাগুলির প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাঁর অনুভূতির পরিমণ্ডল অনেক ব্যাপক—সেখানে, জাতীয়-জীবনের নানা স্তরে পুঞ্জীভূত পাপ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন জ্বলেছে ; ভারত-মনের বেদনার উগ্র রসে কবি-হৃদয়ের পাত্রটি ভরপুর।

সে-সময়ে কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ছিলেন ব্যঙ্গ কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্ত। তাঁর

পূর্ব্ববঙ্গে গজারোহণ।

পূর্ববঙ্গের ছোটলাট [illegible] শাসন-সম্বন্ধায় একটি ব্যঙ্গচিত্র। প্রবাসী শ্রাবণ ১৩১২

প্রভাবে তখন অনেক কবিই এই ধরনের কবিতা রচনায় হাত দিয়েছিলেন ; কিন্তু যাঁরা হাত পাকিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এবং বিজয়চন্দ্র মজুমদার। প্রবাসীর পৃষ্ঠায় বিজয়চন্দ্রের যে তিনটি স্বাদেশিকতামূলক ব্যঙ্গ কবিতা প্রকাশিত হয় এখানে সেগুলির পবিচয় দেওয়া হল। তাঁর কবিতায় দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাবকে স্বীকার করে নিয়েও এ কথা বলা চলতে পারে যে বিজয়চন্দ্রের শক্তিমান কবি-সত্তা এগুলিকে কিছুটা স্বাতন্ত্র্য দান করেছে।

পূর্ববঙ্গে তখন ফুলারী অত্যাচার পুরোদমে চলেছে। কিন্তু তদানীন্তন বড়লাট লর্ড মিণ্টো এবং ভারত-সচিব লর্ড মর্লি ফুলার সাহেবের এই অত্যাচার-প্রবণতাকে মেনে নিতে পারেন নি। একবাব লাট ফুলার সিরাজগঞ্জের কয়েকটি ছেলেকে রাষ্টিকেট করার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে অনুরোধ করে পাঠান। বড়লাট লর্ড মিণ্টো ফুলার সাহেবের এই আচরণকে সমর্থন না করে তাঁকে জানান তিনি যেন এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে লেখা তাঁর চিঠিটি প্রত্যাহার করেন। ফুলার সাহেব উল্টো সুর ধবে বললেন, তাঁর এ চিঠি বিবেচিত না হলে তিনি পদত্যাগ করবেন। চিঠি বিবেচিত হল না ; তিনি পদত্যাগ-পত্র পেশ করলেন, এবং ভারত-সচিব মর্লি সাহেবও তা সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জুর করে নিলেন। লর্ড মর্লির এই সুমতির পিছনে ভয়, না কূটনৈতিক ভাবনা কাজ করেছিল তার বিচার এখানে অবান্তর। লাট ফুলারের এই পদত্যাগ উপলক্ষে বিজয়চন্দ্র লেখেন 'লাট-বিদায়'। কবিতাটির দুটি ভাগ—'গুণস্তুতি' এবং 'এড্রেশ্'।

'গুণস্তুতি'র কিছুটা অংশ,

সামনীতিতে সমতল তিব্বতে পর্বত ,
দনের পুণ্যে উড়ে গেল দেশের সম্পদ ,
ভেদনীতিতে করে খেদ মূর্খগুলো বঙ্গে ,
দণ্ডনীতির গণ্ডগোল জঙ্গীলাটের সঙ্গে।
কে যে বড় কে যে ছোট কেমন ক'রে বুঝি ,
উনিশ বিশ নাহি মানি, তুল্যরূপে পূজি।
চারিনীতির উপরেতে ত্রিনিটির খেলা ;
রাইট্ হ্যাণ্ডে উপযুক্ত লেফ্টেনেণ্ট চেলা।

* * * * *

পবিত্র আত্মার ঘু ঘু ভিটেয় করি পেশ,
উদ্ধারেন ছোটকর্তা আমাদের দেশ।
গুপ্তদেবের ভাষাতত্ত্বে কূল নাহি পাই ;
শাল্‌গিরামের শোয়া বসা, দুঃখ কিছু নাই।

'এড্‌রেশ্‌' অংশটি সম্পূর্ণই উদ্ধৃত হল,

কত্তা তুমি চল্লে ঘরে নেহাল করি দেশ ;
রচি তব কীর্তিকল্পে কাব্যে এড্‌রেশ্‌।
জঙ্গী বেটার সঙ্গে যুঝি কর্ম হ'ল ঠাণ্ডা ,
নইলে সবাই বুঝত তুমি কত বড় বান্দা।
গর্‌গরিয়ে রাগের চোটে ইস্তফাটি পেশ্‌ ;
রইল কিন্তু আস্ত সেই কেশী-নরের কেশ।
জবরদস্তের সঙ্গে নাহি উঠতে পার এঁটে ;
নরম কাঠের ছুতোর তুমি, গেলে বঙ্গে কেটে।
কলেজ বয়ের ভয়ে তোমার ইস্তাহারের ধুম ;
রজনীতে ক'দিন ভায়া হয় নি তোমার ঘুম ?
ঘরে গিয়ে পরের ভাবনা কোরো নাক আর ;
রেখে গেলে যতটুকু এই ত চমৎকার।
গিয়ে দেশে ভুলে যেয়ো কাশ্মীরের স্বর্গ।
এড রেশের প্রথমাক্ষর পড় পাঠক-বর্গ।

কবিটি তোমার ভক্ত বুঝহ ইংগিতে,
ঘোষিল অতুল কীর্তি বিজয়-সঙ্গীতে।

ভারতের অতীত গৌরবের দোহাই দিয়ে সে-সময় আমরা অনেকেই কর্মহীনতা আর নিশ্চেষ্টতার মধ্যে সান্ত্বনা পেতে চেষ্টা করেছিলাম। তাই ইংরেজকে ম্লেচ্ছ বলে গালি দিয়েছি আর তাদের অসাধারণ কর্মশীলতাকে অশিষ্টাচার বলে ধিক্কার দিয়ে নিজেদের আলস্যকে সাত্ত্বিকতায় মণ্ডিত করেছি। কবি এই আত্মপ্রবঞ্চনার রূপটিকে চমৎকার ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর 'ঠিক বলেছ' কবিতায়।

তোমরা কর শ্রমের বড়াই
আমরা যে রে বাবু।

তুমি চাহ কর্ত্তে লড়াই
আমি তাহে কাবু।
তোমার খেলা ছুটাছুটি,
আমার খেলা গ্রাবু,
তোমার খাত্ত গোস্ত-রুটি
আমার পথ্য সাবু।
মোরা আর্য অতি শিষ্ট
তুমি বেটা ম্লেচ্ছ।
দুষ্ট লোকের নাহি ইষ্ট!
ঠিক বলেছ! হেঁচ্চো

তোদের ধর্ম্ম রজ-তম
মোরা অতি সাত্বিক্;
তোদের মূর্তি অসুর-সম,
মোরা রূপে কার্তিক।
পা-উঁচিয়ে কর রোষ,
ঘন ঘন মার কিক্;
আইন খুলে তস্য দোষ
দেখাই মোরা তার্কিক।
আর্য যাবে স্বর্গে হেঁটে;
তোরা দেবের ত্যাজ্য;
মবি খালি রাজ্য ঘেঁটে।
ঠিক বলেছ! হেঁচ্চো।

জানিস্? যখন ছিলি বনে,
কবুল এই জাতে কি?
ধনী হ'য়ে মোদের ধনে
লড়বি মোদের সাথে কি?

আছে প্রাচীন ঘিয়ের ভাঁড়
নাই থাকুক তাতে ঘি ;
খাচ্চি এখন ভাতের মাড়
দেখ্‌বি পরে পাতে কি !
শাস্ত্রগুলো করি জড়
ভাবলে কথা ন্যায্য,
বুঝবি মোরা কত বড় !
ঠিক্ বলেছ ! হোচ্চো ।

'মনের কথা' কবিতাটিও এই জাতীয় । তবে এটি রাজনৈতিক ঘটনার পটভূমিতে রচিত । যশের কাঙ্গাল, কথা-সর্বস্ব বাঙালীর অন্তরের দীনতাকে ফুটিয়ে তোলাই কবির উদ্দেশ্য । কিন্তু 'মনের কথা বল্লে খুলে লোকে বলবে পাগোল ।' তাই,

যা হোক, রাখি ঢাকা-চাপা,
দেখাই যে সে ভিতর ফাঁপা ।
কুমড়া বলি দিয়ে বলি দুর্গা খেলেন ছাগল ।
বলি পটল, ভাজি ঝিঙ্গে ;
বলি জাহাজ, চালাই ডিঙ্গে ;
ঝোলাই লম্বা কোঁচা, তবে ছুঁচো করে যা গোল্ ।
'কালো কুত্তি' লাগায় বেটন্
দেহের মাংস করি মাটন্ ;
ভ্যা-ভ্যা চেপে হালুম্-ডাকে তবু উঁচাই খাবোল্ ।
অগ্নি মোদের খ্যাতি রটে ;
হলেও গ্রাম্য, সিংহ বটে !
পিঠের দাগ ঢেকে পিটি আত্মযশের মাদল্ ।
পরের দড়ায় পাকে ভ্রমি
লাটিম সম 'অটনমি'
হচ্ছে বটে ; কিন্তু ঘটে জাগছে শক্তি আসল্ ।
খুঁজি বটে গর্তে বাসা
আত্ম-শক্তি আছে খাসা
বিপত্তিতে মাচার তলে খোকার মায়ের আঁচল্ ।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩২) : প্রভাতকুমার বাংলার সাহিত্য-জগতে স্বনামধন্য। গোড়ার দিকে কিছু কিছু কবিতা লেখা অভ্যাস করলেও কৃতিত্ব অর্জন করেছেন গদ্য-রচনায়। গল্পকার এবং ঔপন্যাসিক হিসাবেই তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয়। প্রবাসী ও ভারতীতে তাঁর বহু রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। আমাদের নির্দিষ্ট সময়-সীমার মধ্যে তিনি প্রবাসীতে স্বাদেশিকতা-মূলক একটি প্রবন্ধ ও তিনটি গল্প লেখেন। মাঝে মাঝে প্রয়োজনের তাগিদে দুএকটি ছাড়া প্রভাতকুমার প্রবন্ধ বিশেষ লেখেন নি। তাঁর 'সর্ব-বিষয়ে স্বদেশী' নামক প্রবন্ধটি ১৩১৩ সালের কার্তিক সংখ্যার প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে স্বদেশী সম্বন্ধে বিলাত-প্রত্যাগত ব্যারিষ্টার তাঁর যে মত প্রকাশ করেছিলেন তা আমাদের অনেকেরই জাতীয়-সংস্কারের ওপর কঠিন আঘাত হেনেছিল। চার মাস পরেই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর এই প্রবন্ধের তীব্র সমালোচনা করে লিখেছিলেন 'বিজাতীয় রকমে স্বদেশোন্নতি' (ফাল্গুন, ১৩১৩)।

স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে একটা ভাব খুবই প্রবল হয়ে ওঠে। সেটা হল—অশনে-বসনে, আচারে-ব্যবহারে, সমস্ত ব্যাপারেই স্বদেশী হওয়া দরকার। কিন্তু তবু বিপরীত ভাবের চিত্রটিও নিঃসংকোচে ফুটে উঠতে থাকে। ইংরেজের হ্যাট-কোট আর শুধু বিলাত-প্রত্যাগতদের মধ্যেই মর্যাদা পেল না, দেখা গেল, "অনেক রাজা, জমিদার, উচ্চপদস্থ ব্যক্তি হ্যাট-কোট ব্যবহার করিতেছেন, টেবিলে বসিয়া ফয়জু খানসামার হস্তপক্ক খানা খাইতেছেন এবং অন্যান্য আচারেও 'সাহেব' হইতেছেন।" এ কাজটা কতখানি গর্হিত তার বিচার করতে গিয়ে এই প্রবন্ধে প্রভাতকুমার যে মত প্রকাশ করলেন দেশাত্মবোধের দিক থেকে তা রিঅ্যাক্‌শনারি মনে হতে পারে। প্রথমেই তিনি মন্তব্য করলেন,

> এই যে বন্দেমাতরম্—অর্থাৎ patriotism—অর্থাৎ স্বদেশপ্রীতি ইহার জন্য আমরা পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার নিকট ঋণী। পূর্বে আমরা রাজার জন্য যুদ্ধ করিয়াছি, ধর্মের জন্য মাথা দিয়াছি—কিন্তু দেশের জন্য প্রাণদান, এ ভাব আমাদের মনে পূর্বে ছিল কি ? আমি ত কোথাও দেখিতে পাই না;…দেশ যে মা ইহা আমরা কস্মিন্ কালেও জানিতাম না। বঙ্কিমবাবুকে মুখপাত্র করিয়া পাশ্চাত্ত্য সভ্যতালক্ষ্মীই আমাদিগকে এ মধুর বাণী শুনাইলেন।

প্রভাতকুমার বললেন, 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী' এই উক্তির মধ্যে রামচন্দ্রের যে দেশভক্তি অভিব্যক্ত হয়েছে সেটা নিছক অযোধ্যাপ্রীতি, দীর্ঘ প্রবাসের পর ঘর-মুখী মনের হৃদয়োচ্ছ্বাস। তাছাড়া জন্মভূমিকেও তিনি জননী বলেন নি; কারণ, "একটা 'চ' থাকিয়া জননীকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং জননী অর্থে যে কৌশল্যা দেবী তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই।"

লেখকের মতে স্বদেশকে উন্নত করে তুলতে হলে বিদেশের সঙ্গে শিক্ষা-সংস্কৃতিগত সম্বন্ধ স্থাপন অপরিহার্য। আর এই সম্বন্ধ স্থাপন করতে গেলে অনেক স্বদেশী আচার অনুষ্ঠান বা সংস্কার আমাদের পক্ষে বজায় রাখা সম্ভব নয়। জাতীয় উন্নতির জন্যে বিদেশের নানা জিনিসকেই যদি আমাদের গ্রহণ করতে হয়, তাহলে আর বিদেশী পোষাককে এত ঘৃণা করার কী আছে।

> পশ্চিমের হাতিই যদি গলিয়া গেল তবে মশাগুলিকে লইয়া এত টানাটানি কেন?···আজ বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে বাঙালীর শীতল শোণিতে উত্তাপ সঞ্চারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তাই কোঁচায় আর সুবিধা হয় না। কোঁচা অদৃশ্য হইল। পদদ্বয় স্বাধীন হইল। আজিকার এই মাল-কোঁচা আগামীকল্যের প্যাণ্টালুনেরই পূর্বপুরুষ।[১৪]

এই প্রবন্ধের শেষেই সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভাতকুমারের বক্তব্য সম্বন্ধে কয়েকটা প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি জানতে চেয়েছেন, গ্রীষ্মকালে সোলার টুপী আরাম দিলেও অন্য ঋতুতে পাগড়ী কি বেশি আরাম দেয় না? নেক্‌টাই বস্তুটার কি কোন প্রয়োজন আছে? প্রাকৃতিক অবস্থা ও স্বাস্থ্য অনুযায়ী সাহেবী পোষাক আমাদের কি উপযোগী হবে? তা ছাড়া নানা অঙ্গ-সম্পন্ন সাহেবী পোষাক পরতে চাইলেও কি সামলানো যাবে? দেশ আমাদের দরিদ্র নয়? আর সব চেয়ে বড় প্রশ্ন দেশের শিক্ষিত লোকেরা যদি সবাই সাহেব সেজে অশিক্ষিত অনুন্নত হাজার হাজার দেশবাসীর উপকার করার উদ্দেশ্য নিয়ে তাদের ঘনিষ্ঠ হতে চান তাহলে কি তাঁরা ব্যর্থ হবেন না? কারণ সাহেবী

১৪ ব্যবহারিক প্রয়োজনবোধের তাগিদে আজ দেশের মধ্যে কোট-প্যাণ্টের ব্যাপক প্রচলন দেখা দিয়েছে। অবশ্য সেকালে সাহেবী পোষাক পরার সময় যেভাবে পোষাকের প্রত্যেকটি অঙ্গের মর্যাদা রক্ষা করা হত আজ তা না করলেও চলে; বিশেষ করে নেক্‌টাই ব্যবহার না করাটা সম্পূর্ণভাবেই মার্জনীয়। তাই সেদিনের মালকোঁচাকে আজকের প্যাণ্টালুনের পূর্বপুরুষ বলতে আর বাধা নেই। প্রভাতকুমারের ভবিষ্যদ্‌দৃষ্টি আমাদের বিস্মিত করেছে।

পোষাক-পরা লোককে তারা যে সহজে নিজের লোক ভাবতে পারবে না, এত খাঁটি কথা। তাই রামানন্দ পরিষ্কার ভাষাতেই জানতে চাইলেন, "সাহেবী পোষাক পরিলে ঘুষি মারার সুবিধা হইতে পারে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে জাতীয় ঘনিষ্ঠতা লাভ বাঞ্ছনীয়তম জিনিস কিনা।"

রামানন্দের এই প্রশ্নগুলি সংস্কারমুক্ত বাস্তবদৃষ্টির ওপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু প্রভাতকুমারের এই প্রবন্ধটির সমালোচনা করতে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধে এমন কতকগুলি মন্তব্য করেছিলেন যেগুলি সমর্থন করা যায় না।

প্রভাতকুমার লিখেছিলেন, সমগ্র দেশকে 'মা' বলে সম্বোধন করার শিক্ষা আমাদের কাছে নতুন। তাঁর এই ধারণার প্রতিবাদ করতে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথ লিখছেন,

> এই কথাই যদি ঠিক হয় তবে যশোরেশ্বরী, চিতোরেশ্বরীর স্থান কোথায়? রাজলক্ষ্মী গৃহলক্ষ্মীতেই বা প্রভেদ থাকে কেমন করিয়া! দেবী জগদ্ধাত্রীকে না রাখিলেও চলে, অসুর-পীড়িতা বসুন্ধরাকে উদ্ধার করিতে বিশেষ বিশেষ অবতারের কোন আবশ্যকই হয় না।

কিন্তু সমস্ত দেশ বলতে প্রভাতকুমার সর্বভারত বোঝাতে চেয়েছিলেন; এবং এই সর্বভারতীয় ঐকচেতনা আমরা প্রকৃতই উনিশ শতকের নবজাগরণের মধ্যে দিয়ে লাভ করেছি। যশোরেশ্বরী, চিতোরেশ্বরী, রাজলক্ষ্মী, গৃহলক্ষ্মী প্রভৃতির সঙ্গে ভারতলক্ষ্মীর একটা আকৃতি-প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে— একথা প্রভাতকুমার পরিষ্কার ভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন। আর এক জায়গায় অবনীন্দ্রনাথ মন্তব্য করছেন,

> আমি তো বলি, 'বন্দেমাতরম্' বিলাতী বলিয়া হয় তো চলিয়া যাইত যদি ঐ 'রং'-টুকু না থাকিত। মিষ্টার মুখার্জি 'বন্দেমাতরমের' গায়ে বিলাতী 'রম্'-এর গন্ধ পাইয়াছেন কেমন করিয়া এবং সেরূপটা হইলে সেটাকে মহারত্নবোধে আমাদের বক্ষে ধরিতে বলেন কি জন্য জানি না, সহজ বুদ্ধিতে এই বুঝি যে বিলাতী হইতে দেশীয়ের উদ্ভব 'ওক্' গাছে আম্রফলের ন্যায় রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সুসাধ্য হইলেও প্রকৃতির নিয়ম-বিরুদ্ধ।

এখানেও অবনীন্দ্রনাথ প্রভাতকুমারকে একটু ভুল বুঝেছেন বলে মনে হয়। অবনীন্দ্রনাথ বন্দেমাতরমের যে-রংটুকুকে 'স্বদেশী' বলেছেন সেটা আমাদের হৃদয়ের রং হলেও পাশ্চাত্ত্য প্রভাবেই যে সে রং আমাদের হৃদয়ের গায়ে ধরেছিল

আজ আর তা অস্বীকার করার উপায় নেই। অবশ্য প্রভাতকুমারও যে তাঁর ধারণার দিক থেকে একেবারে অভ্রান্ত এ কথাও বলা চলে না। রামানন্দ এ সম্বন্ধে যে প্রশ্নগুলি উত্থাপন করেছিলেন সেগুলি খুবই যুক্তিসংগত। আবার অবনীন্দ্রনাথও তাঁর প্রবন্ধের শেষের দিকে দেশকে বাঁচিয়ে তোলার জন্যে যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, সে যুগের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে তার বিশেষ গুরুত্ব ছিল।

গল্পকার প্রভাতকুমার সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে শ্রদ্ধাস্পদ ডাঃ সুকুমার সেন বলেছেন, "সমসাময়িক সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আন্দোলনও প্রভাত-কুমারের গল্পে ঢেউ তুলিয়াছে। বিধবা-বিবাহ, অসবর্ণ-বিবাহ, স্বদেশী আন্দোলন, বোমা, ডাকাতি, নন্ কোঅপারেশন্—সবই তাঁহার গল্পের রস ও রসদ যোগাইয়াছে।"[১৫]

স্বদেশী আন্দোলনের ব্যাপার নিয়ে লেখা তাঁর তিনটি গল্প প্রবাসীতে ছাপা হয়—'খালাস' (ভাদ্র, ১৩১৪), 'উকিলের বুদ্ধি' (কার্তিক, ১৩১৪) এবং 'হাতে হাতে ফল' (শ্রাবণ ১৩১৫)।[১৬]

'খালাস' গল্পটি বেশ বড়, আর তার প্লটও সম্পূর্ণ 'স্বদেশী'। কিভাবে একজন ডেপুটি স্বদেশী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এবং স্বদেশী-ব্রতধারিণী তাঁর স্ত্রীর উৎসাহে ডেপুটিগিরি পরিত্যাগ করলেন তারই কাহিনী।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় পূর্ববঙ্গের এক উকিলবাবু ফুলার সাহেবকে সংবর্ধনা জানিয়ে এবং ইংরেজ-প্রীতির ভান দেখিয়ে কিভাবে একটা ডেপুটিগিরি আদায় করে নেন সেই ঘটনাই 'উকিলের বুদ্ধি' গল্পের বিষয়বস্তু।

'হাতে হাতে ফল' একটি চমৎকার গল্প। গল্পটির ঘটনাসংস্থান সুনিপুণ এবং চরিত্রগুলিও বেশ জীবন্ত হয়ে উঠেছে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় সরকার পক্ষ থেকে মিথ্যা সাক্ষ্য আদায় করা হত নানা প্রকারে। অনেক সময় অনেক নির্দোষ শিক্ষিত ভদ্রসন্তানকে সরকার পক্ষের সাক্ষী হবার জন্যে সোজাভাবে রাজী করাতে না পেরে লাঞ্ছিত করা হত। এই গল্পের সরকারী ডাক্তার হরগোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ওপর ঐরকম একটা মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার

---

১৫ 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ডাঃ সুকুমার সেন, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-৪৮।

১৬ এই গল্পগুলি লেখকের 'দেশী ও বিলাতী' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। প্রকাশ—১৩১৬

জন্যে পীড়াপীড়ি করা হয়। হরগোবিন্দ অন্তরে ছিলেন স্বদেশী ও সত্যনিষ্ঠ। একটি সাহেবকে মারপিট করার মামলায় বাঙালী দারোগা হরগোবিন্দকে মিথ্যা সাক্ষ্য দেবার জন্যে অনুরোধ করে। হরগোবিন্দ তার আচরণে ক্ষুপ্ত হয়ে তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দেন। দারোগা হরগোবিন্দের দুই নির্দোষ পুত্রকে হাজতে পাঠিয়ে প্রথমেই এই অপমানের প্রতিশোধ নেয়। তারপর হরগোবিন্দকে লাঞ্ছিত করার জন্যে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করে তাঁর বাড়ী খানা-তল্লাসী করার জন্যে অনুমতি আদায় করে। হরগোবিন্দের বাড়ী তল্লাসী করতে গিয়ে ওষুধের আলমারী থেকে ভ্রান্তি মনে করে দারোগা কী-যেন একটা পদার্থ পান করে। হরগোবিন্দ তখন রান্নাঘরে, যেখানে মেয়েরা তখনকার মতো আশ্রয় নিয়েছিল, তার দরজা পাহারা দিচ্ছিলেন। সেই দিন রাত্রেই দারোগা সাংঘাতিক অসুস্থ হয়ে পড়ে; তখন দারোগাগিন্নি এসে হরগোবিন্দের পায়ে ধরে নিয়ে যায় স্বামীর প্রাণ রক্ষা করার জন্যে। সে-যাত্রা দারোগা রক্ষা পায়। দারোগার নীচতা, স্বার্থপরতা, আর বিদ্যাবুদ্ধির প্রমাণ হরগোবিন্দের বিরুদ্ধে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে তার চিঠি। এখানে চিঠিটি উদ্ধৃত হল। তখনকার বহু দারোগার সাধারণ চরিত্রটি এতে বেশ প্রতিফলিত হয়েছে।

বিচারপতী!

হুজুরের হুকুম মোতাবেক সাহেব মারা মোকর্দ্দমার তদন্ত করিতে করিতে আর দুই আসামীর নাম প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে অজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শুসীলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইহাদের পীতা সরকারী ডাক্তার হরগোবীন্দ চট্টোপাধ্যায় হয় অজয়চন্দ্র অতী দুর্দ্দান্ত বেক্তী কলিকাতায় শুরেন্দ্রবাবুর কলেজে অধ্যায়ন করে প্রকাশ তাহারই হুকুম স্বত্রে অন্যান্য আসামীগণ শাহেবকে মাইরপীট করিয়াছে দুইজনকে ৫৪ ধারা অনুসারে অদ্যই ধৃত করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছী।

২। বিসেস তদন্তে আরও জানিয়াছী উক্ত অজয়চন্দ্র কলিকাতা বীডিন স্কোয়ার হাঙ্গামাতেও লীপ্ত ছিল সে এখানে আসিয়া একটি লাঠীখেলা সমিতী স্থাপন করিয়াছে তাহাতে স্থানীয় অনেক লোক চাঁদা দেয় ডাক্তারের ছোট পুত্র শুসীলচন্দ্র অল্প বস্ক হইলেও অত্যন্ত দুষ্ট সে এখানে অনেক বালক লইয়া একটি ঢীল ছোঁড়া সমিতী স্থাপন করিয়াছে উদ্দেশ্য সাহেব মেম দেখিলেই ঢীল ছুঁড়িবে।

৩। গোপন অনুসন্ধানে জানিলাম উক্ত ডাক্তারের বাসায় সাহেব মারা রক্তাক্ত লাঠী প্রভিতী লুক্কাইত আছে লাঠীখেলা সমিতীর চাঁদার খাতা মেম্বরের তালিকা দৃষ্টে অনেক আসামী আস্কারা হইতে পারে বিধায় প্রার্থনা ক্ষৌঃ কাঃ বিঃ ৯৬ ধারা অনুসারে উক্ত হরগোবীন্দ ডাক্তারের বাটী খানাতল্লাসী করিতে ছার্চ্চওয়ারেণ্ট দিয়া শুবিচার করিতে আগ্যা হয়।

আগ্যাধীন

শ্রীবদনচন্দ্র ঘোষ

এছাই[১৭]

১ দফা প্রকাশ থাকে যে উক্ত হরগোবীন্দ ডাক্তার সদেসীর বিসেস শ্বপক্ষ দেশী চিনী ও করকচ নবন সব্বদা আহার করে স্থির বেনামীতে ভারত কটন মীলে ৫ শত্ত টাকার সেয়ার খরিদ করিয়াছে তাহাতে পুত্রগণ আসামী কদাচ সত্য কথা বলিবে না এ মতে তাহাকে সাক্ষী করিয়া পাটাইতে সাহস করি না।

২ দফা আরো প্রকাশ থাকে পরম্পরায় স্থনিলাম উক্ত হরগোবীন্দ বলিয়াছে আমি জজ মাজিষ্টরকে গ্রাজ্য করি না।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৩৮)ঃ প্রথমেই বলা হয়েছে প্রবাসীর সঙ্গে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্বন্ধ ছিল খুবই ঘনিষ্ঠ। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি পত্রিকাটির সঙ্গে সহকারী-সম্পাদক হিসাবে যুক্ত ছিলেন। উপন্যাস ও ছোটগল্পের ক্ষেত্রে ইনিও বেশ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। অনেকেরই মতো ইনিও প্রথমে লিখতেন প্রবন্ধ ও কবিতা। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই চারুচন্দ্র সাহিত্য-ক্ষেত্রে নিজের চর্চার পথটি চিনে নিতে পেরেছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাব থেকে সেদিনের কোন সাহিত্যিকই বোধ হয় মুক্ত থাকতে পারেন নি। আন্দোলনের প্রচণ্ড তরঙ্গাঘাতে সেদিন অনেকেই প্রথমটা খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন। ফলে খুব শান্ত প্রকৃতির লেখকের হাত দিয়েও দুএকটা বীররসাত্মক লেখা বেরিয়েছে—বিশেষ করে কবিতা। প্রথম দিকে রচিত এবং প্রবাসীতে প্রকাশিত চারুচন্দ্রের এই ধরনের তিনটি কবিতার উল্লেখ

১৭ এছাই=S. I. (Sub-Inspector)

করছি—'অসির গান' (কার্তিক, ১৩১০), 'সুস্বপ্ন' এবং 'মাতৃযজ্ঞ' (অগ্রহায়ণ, ১৩১২)। ভাব-ভঙ্গির দিক থেকে তিনটি কবিতাই গতানুগতিক। তাই এখানে একটি কবিতার সামান্য অংশ উদ্ধৃত হল।

এ কিরে আজ বঙ্গ মাঝ পড়েছে সাড়াশব্দ,
সবার মুখে 'করব বিদেশ-বর্জন !'
জাগাল কেরে ডাকিয়া এরে ঘুমে যে ছিল স্তব্ধ,
বন্ধু কিরে, দুর্জন নয়, কর্জন ?
এ দুর্দিনে পশেছে কাণে মায়ের স্নেহ-আহ্বান,
জড়ের কিরে হয়েছে আজ চেতনা ;
আবার কিরে পেয়েছে ফিরে হারানিধির সন্ধান,
ঘুচাবে যাহে দীনা মায়ের বেদনা ?

('মাতৃযজ্ঞ')

স্বদেশী-আন্দোলনের ভিত্তিতে লেখা 'মা' নামে চারুচন্দ্রের একটি গল্প প্রকাশিত হয়েছিল ১৩১৫ সালের আশ্বিন সংখ্যায়। গল্পলেখায় চারুচন্দ্র তখন বেশ সুনাম অর্জন করেছেন। রচনাশৈলীর দিক থেকে এ গল্পটিও মন্দ নয় ; কিন্তু অন্য দিক থেকে এটির একটি বিশেষ মূল্য আছে। যে সময়ে গল্পটি ছাপা হয় তখন বাংলার চারিদিকে সাংঘাতিক বিশৃংখলা। ইংরেজ-সরকারের সঙ্গে তখন গুপ্তসমিতিগুলির টাগ্-অব্-ওয়র চলেছে ; একদিকে গুপ্তহত্যা, বোমা, ডাকাতি আর অন্যদিকে কারাদণ্ড, নির্বাসন, ফাঁসি। এই রকম রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এ ধরণের গল্প লেখা এবং ছাপান লেখক ও সম্পাদক উভয়ের দিক থেকেই কম দুঃসাহসিকতার পরিচয় নয়।

স্বদেশী-যুগে বাংলার এই নরম মাটীতেই এমন দুএকজন মায়ের আবির্ভাব ঘটেছিল যাঁরা ত্যাগে, নিষ্ঠায়, স্বদেশী-ব্রতচারণের দৃঢ়তায় আর সংস্কার-মুক্তিতে আদর্শ ছিলেন। তেমনি একজন মা দয়াঠাকুরাণী। বিধবা। একমাত্র পুত্র ষষ্ঠীচরণ। ষষ্ঠীর বাল্য-সখা মুসলমান জহর আলি। দয়াঠাকুরাণীর কাছেই মানুষ। দুজনে এফ্. এ. পাশ করল। ষষ্ঠী বললে বি. এ. পড়বে। জহর বললে পুলিশের দারোগা হবে। সে এখন অনুভব করলে যে সে পরের গলগ্রহ ; তাই রোজগার করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়। অথচ ষষ্ঠী বা দয়াঠাকুরাণীর

দিক থেকে জহরের এ ধরণের মনোভাব গড়ে ওঠার কোন কারণ দেখা যায় নি। যা হক জহর দারোগা হয়ে নবাবগঞ্জেই এল। নবাবগঞ্জ তখন স্বদেশীর একটা বড় আড্ডা। জহর অনেক বদ্‌লেছে এবং পুলিশের চাকরী নিয়ে স্বদেশীর সম্পূর্ণ বিরুদ্ধবাদী হয়ে উঠেছে। তাই নবাবগঞ্জে এসেই স্বদেশীওয়ালাদের ওপর সে অত্যাচার স্থুরু করল। চরম বিরোধিতা করল ভ্রাতৃতুল্য বাল্যসখা ষষ্ঠীচরণের সঙ্গে। কৌশলে সে ষষ্ঠীচরণকে এবং তার স্কুলের ছেলেদের গ্রেপ্তার করে হাজতে চালান করল। মা দয়াঠাকুরাণী হাজতে পুত্রের সঙ্গে দেখা করলেন।

ষষ্ঠীচরণ মাকে দেখিয়া ক্ষোভে রোষে উত্তেজিত হইয়া কহিল, 'মা, জহর এই কাজ করেছে।'

মা শান্ত স্বরে কহিলেন, 'বাবা, জহর তোর অবোধ ছোট ভাই। তার প্রতি তুই রুষ্ট হোস্‌নে। সে আমাদের ছেড়েছে ব'লে আমরা তা'কে ছাড়তে পারি না। তুই আপন কর্তব্য করেছিস্‌, ফলের ভার ভগবানের ওপর। যে পবিত্র বন্দেমাতরম্‌ নাম গ্রহণ ক'রে তুই সেবাব্রত গ্রহণ করেছিস্‌ তা'তে নির্যাতন-ক্লেশ সহ্য করবার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। তুই যদি হাসিমুখে সহ্য করতে পারিস্‌, আমি আপনাকে ধন্য মনে করব। আর এক কাজ তোকে করতে হবে, জহরকে বাঁচিয়ে তোর আত্মসমর্থন করতে হবে।'

ষষ্ঠীচরণ মা'র মহত্ত্বে মুগ্ধ হইয়া কহিল, 'আত্মসমর্থন করতে গেলে জহরকে দোষী করা ছাড়া ত উপায় দেখি না।'

মা অকম্প-কণ্ঠে কহিলেন, 'তবে তোর আত্মসমর্থনে কাজ নেই। কিন্তু নিরপরাধ বালকগুলির কি উপায় হবে ?'

অমনি কতকগুলি কণ্ঠ বলিয়া উঠিল, 'মা, আমরা তোমার কুপুত্র নই ; আমরা একটুও ভয় পাই নি। আমরা কেউ কিছু বল্‌ব না, আদালত যা খুশি তাই করুক।'

দয়াঠাকুরাণী বলিলেন, 'আশীর্বাদ করি, বাপ সকল, এই হৃদয়বল লাঞ্ছনায় দ্বিগুণিত হোক। যে মাকে বন্দনা ক'রে ব্রত-গ্রহণ করেছ, তাঁর মুখ উজ্জ্বল কর।

এরপর ষষ্ঠীচরণের ছ মাস এবং পাঁচজন বালকের দু মাস করে কারাদণ্ড হয়। এই ঘটনার পর জহর যখন তার থানায় ফিরে এল, দেখে থানার সামনে একটা

গরুর গাড়ী। গাড়োয়ান বললে, একজন স্ত্রীলোক তার সঙ্গে দেখা করতে চান। জহর গিয়ে দেখল, মা—দয়াঠাকুরাণী। মার সঙ্গে জহরের আবার মিলন হল। জহর তার ভুল স্বীকার করে আর দারোগাগিরির কাজে ইস্তফা দিয়ে মার কাছে ফিরে এল। মাতৃ-মিলন সার্থক হল।

প্রমথনাথ রায় চৌধুরী (১৮৭২-১৯৪৯) ঃ "রবীন্দ্রনাথের অনুকরণে যাঁহারা ব্যাপকভাবে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে সবাগ্রে উল্লেখনীয় প্রমথনাথ রায়চৌধুরী।"[১৮] শুধু কবিতা নয়, নাটক রচনাতেও এঁর মন্দ হাত ছিল না; এবং তখনকার প্রথম শ্রেণীর প্রায় সমস্ত পত্রিকাতেই এঁর লেখা প্রকাশিত হত। প্রমথনাথের স্বাদেশিকতা-মূলক রচনা যা প্রবাসীতে ছাপা হয় সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য—দুটি গান (আশ্বিন, ১৩১২), একটি প্রবন্ধ, 'কাজ বনাম কথা' (আশ্বিন, ১৩১২) এবং ছটি কবিতা—'অন্ধ আসক্তি', 'আমার ভালোবাসা', 'প্রেমে পক্ষপাত', 'চিরমাতা', 'বরণ' এবং 'অভিষেক' (অগ্রহায়ণ, ১৩১২)।

প্রমথনাথ প্রবন্ধ বিশেষ লেখেন নি। 'কাজ বনাম কথা' প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রীয় মতের সমালোচনা। রবীন্দ্রনাথ কথা ছেড়ে কাজের কথা বলেছিলেন। কিন্তু প্রমথনাথ তাঁর এ মত সম্পূর্ণ সমর্থন করতে পারলেন না। তিনি বললেন,

> রবীন্দ্রবাবু···রোষে ক্ষোভে গর্জন করিয়া বলিয়াছেন—আর না, যথেষ্ট কাঁদিয়াছ বাঙালী, এখন কাজ কর। ইহাই সফলতার সদুপায়। এ উত্তেজনা শুনিতে এতই সুন্দর এবং নিপুণ কণ্ঠের উন্মাদনায় এতই মর্ম্মস্পর্শী, যে উহা নিঃসংশয়ে মানিয়া লইবার প্রলোভন এড়ান সহজ হইয়া উঠে না। কিন্তু তলাইয়া দেখিলে দ্বিধা আসে। কাজ ত করিবই, কথা কেন ছাড়িব? তবে যখন সরকার আইন করিয়া কণ্ঠরোধের ব্যবস্থা করিলেন তখন সেই অধিকারটিকে অব্যাহত রাখিতে যে লড়াই করিয়াছিলাম, তা কি এইরূপে হারাইতে? বহুবার কথার বাজে খরচ হইয়া গিয়াছে, জানি; মাঝে মাঝে কাজে আসে নাই, এ কথা মানি না। ভাষা বিভাগের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন কি পণ্ড হইয়াছে? এ ক্ষেত্রে একেবারে নিঃশব্দ হইয়া

১৮ 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'—ডাঃ সুকুমার সেন, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-৬০।

গিয়া হঠাৎ একটা কো-অপারেটিভ্ স্বদেশী ষ্টোর খুলিয়া ফেলিলে খাসা হইত বটে, কিন্তু ভাষাকে অক্ষুণ্ণ রাখা যাইত কি না সন্দেহ।

প্রমথনাথ এখানে সেই মতেরই পোষকতা করেছেন যে মতের সমর্থক ছিলেন পৃথ্বীশচন্দ্র রায়, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

প্রমথনাথের ছটি কবিতার কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। সবগুলির মধ্যেই একটি ভাবগত সমতা লক্ষ্য করা যায়, প্রকাশভঙ্গি খুবই আবেগময়। 'প্রেমে পক্ষপাত' কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত হল। কবির স্বদেশনিষ্ঠা এতে স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি লাভ করেছে।

তুমি ধন্যা তুমি গণ্যা, ইহা মিথ্যা কথা;
তুমি দীনা তুমি হীনা, পর পদানতা;
তোমার সন্তানগণ লক্ষ্মীছাড়া প্রায়
পরের পাদুকা বহি অন্ন করি' খায়।
তব বক্ষে মহামারী দুর্ভিক্ষ ভীষণ
শ্মশান সৃজিয়া নিত্য করিছে চর্বণ
তব লক্ষ সন্তানের শীর্ণ অস্থিগুলি।
ও পদ-নিগড়ে ঠেকি হইতেছে ধূলি
সন্তানের জয়-চেষ্টা। হা জননী মোর,
পারিছ না কিছু দিতে, তাই কোল তোর
যাব আজ ত্যাগ ক'রে ? পরের মা মোরে
কি দিবে সান্ত্বনা ? কিছু নাই ! তাই তোরে
আরো বেশী চাই পেতে ; হাসিতে হাসিতে
প্রাণ দিতে পারি তোর অরাতি নাশিতে !

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৮-১৯২৫) : বাংলা সাহিত্যের পুষ্টি সাধনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান যথেষ্ট। প্রধানত নাট্যকার হিসাবেই ইনি বিখ্যাত হলেও প্রবন্ধ-রচনাতেও, বিশেষ করে অনুবাদ-সাহিত্যে ইনি কম কৃতিত্ব দেখান নি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের হাতে বাংলা অনুবাদ-সাহিত্য যে কতটা সমৃদ্ধি লাভ করেছিল সে বিচার এখানে অপ্রাসঙ্গিক, তবে অনুবাদে তিনি যে কিরকম সুষ্ঠু দক্ষতার অধিকারী ছিলেন, প্রবাসীর পৃষ্ঠাগুলি থেকে তাঁর যে চারটি

রচনার উল্লেখ করা হল, সেগুলিই তার প্রমাণ; 'বিলাতী ভাব ও বিলাতী শিক্ষা' (ফাল্গুন, ১৩১৪), 'সমসাময়িক ভারত' (ধারাবাহিক, ১৩১৪) 'ভারতের রাষ্ট্রীয় মহাসভা' (আষাঢ় এবং শ্রাবণ, ১৩১৫) এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা' (ভাদ্র, ১৩১৫)। রাষ্ট্রীয় মতবাদের বিচারের দিক থেকেও এগুলির যথেষ্ট মূল্য আছে।

'বিলাতী ভাব ও বিলাতী শিক্ষা' এবং 'ভারতের রাষ্ট্রীয় মহাসভা' Ernest Piriou-র মূল ফরাসী লেখার অনুবাদ। দ্বিতীয় লেখাটিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এতে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান এবং স্বদেশী শিল্পোন্নতির ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক সাংঘাতিক অন্তরায় সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। Piriou-র অভিমতের সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মতের অবশ্যই মিল আছে। কংগ্রেসের ষোড়শ অধিবেশনের বিবৃতি-প্রসঙ্গে Piriou হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সম্বন্ধে এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন—

> আজকার ভারতবর্ষে মুসলমান-সমস্যাই একটি প্রধান সমস্যা। জনসংখ্যার পঞ্চমাংশ লোক কংগ্রেসের প্রতিকূল কেন, তাহার কারণ স্পষ্টই রহিয়াছে। মুসলমানেরা এখনো হিন্দুদিগকে বিজিত প্রজার জাতি বলিয়া মনে করে, মুসলমানেরা দেখিতেছে যে হিন্দুরা অন্যপ্রকার যুদ্ধক্ষেত্রে—অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে, বাজারে, সরকারি চাকরিতে জয়লাভ করিয়া তাহাদের উপর প্রতিশোধ লইয়াছে।···এই বিপদ নিবারণের একটিমাত্র উপায়—মুসলমানদের অপরিসীম অজ্ঞতাকে একেবারে ধ্বংস করা। বিপদ দেখিয়া সর্বপ্রথমে যিনি চীৎকার করিয়া নিজের জাতভাইকে সাবধান করিয়া দিলেন তাঁহার নাম সৈয়দ অর্থাৎ মহম্মদের উত্তরাধিকারী। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে, আলিগড়ে তিনি একটি কলেজ স্থাপন করিয়াছিলেন। কলেজটি বেশ উন্নতিলাভ করিতেছিল, এমন সময়ে খবর আসিল, কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। হিন্দুরা কেমন দ্রুত অগ্রসর হইতেছে! যাহারা পিছাইয়া পড়িয়াছে তাহাদের পক্ষে সমূহ বিপদ। সৈয়দ একলাফে সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং 'যুদ্ধং দেহি' বলিয়া কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। মুসলমানদের অধিকাংশই তাঁহার অনুগামী হইলেন।
>
> ইংরেজ ভাল খেলোয়াড়, টপ্ করিয়া গোলাটা ধরিয়া ফেলিল। বিবাদ উস্‌কাইয়া দিবার এমন সুযোগ তাহারা কি ছাড়িতে পারে?

দেশের লোক ইংরেজকে যেদিন বুঝিবে সেইদিনই ইংরেজ বোচ্‌কা-বুচ্‌কি বাঁধিতে আরম্ভ করিবে।

অনুবাদ ছাড়া প্রবাসীতে সাময়িক-প্রসঙ্গ রচনাতেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ হাত দিয়েছিলেন। ১৩১৫ সালের মাঘ মাসের সাময়িক-প্রসঙ্গে, সুরাট-কংগ্রেসে নেতাদের মধ্যে দলগত বৈষম্যের যে নগ্নমূর্তি প্রকাশ পেল তার উল্লেখ করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এক জায়গায় যে মন্তব্য করেছেন তাতে চরমপন্থীদের প্রতি তাঁর সহানুভূতির ইংগিত পাওয়া যায়,

অনেক মধ্যপন্থী মনে করেন যে তাঁহারা ইংরাজকে খুসি করিয়া কিছু রাজনৈতিক অধিকার বক্‌শিস্‌ পাইবেন। এই জন্য তাঁহারা নিজের চরমপন্থী ভাইদের ত্যাজ্য-ভাই করিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া মাথা মুড়াইতেও প্রস্তুত।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মতে ভারতে এখন ক্ষত্রিয়-যুদ্ধের স্থান না থাকলেও বৈশ্য-যুদ্ধ অর্থাৎ শিল্প-বাণিজ্যের প্রতিযোগিতার প্রচুর সুযোগ রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে ইংরেজ যে অত্যাচার চালাচ্ছে তার মধ্যে দিয়ে কি করে স্বদেশ-সেবা সম্ভব? বিনা বিচারে দণ্ড-নির্বাসন আর বিনা প্রমাণে শাস্তি দানের নির্মমতা ভেদ করে দেশবাসী কি করে স্বদেশ-সেবায় আত্মনিয়োগ করবে? উত্তরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লিখেছেন,

আমরা এ পর্যন্ত আইন মানিয়া চলিতেছি; ভবিষ্যতেও, বিবেক-বিরুদ্ধ আর ধর্ম-বিরুদ্ধ না হইলে, আইন মানিব। কোনকালেই পরের অনিষ্ট চেষ্টারূপ অধর্ম করিব না। কিন্তু কোনও কারণে দেশের মঙ্গলসাধনেও বিরত থাকিব না।

লক্ষ্য করা দরকার, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এখানে বলেছেন, ভবিষ্যতে আমাদের আইন মানা বা না মানা নির্ভর করছে আইনের প্রকৃতির ওপর। তা যদি বিবেক-বিরুদ্ধ আর ধর্ম-বিরুদ্ধ না হয় তবেই আমরা ভবিষ্যতে তার প্রতি আনুগত্য জানাব। এখানে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক দূরদৃষ্টির একটি সুন্দর নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে। পরবর্তীকালে ইংরেজের আইন যে বিবেক- আর ধর্ম-বিরুদ্ধ হয়ে উঠবে এবং আইন অমান্য আন্দোলন সুরু হবে তার স্পষ্ট আভাস তিনি পেয়েছিলেন বলে মনে হয়।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২) : আমাদের নির্দিষ্ট সময়-সীমার মধ্যে প্রবাসীর পৃষ্ঠাতে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের দেশাত্মবোধক কোন কবিতা প্রকাশিত হয় নি। অনুবাদ এবং মৌলিক গদ্য-রচনাতে হাত দিলেও সত্যেন্দ্রনাথ কবি হিসাবেই যশস্বী। কিন্তু সুরের উল্লেখ করে খাঁটি বাংলা গানও যে তাঁর লেখনী থেকে বেরিয়েছে প্রবাসীর পৃষ্ঠায় তার একটি প্রমাণ আছে।

১৯১১ সালে বিভক্ত বাংলা আবার যুক্ত হয়ে গেল। বাঙালী, সাময়িক ভাবে হলেও, শান্তি ও স্বস্তির স্বাদ পেল। অনেকে তো নতুন করে ইংরেজ-মহিমা কীর্তন করতে সুরু করেন। এমন কি ৩০শে আশ্বিনের রাখী-বন্ধন উৎসব হবে কিনা এ নিয়েও নেতাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল। কিন্তু ৩০শে আশ্বিনের এই উৎসব যে একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপায় হিসাবে গৃহীত হয় নি, এ যে চিরস্থায়ী জাতীয় ঐক্যের আদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এ কথা তখন অনেকেই বিস্মৃত হয়েছিলেন। আমাদের সেই আদর্শ-বিস্মৃতির অশুভ-লগ্নে সত্যেন্দ্রনাথ লেখেন 'রাখী-বিসর্জন' গানটি (কার্তিক, ১৩১৯)।

(বাউলের সুর)

রাখী ! তোরে রাঙিয়েছিলাম
প্রাণের রাঙা রঙ দিয়ে !
(ওরে) বানিয়েছিলাম অখণ্ড ডোর
(গহন) আঁধার-রাত্তি বঞ্চিয়ে !
ভাঙা আমার চরকাটিরে
জুড়ে তুলেছিলাম ফিরে,—
বন্ধ করে আঁখির ধারা
(ও সেই) অভয় শরণ নাম নিয়ে।
রাঙা ব্যথা ! ভয়ে ভয়ে—
বেঁধেছিলাম তয়ে তয়ে !
(তাই) উঠ্‌ল পুরে—জুড়্‌ল দু'মুখ
(এ মোর) প্রাণের পুঁজি সঞ্চিয়ে।

ফুরিয়েছে কাজ এখন তোমার—
বিসর্জনের নেই দেরি আর,
(তবু) আমন্ত্রণের বরণডালাই
(সাজাই) মনের ভুলে—মন দিয়ে!

অন্যান্য কয়েকজন লেখক ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ঃ সে সময়ে দেশের অবস্থা এবং নানা জাতীয়-প্রসঙ্গ নিয়ে অন্যান্য যে লেখকদের গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ প্রবাসীতে ছাপা হত তাঁরা হলেন—রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (১৮৬৫-১৯৪৩), শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯), রমণীমোহন ঘোষ (?—১৯২৮), নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৮৬১-১৯৪০), দেবকুমার রায় চৌধুরী (?—১৯২৯), দীনেন্দ্র কুমার রায় (১৮৬৯-১৯৪৩) এবং রামপ্রাণ গুপ্ত (১৮৬৮-১৯২৭)। এঁদের রচনার সংখ্যা এই পত্রিকাতে নিতান্তই অল্প এবং সেগুলিতেও গতানুগতিক চিন্তাধারার অনুবর্তনই লক্ষণীয়। তবে রামানন্দের প্রবন্ধগুলি থেকে কয়েকটি মূল্যবান সমসাময়িক তথ্য সংগ্রহ করা যায়। এখানে তাঁর তিনটি রচনা থেকে এই জাতীয় কিছু তথ্য উদ্ধার করে প্রবাসী-প্রসঙ্গে আলোচনা শেষ করব। রামানন্দের এই তিনটি রচনা হল—'আগামী কংগ্রেস' '(পৌষ, ১৩১১), 'হাতের তাঁত ও কলের তাঁত' (মাঘ, ১৩১২), এবং 'ইংরাজ রাজত্বে ভারতের স্বাস্থ্য' (শ্রাবণ, ১৩১৩)।

১৯০১-১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে শিক্ষার জন্যে মোট ব্যয় করা হয় ৪০১ লক্ষ টাকা; তার মধ্যে কেবল ১৯১ লক্ষ টাকা সরকার দেয়, বাকী ২১০ লক্ষ টাকার ভার দেশবাসী বহন করে। রামানন্দের মতে এতে দেশবাসীর স্বাবলম্বনের পরিচয়ই ফুটে উঠেছে। আত্মচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক অধিকার লাভের জন্যে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার বিশেষ প্রয়োজনীয়তাকেও রামানন্দ প্রথম দিকে দৃঢ় ভাবেই সমর্থন করতেন। 'আগামী কংগ্রেস' প্রবন্ধে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

> বিদেশী কারখানা সকলের সহিত টেক্কা দিয়া জিনিস তৈয়ার করিতে হইলে, অনেক টাকার দরকার। ভারত দিন দিন দরিদ্র হইতেছে। ইংরাজ কর্তৃক অর্থ শোষণ বন্ধ না হইলে বৃহৎ কারবার আমরা কেমন করিয়া করিব? আমাদের রাজনৈতিক অধিকার না বাড়িলে এই অর্থশোষণ বন্ধ হইতে পারে না।

কলের তাঁত (Power loom) এ দেশে চালু হলেও প্রায় ৫০ বছর ধরে হাতের তাঁতগুলিও তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে নিজেদের প্রতিষ্ঠা বজায় রাখে। এই ব্যাপারটির উল্লেখ করে সরকারী শিল্পশিক্ষালয়ের তদানীন্তন অধ্যক্ষ হ্যাভেল সাহেব দেখিয়েছিলেন যে ভারতীয় শিল্পকলার সঙ্গে য়ুরোপীয় শিল্পকলার একটা প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে। এই পার্থক্যের জন্মেই এদেশে হাতের তাঁতগুলিকে গড়ে তোলার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে আর এগুলির উন্নতির ওপরেই নির্ভর করছে কলাজীবীদেরও অবস্থার পরিবর্তন। 'হাতের তাঁত ও কলের তাঁত' প্রবন্ধে রামানন্দ এই বিষয়টি নিয়েই আলোচনা করেছেন।

তথ্যের দিক থেকে 'ইংরাজ রাজত্বে ভারতের স্বাস্থ্য' প্রবন্ধটি গুরুত্বপূর্ণ। উনিশ শতকের গোড়ার দিকেও বাঙালীর স্বাস্থ্য খুবই ভালো ছিল। ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে ২০শে সেপ্টেম্বর ব্যারাকপুর পরিদর্শনের পর তদানীন্তন বড়লাট লর্ড মিণ্টো অনারেব্‌ল্ এ. এম্. এলিয়টকে এক চিঠিতে লেখেন,

> The men themselves are still more ornamental. I never saw so handsome a race. They are much superior to the Madras people, whose forms I admired also. Those were slender ; these are tall, muscular, athletic figures, perfectly shaped; and with the finest possible cast of countenance and features. Their features are of the most classical European models with great variety at the same time.[১৯]

এক শতাব্দীর মধ্যেই এই স্বাস্থ্যবান জাতিটির কি অবস্থা দাঁড়িয়েছিল এবং তার মূল কারণই বা কি রামানন্দ তাঁর এই প্রবন্ধে সে বিষয়ে চমৎকারভাবে আলোচনা করেছেন। ইংরেজ বলতো তারা আসার আগে ভারতবাসী যুদ্ধ-কলহের মধ্যে দিয়ে লুপ্ত হতে চলেছিল, তারা এসে রক্ষা করেছে। রামানন্দ এই 'রক্ষার'আসল রূপটি ফুটিয়ে তুললেন। উনিশ শতকের গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত একশ বছরে সারা পৃথিবীতে ৫০ লক্ষ লোক যুদ্ধে মারা যায়, আর ভারতবর্ষে ১৮৯৬ থেকে ১৯০৫ মাত্র এই দশ বছরে শুধু প্লেগে ৩৭ লক্ষ ২৯ হাজার লোক মারা

১৯ *Lord Minto in India*—Countess of Minto–p. 33.

যায়, আর সমস্ত উনিশ শতকে দুর্ভিক্ষে মারা যায় ৩ কোটি ২৫ লক্ষ। দুর্ভিক্ষকে দৈব ঘটনা বলেও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তা যদি হত, অন্য স্বাধীন দেশেও দুর্ভিক্ষে আমাদের দেশের মতোই লোক মারা যেত। ইংরেজ রাজত্বের আগেও আমাদের দেশে দুর্ভিক্ষ হয়েছে; কিন্তু ইংরেজ আসার পর থেকে এর সংখ্যা ও ভয়াবহতা অনেক বেড়ে যায়। এ সম্বন্ধে রামানন্দ লিখছেন, "আমাদের দেশে ইংরাজের তথাকথিত সভ্য-শাসনে আমাদের ধন ও জ্ঞান না বাড়ায় আমরা দারিদ্র্য ও স্বাস্থ্যতত্ত্ব বিষয়ে অজ্ঞতাপ্রযুক্ত মহামারীতে মারা যাইতেছি। ইহাতে কি ইংরাজকে বেকসুর খালাস দেওয়া যায়?"

এই প্রবন্ধ থেকে আর একটি তথ্য আমরা জানতে পারি। কলের জলের ব্যবস্থাকে নাগরিক জীবনের একটি বিশেষ সুবিধা হিসাবে আজ আমরা গ্রহণ করেছি। ভারতের বড় বড় নগরে যখন এই ব্যবস্থা প্রথম প্রবর্তিত হয় তখনো অনেকে মনে করেছিলেন এতে জনস্বাস্থ্য উন্নত হয়েছে। কিন্তু রামানন্দ প্রমাণ করলেন এ ধারণা ভিত্তিহীন। কলের জল সরবরাহের ব্যবস্থায় তখন জনস্বাস্থ্য উন্নত হওয়ার বদলে অবনত হয়েছিল এবং মৃত্যুর হার হ্রাস না পেয়ে বেড়েছিল। তিনি ভারতের অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর প্রদেশ থেকে মৃত্যু-তালিকা সংগ্রহ করে নিজের বক্তব্যকে সমর্থন করলেন। অবশ্য এই তালিকাও প্রথমে প্রকাশিত হয় পাইয়োনীয়ার পত্রিকায় (১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯০১) Col. G. M. Giles, I. M. S.-এর একখানি চিঠিতে। এই চিঠিতে Col. Giles উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের স্বাস্থ্য-কমিশনের ১৯০১ সালের রিপোর্ট থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তালিকাটি এখানে উদ্ধৃত করা হল। এগুলি পাঁচ পাঁচ বছরের মৃত্যু-সংখ্যার গড়—

সহর	জলের কল হইবার পর গড় বার্ষিক মৃত্যুর হার	জলের কল হইবার পূর্বে গড় বার্ষিক মৃত্যুর হার
কানপুর	৪৭·৮৩	৪১·১৫
এলাহাবাদ	২৮·৭০	২৫·৭৭
লক্ষ্ণৌ	৪৩·৭১	৪১·৬৮
বেনারস	৪৮·৮১	৩৯·৯৯
মীরট	৩৫·০৬	৩২·১৩
আগ্রা	৩৫·৪৬	৩২·২৩

দেখা যাচ্ছে, জলের কলবিশিষ্ট সব সহরেই, একমাত্র লক্ষ্ণৌ ছাড়া, মৃত্যুর হার বেড়েছে।

বলা বাহুল্য, রামানন্দের এই লেখাগুলির সাহিত্যিক মূল্য বিশেষ নেই। তবে তাঁর রচনাভঙ্গি বেশ সহজ ও অনাড়ম্বর। ভাষাও আড়ষ্টতা-বর্জিত। এখানে তাঁর স্বাদেশিকতা-মূলক অন্য প্রবন্ধগুলির একটি তালিকা দেওয়া হল—

'স্বদেশী-প্রচেষ্টা' (আশ্বিন, ১৩১২), 'বঙ্গ বিভাগ' (আশ্বিন, ১৩১২), 'ছাত্রজীবন ও সার্বজনিক কাজ' (পৌষ, ১৩১২), 'স্ব ও দেশ' (মাঘ, ১৩১২), 'ইংরাজ-শাসন কি বিধাতার বিধান' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৩), 'স্বদেশী প্রসঙ্গ' (ভাদ্র, ১৩১৩) এবং 'স্বরাজ ছাড়া আর কি চাই' (আষাঢ়, ১৩১৪)।

ভাণ্ডার

বাংলা সাময়িক-পত্রের জগতে ভাণ্ডারের আবির্ভাব একটা বিশেষ প্রয়োজন-মূলক। এ প্রয়োজন যতটা সাহিত্য-গত তার চেয়ে বেশী দেশের সমসাময়িক রাজনীতিক অবস্থা-গত। ভাণ্ডারে প্রকাশিত রচনাবলীর বিষয় বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে স্বদেশী আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি নির্ণয় এবং তাতে নতুনতর প্রেরণাবেগ সঞ্চারই ছিল এই পত্রিকাটির আত্মপ্রকাশের আসল উদ্দেশ্য। এটিকে দেশাত্মবোধক রচনার ভাণ্ডার বললে ভুল হবে না। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। সম্পাদক—রবীন্দ্রনাথ[১]; প্রকাশক—কেদারনাথ দাশগুপ্ত; প্রকাশ কাল—বৈশাখ, ১৩১২।

বঙ্গদর্শন সম্পাদনার মতো ভাণ্ডারেরও দায়িত্ব গ্রহণ করার আন্তরিক ইচ্ছা রবীন্দ্রনাথের ছিল না। তবু কেন তিনি এ ভার গ্রহণ করেন সে কথা নিজেই বলেছেন,

> প্রকাশকের মুখে যখন জানিতে পারিলাম আমাদের এই কাগজটা একটা মানসিক সামাজিকতা স্থাপনের চেষ্টা করিতেছে, দেশের পাঁচজন ভাবুককে একটা বৈঠকে আমন্ত্রণের উদ্যোগ হইতেছে তখন কৌতূহলে আমার মন আকৃষ্ট হইল।[২]

প্রথমে ভাণ্ডারে যে-ধরনের রচনা ছাপা হত তার আকৃতি বিশেষ বড় ছিল না। কারণ, এই ধরনের লেখা প্রকাশ করাই ভাণ্ডারের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্যের কথা সম্পাদক নিজেই ঘোষণা করেছিলেন,

> আমাদের এই কাগজখানি যাহাতে অধিকাংশ লোকের অবসরের উপযোগী হয়, ইহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই ভাণ্ডারের কর্মকর্তা নানা ছোট লেখা সংগ্রহের আয়োজন করিতেছেন।[৩]

---

১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৩ থেকে প্রমথনাথ চৌধুরী সহ-সম্পাদক হন। ১৩১২ সালে রবীন্দ্রনাথ এক সঙ্গে দুটি পত্রিকার সম্পাদক—ভাণ্ডার ও বঙ্গদর্শন।

২ 'সূত্রধারের কথা'—বৈশাখ, ১৩১২।

৩ ঐ ঐ

[illegible] ভাগ। বৈশাখ, ১৩১২। ১ম সংখ্যা।

ভাণ্ডার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার,
[illegible] কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দুই টাকা চারি আনা।

কিন্তু দেখা গেল প্রয়োজনের তাগিদে বক্তব্য বাড়তে লাগল, আর ক্রমশ 'ছোট লেখা'-গুলি রীতিমতো বড় লেখা হয়ে দাঁড়াল।

বাংলা দেশ তখন জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত। নেতাদের সামনে নানা সমস্যা। আর তাঁরা আপন আপন চিন্তাবুদ্ধির সাহায্যে সেই সমস্যাগুলির জট ছাড়াতে চেষ্টা করছেন। তাই মতের দিক দিয়ে তাঁদের মধ্যে পার্থক্য যতটা প্রকট হয়ে উঠল, সমস্যার জট ততই হল জটিলতর। এই সব প্রশ্ন-সমস্যা নিয়ে কে কি ভাবছেন সে সম্বন্ধে মাঝে মাঝে বিভিন্ন পত্রিকায় নানা তত্ত্ব-আলোচনা প্রকাশিত হলেও, এমন একটি পত্রিকা তখন ছিল না যার মাধ্যমে তাঁদের মত-বৈষম্যের একটা সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া যায় এবং যার ফলে নিজেদের মধ্যে ধারণাগত ভ্রান্তি নিরসন সহজসাধ্য হয়। প্রধানত এই উদ্দেশ্য নিয়েই ভাণ্ডারের আত্মপ্রকাশ। শ্রদ্ধাস্পদ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ভাণ্ডারের এই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন,

> রাজনীতির আলোচনাই মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা বঙ্গদেশের যাবতীয় সমস্যাকে রাজনীতির পটভূমিতে সমগ্রভাবে দেখিবার ও বিচার করিবার অবসর পাইলেন।[৪]

অন্যান্য রচনার সঙ্গে ভাণ্ডারের 'প্রশ্নোত্তর' বিভাগটি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। এই বিভাগটিতে দেশের নানা সমস্যা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হত, আর তার ওপরে বিভিন্ন চিন্তাশীল মনীষীর লিখিত উত্তর প্রকাশ করা হত। উত্তর-দাতাদের মধ্যে বিপিনচন্দ্র পাল, অম্বিকাচরণ মজুমদার, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, আশুতোষ চৌধুরী, অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এবং পৃথ্বীশচন্দ্র রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১): রবীন্দ্রনাথই ভাণ্ডারের প্রধান লেখক। তাঁর অনেকগুলি প্রবন্ধ, গান এবং জাপানী কবিতার কয়েকটি অনুবাদ এতে প্রকাশিত হয়েছিল। আর যাঁদের লেখা এতে ছাপা হয়েছে তাঁদের মধ্যে দুজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—চিত্তরঞ্জন দাশ এবং চন্দ্রনাথ বসু। দুজনেই রবীন্দ্রনাথের প্রতিপক্ষ—সাহিত্য ও রাজনীতি উভয় ক্ষেত্রেই।

ভাণ্ডারে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন গদ্য রচনা ও সেগুলির প্রকাশকাল,

৪ 'রবীন্দ্র-জীবনী', প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ২য় খণ্ড, পৃ-১১৯।

প্রাইমারি শিক্ষা	—	বৈশাখ	১৩১২	
বিজ্ঞান সভা	—	জ্যৈষ্ঠ	„	
ইতিহাস কথা	—	আষাঢ়	„	
স্বাধীন শিক্ষা	—	„	„	
বহুরাজকতা	—	„	„	
বঙ্গব্যবচ্ছেদ	—	ভাদ্র ও আশ্বিন	„	
শোক চিহ্ন	—	„	„	
পার্টিশনের শিক্ষা	—	„	„	
করতালি	—	„	„	
শিক্ষার আন্দোলনের ভূমিকা	—	অগ্রহায়ণ	„	
বিলাসের ফাঁস	—	মাঘ	„	
রাজভক্তি[৫]	—	„	„	
স্বদেশী আন্দোলনে নিগৃহীতদের প্রতি নিবেদন	—	ফাল্গুন	„	
দেশনায়ক[৬]	—	বৈশাখ	১৩১৩	
স্বদেশী আন্দোলন (১)	—	„	„	বিশেষ সংখ্যা
স্বদেশী আন্দোলন (২)	—	জ্যৈষ্ঠ	„	„ „
শিক্ষা সমস্যা[৭]	—	„	„	এবং জ্যৈষ্ঠের বিশেষ সংখ্যা
শিক্ষা সংস্কার	—	আষাঢ়	„	
জাতীয় বিদ্যালয়[৮]	—	আশ্বিন	„	

এগুলির মধ্যে থেকে বিশেষ কয়েকটি প্রবন্ধ নিয়ে আলোচনা করছি।

যে দেশে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত সেখানে রাজা থাকেন একজন। কিন্তু ইংরেজ রাজতন্ত্রে ভারতের ভাগ্যে রাজা বহু। ভারতের মাটিতে পদার্পণ করেই ছোট-বড় সব ইংরেজই প্রভু হয়ে উঠতেন, এমন কি ইংলণ্ডের মাটি জীবনে না

৫ বসুধা পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত—জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়, ১৩১৩।

৬ বঙ্গদর্শনে পুনর্মুদ্রিত—জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৩।

৭ „ „ —আষাঢ়, ১৩১৩।

৮ প্রথম প্রকাশ—বঙ্গদর্শন—ভাদ্র, ১৩১৩

মাড়িয়েও এদেশের অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানরাও অনেকে প্রভুর জাতে উঠেছিলেন। আর এই সব প্রভুদের প্রভুত্বের দাপটে এদেশবাসীর প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠত। অমৃতলাল বসুও তাঁর 'প্রোক্লামেশন্' কবিতায় এই প্রশ্নটি তুলতে ভোলেন নি—'ইংরেজ-বণিক ছাড়া আর কে কে রাজা।'[৯] রবীন্দ্রনাথ 'বহুরাজকতা'[১০] প্রবন্ধে ইংরেজ শাসনের এই রূপটিকেই স্পষ্ট করে তুললেন।

> বাদশা যখন ছিলেন, তখন তিনি জানিতেন সমস্ত ভারতবর্ষ তাঁরই, এখন ইংরেজজাত জানে তাহাদের সকলেরই। একটা রাজপরিবারমাত্র নহে, সমস্ত ইংরেজ জাতটা এই ভারতবর্ষকে লইয়া সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে।

দেশের সবরকম বড় কাজে ইংরেজদের অধিকারই ছিল সর্বাগ্রগণ্য। এ দেশবাসীকে কোন একটা বড় কাজের অধিকারী হতে গেলে অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হত। তা সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রে সুফল ফলত না। শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্তকে ভাতে মারাই ছিল এই পরিকল্পনার একটি উদ্দেশ্য। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এর নেপথ্যের গূঢ় উদ্দেশ্যটি টেনে বার করলেন।

> ইংলণ্ড সমস্ত ইংরেজকে অন্ন দিতে পারে না—ভারতবর্ষে তাহাদের জন্য অন্নসত্র খোলা থাকা আবশ্যক। একটি জাতির অন্নের ভার অনেকটা পরিমাণে আমাদের স্কন্ধে পড়িয়াছে। সেই অন্ন নানারকম আকারে নানা-রকম পাত্রে জোগাইতে হইতেছে। ···অতএব কংগ্রেসের যদি কোন সংগত প্রার্থনা থাকে, তবে তাহা এই যে, সম্রাট এডোয়ার্ডের পুত্রই হউন্, স্বয়ং লর্ড কার্জন বা কিচেনারই হউন্, অথবা পায়োনিয়ারের সম্পাদকই হউন্, ভাল মন্দ বা মাঝারি যে কোন একজন ইংরেজ বাছিয়া পার্লামেণ্ট আমাদের রাজা করিয়া দিল্লির সিংহাসনে বসাইয়া দিন। একটা দেশ যতই রসালো হউক-না, একজন রাজাকেই পালিতে পারে, দেশশুদ্ধ রাজাকে পারে না।

সে-সময়ে কলকাতা ছিল রাজধানী এবং সারা বাংলার হৃৎপিণ্ড। এর সঙ্গে বাংলা দেশের সমস্ত রক্তবহা নাড়ীর যোগ ছিল। বঙ্গ বিভাগের মধ্যে দিয়ে এই শোণিত-সংযোগ ছিন্ন করার চেষ্টা হয়েছিল। ফলে দেশব্যাপী যে চাঞ্চল্যের

---

৯ ভারতী—জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২।

১০ 'রাজা প্রজা' গ্রন্থে সংকলিত, ১৩১৫।

সৃষ্টি হয় তার আঘাতে সরকারী ইচ্ছার পরিবর্তন হতে সময় লাগে প্রায় সাড়ে ছ বছর[১১]। তবু এই যে চাঞ্চল্য যার ফলে বাঙালীর হৃদয়-দৌর্বল্য দূর হয়ে যায় তার একটা বিশেষ মূল্য আছে। প্রবাসীতে রবীন্দ্রনাথের 'ব্যাধি ও প্রতিকার' প্রবন্ধের সমালোচনা করতে গিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এই কথাই বলতে চেয়েছিলেন। 'বঙ্গব্যবচ্ছেদ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই চাঞ্চল্যেরই মূল্য নিরূপণ প্রসঙ্গে বলছেন,

> যদি স্থির জানি আমাদের চাঞ্চল্য গবর্মেণ্টকে বিচলিত করিতে পারিবে না, তবে আমাদের এত উৎসাহ কেন? তাহার কারণ, এই চাঞ্চল্যই আমাদের লাভ। এই চাঞ্চল্য আমাদের নিজের শক্তিকে জাগ্রত করিয়া তুলিতেছে। নিজের প্রাণশক্তিকে অনুভব করাই যে একটা পরম সফলতা। পার্টিশনের প্রস্তাবে আমাদের সকলের মনে যে একটা আন্দোলন উঠিয়াছে, তাহাতেই আমরা বুঝিতেছি, পার্টিশন ঘটিলেও আমাদের তেমন ক্ষতি করিবে না।

অবশ্য অল্পকাল পরেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর মত কিছুটা বদলেছিলেন। প্রেমের ভিত্তিতেই হোক বা বেদনাবোধের ভিত্তিতেই হোক নিছক চাঞ্চল্যকে তখন তিনি আর সমর্থন করতে পারেন নি। ১৩১৩ সালের বৈশাখ মাসে ডন্ সোসাইটিতে ছাত্রদের কাছে তিনি যে বক্তৃতা দেন তাতেই তাঁর এই মত-পরিবর্তন স্পষ্টভাবে আমরা লক্ষ্য কবি।

'শোক চিহ্ন' রচনাটি একটি প্রতিবাদ-বিশেষ। তখন বঙ্গভঙ্গের শোকে কয়েকজন খবরের কাগজওয়ালা তাঁদের কাগজের ধারের দিকে কালো কালির দাগ লাগাতেন। জাতীয় শোকের এমনতর বিজাতীয় প্রকাশ দেখে রবীন্দ্রনাথ আর থাকতে পারলেন না।' লিখলেন,

> বঙ্গবিভাগ লইয়া আমাদের দেশের কোনো কোনো খবরের কাগজ অঙ্গপ্রান্তে মসীপ্রলেপের দ্বারা শোকচিহ্ন প্রকাশ করিতেছেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি, এ বিড়ম্বনা কিসের জন্য? আমরা যে শোক অনুভব করিতেছি

১১ ১২ই ডিসেম্বর ১৯১১ সালে সম্রাট পঞ্চম জর্জের ঘোষণা অনুযায়ী দুই বঙ্গের আবার মিলন ঘটে।

এ কথা এমন বিজাতীয়রূপে চোখে আঙুল দিয়া প্রমাণ করিতে হইবে কাহার কাছে ?

বিচ্ছেদের মধ্যে দিয়ে মিলনের যে অনুভূতি জাগে সেটা খাঁটি ; আর এটাই হল 'পার্টিশনের শিক্ষা'। বঙ্গবিভাগের আগেও দেশের নেতারা সমস্ত দেশবাসীকে এক করতে চেয়েছিলেন শুধু তাঁদের কথা সরকারকে শোনানোর জন্যে। বহুলাংশেই তাঁরা যে ব্যর্থ হয়েছিলেন আজ আর তা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু,

> এবারকার আন্দোলনের একটা আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, লাভ-লোকসানের কথা সকলে স্থির হইয়া ভাবিতেছে না। বঙ্গবিভাগে কি অনিষ্ট হইবে, তাহা অনেকেই জানে না ; কিন্তু একপ্রকার গভীর ভাবে অন্ধ ভাবে আমরা সকলে মিলিয়া বেদনাবোধ করিতেছি। এই বেদনাটা তর্ক-বিতর্কের বিষয় নহে বলিয়াই—ইহা অনুভবের বিষয় বলিয়াই—দেশের স্ত্রী-পুরুষ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলকেই ইহা অধিকার করিয়াছে।

অবশ্য এখানে রবীন্দ্রনাথের ধারণা যে খুব পরিষ্কার তা বলা যায় না ; কারণ, এই বিচ্ছেদের বেদনা শিক্ষিতদের হৃদয়কে আলোড়িত করলেও অশিক্ষিত পল্লী-বাসীদের মনকে কতটা নাড়াতে পেরেছিল সে বিষয়ে প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। বয়কট্-আন্দোলন ও স্বদেশী-প্রচার জোরালো হয়ে উঠলে গ্রামবাসীরা ব্যাপারটা সম্বন্ধে ক্রমশ একটু সচেতন হতে চেষ্টা করে এই কথার মধ্যেই সত্যতার পরিমাণ বেশি বলে মনে হয়।

এই লেখাটির মধ্যে আরো একটি বিশেষ লক্ষণীয় অংশ আছে। রবীন্দ্রনাথ বয়কট্-কে কোন দিনই স্বীকার করতে পারেন নি। অল্পদিন পরে তিনি নিজেই বলেছিলেন যে বাঙালীর মুখে বয়কট্ শব্দটা শুনলে লজ্জায় তাঁর মাথা হেঁট হয়।[১২] কিন্তু এই অংশটির মধ্যে বয়কটের প্রতি তাঁর সমর্থনের একটি পরোক্ষ আভাস স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—

> আমাদের এবারকার আন্দোলনে আমরা বিলাতি জিনিষ পরিত্যাগ করিয়া দেশি জিনিষ ব্যবহার করিতে,প্রবৃত্ত হইয়াছি, ইহাতে ইংরেজ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিবে কিনা জানি না ;—কিন্তু এই ব্যাপারে—দেশ যে আমার—এই

১২ দ্রষ্টব্য 'দেশনায়ক'—বৈশাখ, ১৩১৩।

কথাটা আমাদের সাধারণ লোকের কাছে বিনা ভাষায় এক মুহূর্তে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এক যুগ ধরিয়া বক্তৃতা করিলেও এমনটা ঘটিতে পারিত না।

১৯০৫ সালের ডিসেম্বর মাসে, বাংলার চারিদিকে স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ার যখন প্রবলতর হয়ে উঠেছে, সেই সময়ে প্রিন্স অব্ ওয়েল্স্ আসেন ভারত ভ্রমণে। যুবরাজের আগমনে তখন অনেকেই বেশ উল্লাস প্রকাশ করেছিলেন। এমন কি সেই সময়ে বারাণসীর কংগ্রেস অধিবেশনেও তাঁর আগমনে আনন্দ প্রকাশ করে প্রথম প্রস্তাব গৃহীত হয়।[১৩] এই ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের মনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় 'রাজভক্তি'[১৪] প্রবন্ধে তারই প্রকাশ।

ইংরেজ আমাদের দেশ শাসন করছে সাত-সমুদ্র তের-নদীর পার থেকে। রাজা থাকেন সেখানে। এপারের প্রজার সঙ্গে তাঁর কোন সম্বন্ধ নেই। রাজায়-প্রজায় এমনতর পরিচয়হীন রাজাগিরির নিদর্শন পৃথিবীর ইতিহাসে আর পাওয়া যায় না।

যুবরাজ এলেন। ভারতবাসীর খরচেই কয়েক দিন আনন্দ করে দেশে ফিরে গেলেন। দেশের মানুষ তাঁকে চিনল না, জানল না। দুটো দুঃখের কথা জানাতেও পারল না। শুধু দেখল, আকাশ-ছোঁওয়া আড়ম্বরের বিভীষিকা। আর বুঝল ব্যাপারটা বড় জটিল। কিন্তু রাজা কি পেলেন? প্রজার ভক্তি নয়—ভীতি।

> রাজপুত্র আসিলেন। রাজ্যের যত পাত্রের পুত্র তাঁহাকে গণ্ডি দিয়া ঘিরিয়া বসিল—তাহার মধ্যে একটু ফাঁক পায় এমন সাধ্য কাহারো রহিল না। এই ফাঁক যতদূর সম্ভব সংকীর্ণ করিবার জন্য কোটালের পুত্র পাহারা

১৩ "... The Congress is deeply touched by the expressions of Their Highnesses' sentiments of cordial good-will towards the people of India, is confident that the personal knowledge gained during the present tour will stimulate their kindly interest in the welfare of its people. ..." *The Indian National Congress*, G. A. Natesan & Co., Resolutions, p. 114.

১৪ 'রাজা প্রজা' গ্রন্থে সংকলিত, ১৩১৫। পুস্তিকারূপেও প্রকাশিত হয়েছিল। দ্রষ্টব্য—গ্রন্থপরিচয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী—১০ম খণ্ড।

দিতে লাগিল—সে জন্য সে শিরোপা পাইল। তাহার পর? তাহার পর বিস্তর বাজি পুড়াইয়া রাজপুত্র জাহাজে চড়িয়া চলিয়া গেলেন—এবং আমার কথাটি ফুরালো, নটে শাকটি মুড়ালো।

…রাজা ও রাজপুত্রের এই বহুদুর্লভ মিলন যত সুদূর, যত স্বল্প, যত নিরর্থক হওয়া সম্ভব তাহা হইল।…রূপকথায় রাজপুত্র কোন সুপ্ত রাজকন্যাকে জাগাইবার জন্য সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়াছিলেন। আমাদের রাজপুত্রও বোধ করি সুপ্ত রাজভক্তিকে জাগাইবার জন্যই যাত্রা করিয়া থাকিবেন, কিন্তু সোনার কাঠি কি মিলিয়াছিল?

নানা ঘটনায় স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, আমাদের রাজপুরুষেরা সোনার কাঠির চেয়ে লোহার কাঠির উপরেই বেশি আস্থা রাখিয়া থাকেন। তাঁহাদের প্রতাপের আড়ম্বরটাকেই তাঁহারা বজ্রগর্ভ বিদ্যুতের মত ক্ষণে ক্ষণে আমাদের চোখের উপর দিয়া ঝলসিয়া লইয়া যান। তাহাতে আমাদের চোখ ধাঁধিয়া যায়, হৃৎকম্পও হইতে পারে, কিন্তু রাজা প্রজার মধ্যে অন্তরের বন্ধন দৃঢ় হয় না—পার্থক্য আরও বাড়িয়া যায়।…

ভারতবর্ষের রাজভক্তি প্রকৃতিগত এ কথা সত্য। কিন্তু সেইজন্য রাজা তাহার পক্ষে সুদ্ধমাত্র তামাসার রাজা নহে। রাজাকে সে একটা অনাবশ্যক আড়ম্বরের অঙ্গরূপে দেখিতে ভালবাসে না।

যুবরাজ চলে যাওয়ার পর থেকেই পূর্ববঙ্গে ফুলার সাহেবের অত্যাচার মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। মুসলমানদের হাত করে হিন্দুদের প্রতি অকথা নির্যাতন সুরু হয়। অথচ যুবরাজ যখন ভারতে ছিলেন তখন বাংলা দেশের অবস্থা যাতে তিনি জানতে না পারেন তার জন্যে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছিল। স্বদেশী প্রচারকদের ওপর প্যুনিটিভ্ পুলিশের অত্যাচার রবীন্দ্রনাথকে পর্যন্ত কি রকম বিচলিত করেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'স্বদেশী আন্দোলনে নিগৃহীতদের প্রতি নিবেদন'এ।[১৫] ফাল্গুন সংখ্যার (১৩১২) ভাণ্ডারে প্রথমেই এই নিবেদন ছাপা হয়,

বাংলা দেশের বর্তমান স্বদেশী আন্দোলনে কুপিত রাজদণ্ড যাঁহাদিগকে পীড়িত করিয়াছে, তাঁহাদের প্রতি আমার নিবেদন এই যে, তাঁহাদের বেদনা যখন আজ সমস্ত বাংলা দেশ হৃদয়ের মধ্যে বহন করিয়া লইল, তখন এই

১৫ দ্রষ্টব্য—গ্রন্থ পরিচয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১০ম খণ্ড, পৃ—৬৬৩।

বেদনা অমৃতে পরিণত হইয়া তাঁহাদিগকে অমর করিয়া তুলিয়াছে। রাজ-চক্রের যে অপমান তাঁহাদের অভিমুখে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, মাতৃভূমির করুণ করস্পর্শে তাহা বরমাল্যরূপ ধারণ করিয়া তাঁহাদের ললাটকে আজ ভূষিত করিয়াছে, যাঁহারা মহাব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন বিধাতা জগতসমক্ষে তাঁহাদের অগ্নিপরীক্ষা করাইয়া সেই ব্রতের মহত্ত্বকে উজ্জ্বল করিয়া প্রকাশ করেন। অদ্য কঠিন ব্রতনিষ্ঠ বঙ্গভূমির প্রতিনিধি-স্বরূপ যেই কয়জন এই দুঃসহ অগ্নিপরীক্ষার জন্য বিধাতা কর্তৃক বিশেষরূপে নির্বাচিত হইয়াছেন, তাঁহাদের জীবন সার্থক, রাজরোষরক্ত অগ্নিশিখা তাঁহাদের জীবনের ইতিহাসে লেশমাত্র কালিমাপাত না করিয়া বার বার সুবর্ণ অক্ষরে লিখিয়া দিয়াছে—বন্দেমাতরম্।

স্বদেশী আন্দোলনের সুরু থেকেই রবীন্দ্রনাথ এর সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন। কবিকে তখন অনেকটা রাজনৈতিক নেতার ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়েছিল। কিন্তু রাজনীতির কুটিলতা তাঁকে বারবার নিষ্ঠুর আঘাত হেনেছে। তা ছাড়া বৈচিত্র্য-পিয়াসী কবি-মানসে রোমাণ্টিক মনোধর্মের আন্তর-ক্রিয়া তো ছিলই। এই কারণেই তাঁকে কখনো দেখা গেছে সভামঞ্চে আবার কখনো শান্তিনিকেতনে বা শিলাইদহে বা গিরিডিতে। এই কারণেই একই সময়ে তাঁর লেখনী থেকে একদিকে যেমন সরকারী অত্যাচার অবিচারের তীব্র প্রতিবাদ, স্বদেশী আন্দোলনের স্বরূপ বিশ্লেষণ, আর স্বদেশী-সংগীত সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি অন্যদিকে 'খেয়া'-র কবিতাগুলিও। সক্রিয় রাজনীতির (active politics) ক্ষেত্রে অংশ গ্রহণের আন্তরিক ইচ্ছা বোধহয় তাঁর কোনকালেই ছিল না। তবু দেশের অবস্থার টানে তিনি কিছুদিনের জন্যে সে ক্ষেত্রে নামতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই টানেই শান্তিনিকেতনের নিশ্চেষ্টতার মধ্যে ডুবে থাকতে না পেরে কলকাতায় এসে পশুপতি বসুর বাড়ীতে অনুষ্ঠিত এক সভায় তিনি তাঁর বিখ্যাত 'দেশনায়ক'[১৬] প্রবন্ধটি পাঠ করেন।

কিছুদিন আগে বরিশাল প্রাদেশিক সমিতিতে সরকারী অত্যাচার যেভাবে আত্মপ্রকাশ করে তাতে সমস্ত দেশের লোককেই বেশ ভাবিয়ে তোলে। রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গেরই অবতারণা করে বললেন, ব্রিটিশ রাজত্বে আইন জিনিসটা

১৬ 'সমূহ' গ্রন্থের অন্তর্গত—১৩১৫। পৃথক পুস্তিকারূপেও মুদ্রিত হয়।

যে ধ্রুব এটাই আমাদের জানা ছিল। কিন্তু সেই আইনই যখন উপদ্রব হয়ে ওঠে তখন আর নিজেকে শান্ত করে রাখার কোন উপায় থাকে না, কিন্তু তবু,

> এবারে কর্তৃপুরুষদের সহিত সংঘাতে বাঙালী জয়ী হইয়াছে। এই সংকটকালে বাঙালী যে বলের পরিচয় দিয়াছে, সেই বলের দৃষ্টান্তই তাহার সম্মুখে স্থিরভাবে ধরিব বলিয়া এই সভাস্থলে আমি অদ্য উপস্থিত হইয়াছি।

কিন্তু এই বলের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বর্জন-নীতির যে সমালোচনা করলেন তা এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—

> আমাদের দেশে সম্প্রতি যে-সকল আন্দোলন-আলোচনার ঢেউ উঠিয়াছে, তাহার মধ্যে অনেকটা আছে—যাহা কলহ মাত্র।...আপনাদের কাছে আমি স্পষ্টই স্বীকার করিতেছি, বাঙালীর মুখে 'বয়কট' শব্দের আস্ফালনে আমি বারংবার মাথা হেঁট করিয়াছি। আমাদের পক্ষে এমন সঙ্কোচজনক কথা আর নাই। বয়কট্ দুর্বলের প্রয়াস নহে, উহা দুর্বলের কলহ। আমরা নিজের মঙ্গলসাধনের উপলক্ষ্যে নিজের ভাল করিলাম না, আর পরের মন্দ করিবার উৎসাহেই নিজের ভাল করিতে বসিয়াছি, এ কথা মুখে উচ্চারণ করিবার নহে।...যদি য়ুনিভার্সিটি অসম্পূর্ণ হয়, যদি তাহা আমাদিগকে অভীষ্ট ফলদান না করে তবে তাহাকে বর্জন করাকে বয়কট্ করা বলে না। যে মনিব বেতন দেয় না, তাহার কর্ম ছাড়িয়া দেওয়াকে বয়কট্ করা বলে না।...জব্দ করিতে পারার একটা সুখ আছে, সন্দেহ নাই—কিন্তু দেশের ভাল করিতে পারার সুখ যদি তাহার চেয়ে বড় হয়, তবে তাহারই খাতির রাখিতে হইবে।...দেশী কাপড় চালানো ইংরেজের বিরুদ্ধে আমাদের একটা লড়াই, এ কথা বলিলেই যাহা আমাদের চিরন্তন মঙ্গলের পবিত্র ব্যাপার তাহাকে মল্লবেশ পরাইয়া পোলিটিকাল্ আখড়ায় টানিয়া আনিতে হয়; ইংরেজ তখন এই উদ্যোগকে কেবল নিজের দেশের তাঁতীর লোকসান বলিয়া দেখে, তাহা নয়, এই হারজিতের ব্যাপারকে একটা পোলিটিকাল সংগ্রাম বলিয়া গণ্য করে। ইহাতে ফল হয় এই যে নিজের দুর্বল প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে আমরা স্বদেশের হিতকে ইচ্ছাপূর্বক বিপদের মুখে ফেলিয়া দিই।

রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যে সেদিন দেশের অনেকেই খুব অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উক্তির সত্যতাকে তো অস্বীকার করার উপায় নেই। বয়কট-

আন্দোলনে অল্পকালের মধ্যেই যে যথেষ্ট পরিমাণে ব্রিটিশ-বিদ্বেষ সঞ্চারিত হয়েছিল, বিভিন্ন বাস্তব ঘটনাই তার প্রমাণ। সাহেবী পোষাক-পরিচ্ছদ আগুনে পুড়িয়া ফেলা, দোকানের বিলাতী জিনিষ নষ্ট করে ফেলা ইত্যাদি ক্রিয়াকলাপের মধ্যে যে বিদ্বেষ ছিল না এ কথা বয়কট্-পন্থী নেতাদের বক্তৃতাতেও অপ্রমাণ হয় নি। আসল কথা, নেতাদের ধারণা অনুযায়ী আন্দোলনের রূপটা গড়ে ওঠে নি, উঠতে পারে নি, কারণ ধারণার ক্ষেত্রেই তাঁদের মধ্যে অস্পষ্টতা ও অনৈক্য ছিল যথেষ্ট।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা-বিশ্বাস ছিল অপরিসীম। তাই সবাই নেতা হয়ে দেশের মধ্যে একটা গণ্ডগোল সৃষ্টি না করে একজন নেতার নেতৃত্বকে স্বীকার করে নেওয়ার প্রস্তাব করে রবীন্দ্রনাথ বললেন, "সুরেন্দ্রনাথকে সকলে মিলিয়া প্রকাশ্যভাবে দেশনায়করূপে বরণ করিয়া লইবার জন্য আমি সমস্ত বঙ্গবাসীকে আহ্বান করিতেছি।" কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, যাঁকে তিনি দেশনায়করূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন বয়কট্ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ছিল রবীন্দ্রনাথের ধারণার বিপরীত। ১৯০৮ সালের ৭ই আগষ্টের অনুষ্ঠানে সুরেন্দ্রনাথকে বলতে শোনা যায়, "অ্যাংলোইণ্ডিয়ান প্রভুরা বলিয়া থাকেন যে 'বয়কট' জাতীয়-বিদ্বেষ বৃদ্ধি করে। কিন্তু আমাদের 'বয়কট' জাতীয়-বিদ্বেষ-প্রণোদিত নহে।·· জাতীয়-বিদ্বেষ যদি যথার্থই উদ্ভূত হইয়া থাকে তবে গভর্ণমেণ্টের অত্যাচারপূর্ণ আইন-কানুন তাহার জন্য দায়ী।"[১৭]

ডন্ সোসাইটিতে ছাত্রদের কাছে প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের দুটি বক্তৃতাই স্বদেশী আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণে যথেষ্ট সাহায্য করে। প্রথম বক্তৃতায় তিনি এই আন্দোলনের উত্তেজনা ও মত্ততা সম্বন্ধে দেশবাসীকে সচেতন করে দিতে চেয়েছেন। গোড়ার দিকে তিনি নিজেও যে কিছুটা উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন এ কথা নিজের মুখেই স্বীকার করেছেন।

> এই স্বদেশী আন্দোলনে সকলেরই মন কিছু না কিছু উত্তেজিত হইয়াছিল। আমিও এ উত্তেজনার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারি নাই। ···কিন্তু আমি ধীরভাবে চিন্তা করিয়া এই বুঝিতে পারিয়াছি যে আমরা

১৭ দ্রষ্টব্য—বঙ্গদর্শন, সাময়িক প্রসঙ্গ, ভাদ্র, ১৩১৫।

হুড়মুড় করিয়া জড় জিনিসকে পাইতে পারি বটে, কিন্তু দেশে স্থায়ী কোন প্রতিষ্ঠান (institution) স্থাপন করা এত তাড়াতাড়িতে হয় না।

এই আন্দোলনে আমরা কতটুকু কাজ করতে পেরেছি সে সম্বন্ধে এক জায়গায় মন্তব্য করছেন,

> আমরা এই স্বদেশী আন্দোলনে কতটুকু কাজ করিতে পারিয়াছি তাহার জন্য গর্ব অনুভব করিয়া থাকি।... এ কথা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, যত বড় ভাবের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া আমরা এ কাজে যোগ দিয়াছিলাম, এত বড় ভাবের দ্বারা প্রণোদিত হইলে অন্য দেশের জনসম্প্রদায় যেরূপ ত্যাগ-স্বীকার করিত, আমরা তাহার শতাংশের একাংশও করিতে পারি নাই।

অন্য দেশের লোকের তুলনায় আমাদের এই অকিঞ্চিৎকর প্রচেষ্টায় আমরা কি লাভ করেছি, আর আমাদের প্রকৃত কর্তব্যই বা কি রবীন্দ্রনাথ তার হিসাব আর নির্দেশ দিয়েছেন ডন্ সোসাইটিতে প্রদত্ত তাঁর দ্বিতীয় বক্তৃতায়। আবেগ ও উত্তেজনা এই দুইটি মানসিক ধর্মে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। উত্তেজনা মানুষকে বিচার-বুদ্ধিহীন করে, কিন্তু কোন মহৎ কাজে অমিত শক্তি এনে দেয় আবেগ। স্বদেশী আন্দোলনে উত্তেজনার প্রকাশ যতই থাক আবেগও বিশেষ কম ছিল না। তাই নানা অনুষ্ঠান আর বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে যে স্বদেশ-চেতনায় দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করে তোলা বহুকাল-সাপেক্ষ ছিল এই আন্দোলন অল্প সময়ের মধ্যেই তাকে সম্ভব করেছে। এবং এটাই এই আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ ফল। এই দিক থেকে বিচার করেই রবীন্দ্রনাথ বললেন,

> এই স্বদেশী আন্দোলনে অনেক অভাবনীয় ব্যাপার ঘটিয়াছে। যাহা তর্ক করিয়া অসম্ভব মনে হয় তাহা সম্ভব হইল কেমন করিয়া তাহা বুঝিতে পারা যায় না। এই স্বদেশী আন্দোলনে প্রমাণ হইয়াছে যে অসাধ্যও সাধ্য হয়।

অসাধ্য তো সাধ্য হল। কিন্তু তাকে একটা বিকাশ একটা পূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উপায় কি ? এ কাজটা তো শুধু আবেগের দ্বারা সম্ভব নয় —এর জন্যে চাই সংগঠন। স্বদেশী আন্দোলনের সাফল্যের একটা রূপ তাঁর দৃষ্টিতে ধরা পড়লেও এর মধ্যে সবচেয়ে বড় অভাবটিও তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি।

> এই স্বদেশী আন্দোলনে আমাদের মন প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু

কলের অভাবে কাজ করিতে পারিতেছি না। দেশে যদি আজ বিচিত্র রকমের organisation বর্তমান থাকিত—যেমন পঞ্চায়েত, গ্রাম্য-সম্মিলন এবং এই ভাবের অন্যান্য প্রতিষ্টান—তাহা হইলে এত বড় সুযোগের সম্পূর্ণ ফল আমরা পাইতাম।...আমাদিগকে এখন পল্লীর patriotism জাগাইয়া তুলিতে হইবে।

স্বদেশী আন্দোলনের ফলে বাঙালী যেমন এক দিকে শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি-প্রচেষ্টায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল তেমনি অন্য দিকে জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্যেও সচেষ্ট হয়ে ওঠে। ইংরেজ-প্রবর্তিত শিক্ষা-ব্যবস্থা এবং শিক্ষালয় দুই-ই বর্জন করে ভারতীয় আদর্শের ভিত্তিতে দেশে নতুন শিক্ষা-ব্যবস্থা এবং শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে শিক্ষাসংস্কার আন্দোলন সুরু হয়।

১৩১২ সালের প্রায় সুরু থেকেই বাংলায় জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জল্পনা-কল্পনা আরম্ভ হয়। এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ তখন যথেষ্ট চিন্তা করেছিলেন। তাঁর সেই গভীর চিন্তা-প্রসূত প্রবন্ধগুলির কয়েকটি ভাণ্ডারে প্রকাশিত হয়। প্রথমেই সেগুলির উল্লেখ করা হয়েছে।

বঙ্গভঙ্গের প্রায় চার বছর আগেই রবীন্দ্রনাথ নিজের আদর্শ অনুযায়ী শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপন করেন। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের কর্মকর্তাদের অনুরোধে তিনি গঠন-মূলক আদর্শের কথা প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করলেন 'শিক্ষা সমস্যা'র[১৮] মধ্যে।

প্রবন্ধের প্রথমেই রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা পরিষদের আদর্শগত ভাবটি কি হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে বলতে গিয়ে প্রশ্ন তুললেন, শিক্ষা ক্ষেত্রে 'জাতীয় ভাব' কথাটির অর্থ কি?

'জাতীয়' শব্দটার কোন সীমা নির্দেশ হয় নাই, হওয়াও শক্ত। কোন্‌টা জাতীয়, আর কোন্‌টা জাতীয় নহে, শিক্ষা সুবিধা ও সংস্কার অনুসারে ভিন্ন লোকে তাহা ভিন্ন রকমে স্থির করেন।

অতএব শিক্ষা পরিষদের মূল ভাবটি সম্বন্ধে গোড়াতেই দেশের লোকে সকলে মিলিয়া একটা বোঝা পড়া হওয়া দরকার।...আমরা চাই—কিন্তু কী

১৮ প্রবন্ধটি তিনি ২৩শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৩, কলকাতার ওভারটুন হলে পাঠ করেন। এটি তাঁর 'শিক্ষা' গ্রন্থে সংকলিত হয়—১৩১৫।

চাই তাহা বাহির করা যে সহজ তাহা মনে করি না। এই সম্বন্ধে সত্য আবিষ্কারের পরেই আমাদের উদ্ধার নির্ভর করে।

আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তৎকালীন শিক্ষা-ব্যবস্থার যে সমালোচনা করেন আজকের দিনেও তা অনেকখানি সত্য হয়ে আছে,

> দশটা হইতে চারটে পর্যন্ত যাহা মুখস্থ করি, জীবনের সঙ্গে, চারিদিকের মানুষের সঙ্গে, ঘরের সঙ্গে, তাহার মিল দেখিতে পাই না। বাড়িতে বাপ-মা-ভাই বন্ধুরা যাহা আলোচনা করেন বিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে তাহার যোগ নাই, বরঞ্চ অনেক সময়ে বিরোধ আছে। এমন অবস্থায় বিদ্যালয় একটা এঞ্জিন মাত্র হইয়া থাকে—তাহা বস্তু জোগায় প্রাণ জোগায় না।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, য়ুরোপে লোকে যে শিক্ষা পায় তার সঙ্গে সে সমাজের এমন মর্মান্তিক বিচ্ছেদ নেই ; আমরা তাদের বাইরেটাকে নকল করতে গিয়ে ভিতরটাকে হারিয়েছি। আমাদের শিশুরা যে শিক্ষা পায় তাতে তাদের স্বভাবের সহজ-সরল বিকাশের পথটা রুদ্ধ হয়ে যায়। অথচ তার জন্যে আমরা শিশু-প্রকৃতির মধ্যেই দোষ আবিষ্কার করে থাকি। তাই, রবীন্দ্রনাথ বললেন, "মাতৃগর্ভের দশমাসে পণ্ডিত হইয়া উঠে নাই বলিয়া শিশুদের প্রতি সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান করিও না, তাহাদিগকে দয়া কর।" কিন্তু দয়া করে রবীন্দ্রনাথ তাদের গুরুগৃহে পাঠাবার নির্দেশ দিলেন। বললেন, "শিক্ষার জন্য এখনও আমাদের বনের প্রয়োজন আছে এবং গুরুগৃহও চাই। বন আমাদের সজীব বাসস্থান এবং গুরু আমাদের সহৃদয় শিক্ষক।" এই কথা বলে তিনি শিক্ষা পরিষদের কর্মকর্তাদের সামনে তাঁদের স্কুল-বিভাগের গঠন-পত্রিকা রচনার ব্যাপারে প্রাচীন ভারতের আশ্রমিক গুরুগৃহ-শিক্ষা-ব্যবস্থার আদর্শকে তুলে ধরলেন। এই আদর্শের ভিত্তিতেই তিনি শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর মতে ছাত্রদের চরিত্র গড়ে তোলার জন্যে এই ধরণের আশ্রমিক পরিবেশ একান্ত প্রয়োজন।

উত্তেজিত ছাত্রদের দমন করার জন্যে সে সময় নানা কঠোর বিধি-ব্যবস্থা তৈরি হয়েছিল। সরকার ছাত্রদের চাঞ্চল্যকে অন্যায় অসংযম বলে মনে করতেন। 'শিক্ষা-সংস্কার'[১৯] প্রবন্ধে এই সরকারী মনোভাব ও আচরণের প্রতিবাদ করে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন,

১৯ 'শিক্ষা' গ্রন্থে সংকলিত—১৩১৫।

ডিসিপ্লিনের যন্ত্রটাতে যে-পরিমাণ পাক দিলে ছেলেরা সংযত হয়, তাহার চেয়ে পাক বাড়াইবার চেষ্টা দেখা যাইতেছে, ইহাতে তাহাদিগকে নিঃস্বত্ব করা হইবে। ছেলেদের মধ্যে ছেলেমানুষের চাঞ্চল্য যে স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যকর তাহা স্বদেশের সম্বন্ধে ইংরেজ ভালোই বোঝে।

৩০শে শ্রাবণ ১৩১৩ জাতীয় শিক্ষা পরিষদের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে টাউন হলে এক বিরাট সভার আয়োজন করা হয়। সভাপতি—ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ। এই সভায় রবীন্দ্রনাথ 'জাতীয় বিদ্যালয়'[২০] প্রবন্ধটি পাঠ করেন। তিনি দেশবাসীর এই শুভপ্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানিয়ে বললেন, "আমরা যে ইংরেজি লেকচারের ফনোগ্রাফ, বিলিতী অধ্যাপকের শিকলবাঁধা দাঁড়ের পাখি হইব না, এই একান্ত আশ্বাস হৃদয়ে লইয়া আমি আমাদের নূতন প্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিদ্যামন্দিরকে আজ প্রণাম করি।"

এখানে একটি মন্তব্য করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে ,জাতীয় শিক্ষার আদর্শ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে যে অভিমত প্রকাশ করলেন তাতে তিনি একদেশদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন, তাই তাঁর মত সম্পূর্ণ অভ্রান্ত নয়। 'জাতীয়' কথাটির আপেক্ষিক তাৎপর্য নির্ণয় করে তিনি শিক্ষার যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন প্রকৃত জাতীয়তার দিক থেকে তা সমর্থন করা মুস্কিল। এ সম্বন্ধে শ্রদ্ধাস্পদ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় খুবই যুক্তি-সিদ্ধ একটি মন্তব্য করেছেন—

রবীন্দ্রনাথ এই সব প্রবন্ধে জাতীয় শিক্ষার যে চিত্র আঁকিলেন ও আদর্শের যে ব্যাখ্যা দিলেন, তা যে কতখানি ভারতীয় বিচিত্র সংস্কৃতির শিক্ষাদর্শকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছে সে বিষয়ে গভীর সন্দেহ আছে। রবীন্দ্রনাথ যাহাকে জাতীয় শিক্ষার আদর্শ বলিয়া প্রচার করিলেন, তাহা যথার্থত হিন্দুদের ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আদর্শ, তাঁহার শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের আদর্শ। বলা বাহুল্য, তখন পর্যন্ত শান্তিনিকেতনের আদর্শে হিন্দু ব্যতীত অন্য কোনো ধর্মের লোকের স্থান নির্দিষ্ট হয় নাই ; এমন কি হরিজনদেরও স্থান পাওয়া কঠিন ছিল ; সুতরাং রবীন্দ্রনাথের এই আদর্শকে সর্বদেশ,

২০ বর্তমান 'বসুমতী সাহিত্য মন্দির'-এর গৃহেই পরিষৎ-কর্তৃক জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রবন্ধটি 'শিক্ষা' গ্রন্থে সংকলিত।

সর্বজাতি গ্রহণ করিতে পারে নাই বলিয়া উহাকেও 'জাতীয়' বলা যায় না।[২১]

চট্টগ্রামের কবি জীবেন্দ্রকুমার দত্তও তখন ভাণ্ডারে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-বিষয়ক মতের এই ত্রুটির কথা উল্লেখ করেছিলেন।

সংগীতের মাধ্যমে দেশবাসীর মনে আবেগ জাগানো সহজেই সম্ভব। মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলির চেয়ে তাঁর স্বদেশী গান ও কবিতাগুলিই এই আন্দোলনে গতি-বেগ সঞ্চার করার ব্যাপারে অনেক বেশি কাজে লেগেছে। সংগীত রচনায় এ সময় তাঁর লেখনীও বিস্ময়কর অকৃপণতার পরিচয় দেয়। ১৩১২ সালের ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্তিক মাত্র এই তিন মাসে ভাণ্ডার ও বঙ্গদর্শনে তাঁর ষোলটি স্বদেশী গান প্রকাশিত হয়। ভাণ্ডারে প্রকাশিত গানগুলির তালিকা—

'আজি বাংলা দেশের হৃদয় হতে' (মাতৃমূর্তি)
'মা কি তুই পরের দ্বারে' (মাতৃগৃহ)
'তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে' (প্রয়াস)
'ছি ছি চোখের জলে' (বিলাপী)

'বাউলের' অন্তর্গত—

'যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক'
'যে তোরে পাগল বলে'
'ওরে তোরা নেই বা কথা বললি'
'যদি তোর ভাবনা থাকে ফিরে যা না'
'আপনি অবশ হলি তবে'
'জোনাকি, কি সুখে ঐ ডানা দুটি মেলেছ'
'ওরে ভাই মিথ্যা ভাবনা'

ভাদ্র ও আশ্বিন
১৩১২

—কার্তিক, ১৩১২।

চিত্তরঞ্জন দাশ (১৮৭০-১৯২৫): ১৬ই অক্টোবর ১৯০৫ সালে দার্জিলিং হিন্দু হলে চিত্তরঞ্জন দাশ স্বদেশী আন্দোলনের ওপর একটি বক্তৃতা দেন।

২১ 'রবীন্দ্র-জীবনী'—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ২য় খণ্ড, পৃ ১৫০।

এটি ১৩১২ সালের পৌষ সংখ্যার ভাণ্ডারে ছাপা হয়। মতের দিক থেকে চিত্তরঞ্জন ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে অনেকখানি বৈপরীত্য ছিল। তবু তাঁদের মধ্যে এক জায়গায় একটা প্রধান ঐক্য লক্ষ্য করা যায়। দুজনেই মনে করতেন স্বদেশী আন্দোলন আমাদের আত্মনির্ভরের পথ দেখিয়েছে। কিন্তু চিত্তরঞ্জনের কাছে "জাতীয় দারিদ্র্য সমস্ত জাতির অধঃপতনের অঙ্গমাত্র।" যদিও এই দারিদ্র্যের সঙ্গে জাতির অধঃপতনের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ তবুও এ কথা তিনি স্বীকার করতেন না যে সমগ্র জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতির দিকে লক্ষ্য না দিয়ে শুধু এই দারিদ্র্য দূরীকরণের চেষ্টা সার্থক হতে পারে। স্বদেশী আন্দোলন সেই সর্বাঙ্গীণ জাতীয়-উন্নতি সাধনের ক্ষেত্রে আমাদের প্রথম উত্তম। তাই সেদিন তাঁকে বলতে শোনা যায়,

> আমাদের কাছে এই নব আন্দোলন যে যে কারণে সর্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয় তাহার মধ্যে সর্বপ্রধান কারণ এই যে, ইহা ফলত ও মূলত বাঙালী জাতির আত্মনির্ভর পথে প্রথম পদক্ষেপ।

বয়কটকে তিনি বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন বলে মনে করতেন না। "Boycott ও স্বদেশীয়তা এ দুইই স্বদেশপ্রেমভাবাপন্ন। বৈষ্ণব কবিদের ভাষায় বলিতে গেলে Boycott পূর্বরাগ, স্বদেশীয়তা মিলন।" বয়কটের এই নতুন বৈষ্ণবীয় ব্যাখ্যা রাজনীতিজ্ঞ নয়, কবি চিত্তরঞ্জনের দ্বারাই দেওয়া সম্ভব হয়েছিল।

চন্দ্রনাথ বসু (১৮৪৪-১৯১০): ভাণ্ডারে প্রকাশিত চন্দ্রনাথ বসুর একটি প্রবন্ধের শুধু নামোল্লেখ করা হল—'উপর নীচের মিলন' (শ্রাবণ ও কার্তিক, ১৩১২)। প্রবন্ধটির মধ্যে লেখক গণ-সংযোগের উপায় নিয়ে আলোচনা করেছেন। আলোচনায় লেখকের চিন্তাশক্তির বৈশিষ্ট্যের কোন পরিচয় নেই।

দুটি কবিতা: কবিতার সংখ্যা ভাণ্ডারে খুবই কম। সেগুলির মধ্যে দুটি কবিতার উল্লেখ করছি। বিজয়চন্দ্র মজুমদারের 'ভারত-পতাকা' (আশ্বিন, ১৩১৩) এবং একজন অজ্ঞাতনামা কবির 'নববর্ষ' (বৈশাখ, ১৩১৪)। হয় তো রাজনৈতিক কারণেই 'নববর্ষের' কবির নাম ছাপা হয় নি। এই কবিতাটির কিছুটা অংশ এখানে উদ্ধৃত করে ভাণ্ডার-প্রসঙ্গ শেষ করলাম—

> অন্নাভাবে জলাভাবে ওষ্ঠাগত-প্রাণ,
> তার উপরি মহামারি রচিছে শ্মশান!

ততোধিক রাজরোষ তীব্র কষাঘাত
করেছে অধীর ;
গলায় পরেছি ফাঁস
আমরা দুর্বল দাস,
রুদ্ধশ্বাস, রুদ্ধভাষ,
লুণ্ঠিত শরীর ;
কারাগৃহে কত ভাই ক্ষয়িছে জীবন !
কি সুখে সম্ভাষি তোমা বরষ নূতন ?

নব্যভারত

নব্যভারতের আত্মপ্রকাশ ১২৯০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে। ১৩৩১ সাল পর্যন্ত এটি চলেছিল। এই বিয়াল্লিশ বছরের মধ্যে সুদীর্ঘ আটত্রিশ বছর অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পত্রিকাটি পরিচালনা করেন দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী। তাঁর মৃত্যুর পর এটির সম্পাদনার ভার পড়ে তাঁর পুত্র প্রভাতকুসুম রায়চৌধুরীর ওপর। তিনিও বেশ যোগ্যতার সঙ্গেই এই দায়িত্ব পালন করেছিলেন। দুবছর পরে প্রভাতকুসুমের অকাল-মৃত্যু ঘটলে তাঁর স্ত্রী ফুল্লনলিনী রায়চৌধুরী পত্রিকাটির ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু নানা কারণে আর দুবছর পর থেকেই এটির প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়।

নব্যভারতে গল্প বা উপন্যাস প্রকাশিত হত না; এবং এটাই ছিল পত্রিকাটির সব চেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুদীর্ঘকাল এই বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা এক দুঃসাহসিক শক্তিমত্তার পরিচয়। গল্প-উপন্যাসের মূল্য-বিচার সম্বন্ধে দেবীপ্রসন্নের সচেতনতা মোটেই অস্পষ্ট ছিল না এবং তিনি নিজেও কয়েকটি উপন্যাস রচনা করেছিলেন। তবু যে তিনি তাঁর পত্রিকায় গল্প-উপন্যাসকে স্থান দেন নি তার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। গল্প-উপন্যাসের ছড়াছড়ি তখন প্রায় সব পত্রিকাতেই। কিন্তু ভাল প্রবন্ধ ও কবিতার স্থান ছিল মাত্র কয়েকটিতে। দেবীপ্রসন্ন চেয়েছিলেন এমন একটি লেখক ও একটি পাঠকগোষ্ঠী তৈরি করতে যাঁরা প্রবন্ধ ও কবিতার প্রকৃত কদর বুঝবেন এবং যার ফলে বাংলা সাহিত্যের এই দুটি ধারার, বিশেষ করে প্রবন্ধের, মূল্যমানের উন্নয়ন সম্ভব হবে। দেবীপ্রসন্নের এই মহান উদ্দেশ্য যে অনেকখানি সার্থক হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এমন একটি লেখকগোষ্ঠী তিনি গড়ে তুলেছিলেন যাঁদের লেখায় অনুশীলন এবং অধ্যবসায়, পাণ্ডিত্য এবং বৈদগ্ধ্যের পরিচয় প্রচ্ছন্ন রয়েছে। আর আশানুরূপ একটি পাঠকগোষ্ঠীও যে তৈরি হয়েছিল তা সহজেই বোঝা যায় যেহেতু তাঁর পত্রিকার অকাল-মৃত্যু ঘটে নি।

নব্যভারতে বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ ও কবিতা প্রকাশিত হত। এতে যাঁরা স্বাদেশিকতা-মূলক প্রবন্ধ লিখতেন তাঁদের মধ্যে দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, সৈয়দ আবু মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, নগেন্দ্রনাথ

চৌধুরী, বিনয়কুমার সরকার, বিধুভূষণ দত্ত এবং চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে কেউ একটিমাত্র আবার কেউ-বা একাধিক প্রবন্ধ এতে লিখেছিলেন। কিন্তু স্বদেশী-তত্ত্ব ও তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থার বিচার-বিশ্লেষণের দিক থেকে প্রত্যেকটি প্রবন্ধই মূল্যবান। সন্ত্রাসবাদ এবং চরম নীতির প্রত্যক্ষ পোষকতা এগুলিতে লক্ষ্য করা যাবে। স্বদেশী আন্দোলনের শেষের দিকে পত্রিকাটির সুর যদিও কিছুটা বদলে গিয়েছিল তবু এই আন্দোলনের মূল নীতির প্রতি তার সমর্থন একটুও কমে নি।

দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী (১৮৫৪-১৯২০): দেশবাসীর দুরবস্থা, তার কারণ ও প্রতিকারের উপায়, সরকারী মনোভাব ও ব্যবহার প্রভৃতি প্রসঙ্গে দেবীপ্রসন্নের যে প্রবন্ধগুলি নব্যভারতে প্রকাশিত হয় সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য—'নিরাশার আশা, গোলামগিরির পরিণতি' (অগ্রহায়ণ, ১৩১২) 'কর্মসাধন' (চৈত্র, ১৩১২), 'বিদেশী-বর্জন ও স্বদেশী-গ্রহণ' (আষাঢ়, ১৩১৩), 'স্বপ্ন' (চৈত্র, ১৩১৩), 'সমাধান' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪), 'অশ্রু' (বৈশাখ, ১৩১৮), '৭ই আগষ্ট' (আশ্বিন, ১৩১৮) এবং '৩০শে আশ্বিন' (অগ্রহায়ণ ১৩১৯)[১]।

'নিরাশার আশা, গোলামগিরির পরিণতি' একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ। এতে লেখক জাতীয় চরিত্রের দোষ-ত্রুটি বিশ্লেষণ করে তা সংশোধনের উপায় নির্দেশ করেছেন।

> বর্তমান সময়ে আমাদেরও জিজ্ঞাস্য এই, অনরেবল্ মিঃ জে চৌধুরী ও মিঃ অম্বিকাচরণ মজুমদার লাটসাক্ষাৎপ্রার্থী হইয়া অগ্রাহ্য হইলেন, ভারত-সভা ও বঙ্গ জমিদার-সভার সম্পাদকগণ লাটসাক্ষাৎপ্রার্থী হইয়া অগ্রাহ্য হইলেন—তবুও এখনও মান আছে?…এখনও কংগ্রেসে আবেদন-নিবেদনের ব্যবস্থা হইতেছে। আমরা বুঝিতেছি না, এ দেশের শিক্ষিত লোকদিগের চর্মের কত নিম্নে মান-ইজ্জৎ লুক্কায়িত হইয়াছে!
>
> …এই যে ইংরেজ দাসত্বের মায়ায় প্রলুব্ধ করিয়া আপনজনকে শত্রুরূপে প্রতিপন্ন করিয়া, অক্লেশে আমাদের দেহে শলাকা বিদ্ধ করিয়া রক্তশোষণ করিয়া সর্বস্বান্ত করিতেছেন, এই ভেদমূলক পলিশিদুর্গকে চূর্ণ করিয়া বীরের

---

১ এই প্রবন্ধগুলির প্রথম কয়েকটি লেখকের 'প্রসূন' নামক গ্রন্থে সংকলিত হয়। প্রকাশ—মাঘ, ১৩১৩।

ন্যায় আমাদিগকে পবিত্র স্বদেশ-সম্মিলন-ক্ষেত্রে একাত্ম হইয়া দাঁড়াইতে হইবে। হিন্দু-মুসলমানে বিদ্বেষ জন্মান তাঁহাদের প্রধান নীতি, হিন্দু-হিন্দুতে বিদ্বেষ জন্মান তাঁহাদের প্রধানতর নীতি। এই নীতির মূলে কুঠারাঘাত করিতে হইবে।

সে সময়ের কোন কোন নেতা মনে করতেন, স্বদেশী-গ্রহণ এবং বিদেশী-বর্জনের নীতি বঙ্গভঙ্গের জন্যেই বাঙালী গ্রহণ করেছে এবং বঙ্গভঙ্গ রদ হলেই এ নীতিরও আর কোন মূল্য থাকবে না। এই ধরনের মনোভাব সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে 'কর্মসাধন' প্রবন্ধে দেবীপ্রসন্ন লিখেছেন,

> তাঁহারা বলেন, বঙ্গবিভাগ উঠিয়া গেলেই স্বদেশীদ্রব্য-গ্রহণ প্রস্তাব প্রত্যাহৃত হইবে। এত লোক জেলে গেল, এত লোক নিষ্পেষিত হইল, এত লোক অপমানিত হইল, জলে অঙ্কিত চিহ্নের ন্যায় সে সকল কালসাগরে বিলীন হইয়া যাইবে।···হায় রে রাজভক্তি! তুমি প্রহার কর, নিষ্পেষিত কর, ঘৃণা কর, পদদলিত কর,—তবুও আমরা রাজভক্ত! রাজভক্তের দল 'নব্যভারত' ছাড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন, কেন না, ইহাতে নাকি রাজভক্তির বিরুদ্ধে অনেক কথা লেখা হয়।···সে রাজভক্তিকে ঘৃণা করি, যে রাজভক্তি স্বদেশকে ভুলিয়া যাইতে আদেশ করে। আমরা রাজার আদর কেবল রাজ্যের মঙ্গলের জন্যই করিয়া থাকি।···আমরা বলি, যে রাজনীতি দরিদ্রের উদ্ধারের জন্য অবতীর্ণ নয়, সে রাজনীতিকে আমরা আদর করিতে পারি না—ইহাতে যদি মৃত্যু বা নির্বাসন আইসে, আসুক।

এই কথাই দেবীপ্রসন্ন লিখেছেন 'বিদেশী-বর্জন ও স্বদেশী-গ্রহণ' প্রবন্ধে। বয়কটের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে তিনি এক জায়গায় মন্তব্য করছেন, "বরং পার্টিশান চিরতরে থাকুক, তবুও এদেশের পক্ষে বিদেশী-বর্জননীতি যেন পরিত্যক্ত না হয়, ইহাই আমাদের ব্যাকুল কামনা।" তাঁর আলোচনায় স্পষ্টই বোঝা যায়, স্বদেশী শিল্পের প্রসারের জন্যে সংরক্ষণ নীতির বিকল্প হিসাবেই তিনি বয়কট্‌কে সমর্থন করেছেন।

দেবীপ্রসন্ন চেয়েছিলেন ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা। তাই তথাকথিত স্বায়ত্ত-শাসন বা স্বরাজের আদর্শকে তিনি মেনে নিতে পারেন নি। বিদেশীর অভিভাবকত্বের মধ্যে থেকে কোন দেশ প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করতে পারে না। এই অভিমতই তিনি 'স্বপ্ন' প্রবন্ধের মধ্যে ব্যক্ত করেছেন—

নেতারা বলেন, স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে, অর্থাৎ ইংলণ্ডের অধীন হইয়া ভারত স্ব-স্ব-স্ব স্বপ্নে মাতিবে! নেতারা বড় ভয়ে ভীত—পুলিশের লাল প্যাগড়ী, কামানের দুর্জয় নিনাদ, ফাঁসিকাষ্ঠের কঠিন দুশ্ছেদ্য রজ্জু, সুতীক্ষ্ণ তরবারির প্রাণ-সংহারক চকিতাঘাত!—'রাজাকে ভয় করি না, কিন্তু এ সকল কি ভুলিতে পারা যায়?' স্বরাজের অর্থ গোলামীর আর একটা রূপান্তরিত অবস্থা মাত্র—যেমন স্বায়ত্তশাসন, যেমন মিউনিসিপাল শাসন ইত্যাদি। সেখানে কোন ভয় বিভীষিকা নাই, সুতরাং এখন সেই গোলামীর ধূয়া ধরিয়া অনেক লোক প্রমত্ত হইতেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ কুমিল্লায় এ কি ব্যাপার হইয়া গেল? হঠাৎ নরহত্যা!! রক্তপাতের জন্য ভারত প্রস্তুত হইতেছে? কি সর্বনাশের কথা! কুমিল্লা কি এদেশের নেতৃত্ব লইবে? হায়, হাজার হাজার লোকের করতালি, গাড়ি টানা, অভিষেক, পুষ্পবর্ষণ, স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠার সব উপকরণ তাহারা কাড়িয়া লইবে?···নেতারা বলেন, 'সাপও মারা চাই, লাঠীকেও বাঁচান চাই' অথবা 'মাছও ধরিতে হইবে, গায়ে কাদাও না লাগে।' মন্ত্রটা খুব ভাল নয় কি? সশরীরে স্বরাজত্বের ষোল আনা সম্মান আকাশ হইতে পড়িবে—অথচ রাজা কিছু করিতে পারিবে না! টলস্টয় মূর্খ, ম্যাট্‌সিনি মূর্খ, ক্রুগার বোকা, তাই নির্বাসন-কষ্টে জীবন শেষ করিলেন! জীবন্ত মানুষ দেখিতে চাও যদি তবে আমাদের নেতাদের গভীর গর্জন শ্রবণ কর!

সন্ত্রাসবাদ বা বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের অনুকূলে দেবীপ্রসন্নের মনোভাব এই প্রবন্ধে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 'সমাধান' প্রবন্ধে তিনি পরিষ্কার ভাষাতেই গুপ্ত সমিতিগুলির প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করলেন। স্বদেশী আন্দোলন ও সন্ত্রাসবাদের প্রকৃতিতে একটা বড় রকমের মৌলিক পার্থক্য থাকলেও সেদিন এ দুয়ের মধ্যে একটা সম্বন্ধ গড়ে তোলার চেষ্টা দেখা দিয়েছিল। এই প্রবন্ধে দেবীপ্রসন্নের সেই চেষ্টারই পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে যদিও কিছুকালের মধ্যেই তাঁর মতের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। তিনি লিখলেন,

সরব আন্দোলনের পরিচ্ছেদ পরিসমাপ্ত হইয়াছে, এখন নীরব আন্দোলনের পরিচ্ছেদ আরম্ভ হইল। প্রকাশ্য ভলেণ্টিয়ারের রাজত্ব পরিসমাপ্ত হইল, এখন গুপ্ত সমিতি ও নিহিলিষ্টের রাজত্ব আরম্ভ হইল। তুমি ভয়কেও বাঁচাইয়া রাখিবে এবং স্বদেশও জাগিবে, কখনও সম্ভব কি?

> তুমি পৈতৃক প্রাণটা এবং সকল স্বার্থকে সংরক্ষিত করিবে, অথচ দেশটা জাগিয়া উঠিবে? অসম্ভব তাহা।...এতদিনে স্বদেশী আন্দোলনের এক পরিচ্ছেদ পরিসমাপ্ত হইল। এখন দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ আরম্ভ হইল।

কয়েক বছর পরে লেখা 'অশ্রু' প্রবন্ধে দেখি দেবীপ্রসন্নের মত একেবারে বদলে গেছে। এই কবছরে সন্ত্রাসবাদের রূপ যেভাবে প্রকট হয়ে উঠল তিনি হয়তো সেটা আশা করেন নি। অথবা দেশ যে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের জন্যে একেবারেই প্রস্তুত নয় এ সত্য বোধ হয় উপলব্ধি করেন নি। তাই এই প্রবন্ধে তাঁকে সম্পূর্ণ উল্‌টো কথা বলতে শোনা গেল,

> কিন্তু অত্যাচারের পরিবর্তে অত্যাচার, এ কেমন কথা? সাত্বিক ভারতের ইহা ধর্ম নয়।...আমরা ভ্রাতৃহন্তা হইয়া দাঁড়াইলাম, তাই কত ভাই বিপথে গেল।...এস ভাই, দিবারাত্র এই মরুভূমিতে বসিয়া কেবল অশ্রুর সাধনা করি।

'৭ই আগষ্ট' প্রবন্ধটি বয়কটের সমর্থনে লিখিত হলেও সরকারকে তুষ্ট করার মনোভাব এতে সুস্পষ্ট। স্বদেশী আন্দোলনের শেষের দিকে দেবীপ্রসন্নের মত অনেকটা বদলে গেলেও তার একটা অংশ ছিল সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত। বঙ্গভঙ্গ রদ হবার পর থেকে রাখি-বন্ধন উৎসব অব্যাহত থাকবে কিনা এ ব্যাপারে নেতাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। ১৩১৯ সালের ২৪শে আশ্বিন সঞ্জীবনী পত্রিকায় রাখি-বন্ধন না করার পক্ষে মত প্রকাশ করা হয়। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র, লিয়াকত হোসেন প্রমুখ নেতারা রাখি-বন্ধন উৎসব পালন করার নির্দেশ দেন। এই মতভেদের ব্যাপার নিয়ে লেখা '৩০শে আশ্বিন' প্রবন্ধে দেবীপ্রসন্ন মন্তব্য করলেন,

> আমরা জানি, শুধু পার্টিশন্ রাখী-বন্ধনের কারণ নয়। বয়কটও তাহার অভিব্যক্তি নয়। শুধু পার্টিশন্ তাহার কারণ হইলে নব-পার্টিশনে তাহা গেল কেন? কোন্ পার্টিশন্ ভাল...এ স্থান সে বিচারের জন্য নয়। পার্টিশন্ তখনও ছিল এখনও আছে,—আরো মূর্তিমান হইয়া আসিয়াছে। বাঙলা ভাষাভাষী তখনও বিভক্ত এখনও বিভক্ত। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজসাহী পাইয়াছি, কিন্তু দিয়াছি কি? আসাম, উৎকল, বেহার, ভাগলপুর,

ছোটনাগপুর।···যদি পার্টিশন্ শুধু রাখী-বন্ধনের কারণ হইত, তবে তাহা এমন করিয়া যাইত না।···জেদ রক্ষা হইয়াছে, স্বার্থ সাধিত হইয়াছে আর রাখী-বন্ধনকে নেতারা রাখিবেন কেন ?

ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী : নব্যভারতের প্রবন্ধলেখকদের মধ্যে ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। বঙ্গভঙ্গের পরে নব্যভারতে তাঁর অনেকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় যেগুলির মধ্যে স্বচ্ছ চিন্তাশক্তি এবং বিশ্লেষণ-নিপুণতার যথেষ্ট পরিচয় রয়েছে।[২]

নব্যভারতের পৃষ্ঠায় তাঁর যে লেখাগুলি ছড়িয়ে রয়েছে সেগুলি গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয় নি বলেই জানা যায়। এখানে এই কটি প্রবন্ধের নাম করা হল,—'নবভারতের স্বদেশ-প্রীতি' (বৈশাখ, ১৩১২), 'রাজভক্তের স্বদেশানুরক্তি' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২), 'ভারতের রাজনীতি' (শ্রাবণ, ১৩১২), 'ভারতের প্রজানীতি' (ভাদ্র, ১৩১২), 'জয়কালে ক্ষয় নাই, মরণকালে ওষুধ নাই' (অগ্রহায়ণ, ১৩১২), 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়' (পৌষ, ১৩১২), 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ভারতবাসী' (চৈত্র, ১৩১২), 'ভারতের শিল্প-বাণিজ্য' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৩), 'ভারতে ব্রিটিশ শান্তি' (ফাল্গুন, ১৩১৩), 'বঙ্গে নবশক্তির অভ্যুত্থান' (আশ্বিন, ১৩১৪), 'কংগ্রেস' (মাঘ, ১৩১৪) এবং 'ভারত শাসনে ব্রিটিশ রাজশক্তির স্থান' (চৈত্র, ১৩১৪)।

এই প্রবন্ধগুলির প্রায় প্রত্যেকটিতেই বিপ্লবী-চেতনাকে সমর্থন জানান হয়েছে। কংগ্রেসের নরম-নীতির কঠোর সমালোচনায়, ইংরেজ-রাজত্বের অবসান আর পূর্ণ স্বাধীনতার উদগ্র কামনায় প্রবন্ধগুলি পরিপূর্ণ। তবে অনেকগুলি প্রবন্ধের আলোচনা বেশ তথ্য-বহুল। এখানে শুধু কয়েকটি থেকে তাঁর লেখার কিছু পরিচয় দেওয়া হল। 'ভারতে ব্রিটিশ শান্তি' প্রবন্ধে লেখক এক জায়গায় বলছেন,

> ইংরাজের যে সুশাসন সে তো একটা মস্ত মিথ্যা কথা। কেননা দেড়শত বৎসরের শাসনের পরেও যদি ইংরাজের এদেশে থাকিবার এই মাত্রই অজুহাত হয় যে, সে চলিয়া গেলে আমরা আপনারা পরস্পর মারামারি করিয়া উৎসন্ন যাইব, তবে ইংরাজ এতদিন এ দেশে কি উপকার

২ এই প্রসঙ্গে ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর 'সংস্কার ও সংরক্ষণ' গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য। প্রকাশ—১৩১৭।

করিয়াছে? এর পরও যদি আমাদের মারামারি কাটাকাটি করিয়াই শেষ মীমাংসায় উপনীত হইতে হয় তবে সে কাজটি আর এক মুহূর্তের জন্যও ফেলিয়া রাখা কর্তব্য নহে। আর দেরি করিলে ইংরাজের অনুগ্রহে আমাদের সে শক্তিও লোপ পাইবে।...আমাদের বাক্যের স্বাধীনতা যতদিন মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকের মধ্যে আবদ্ধ ছিল ততদিন কিছু গোল হয় নাই, কিন্তু যেই সর্বসাধারণকে এই স্বাধীনতার অংশভাগী করিবার জন্য স্বদেশী আন্দোলনের আয়োজন করিলে, অমনি পুলিশ রেগুলেশন লাঠির জোরে সভা ভাঙিয়া দিল। যতক্ষণ বাক্যের স্বাধীনতায় ইংরাজের সুবিধা, ততক্ষণ তোমার স্বাধীনতা, কিন্তু যখনই তুমি ইহাকে তোমার প্রকৃত স্বাধীনতার যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিবে, অমনি ইহা তোমার নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হইবে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। কংগ্রেস যতদিন কংগ্রেসে আবদ্ধ, ততদিন বাক্যের স্বাধীনতা, কিন্তু আজ যদি কংগ্রেস গ্রামে প্রবেশ করিয়া অশিক্ষিত চাষাকে তাহার রাজনৈতিক অধিকারের কথা শিক্ষা দিতে আরম্ভ করে, যে কথা নৌরজী মহাশয় বলিয়া গিয়াছেন এবং যাহা extremist মহোদয়েরা এই পাঁচবৎসরাধিককাল বলিতেছেন, তবে ইংরাজরাজত্বের এই মহিমা ফুৎকারে উড়িয়া যাইবে, তাহার চিহ্নও থাকিবে না। স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাস তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত।

'বঙ্গে নবশক্তির অভ্যুত্থান' প্রবন্ধটি যুগান্তরের মামলার ব্যাপার নিয়ে লেখা। শ্রদ্ধেয় ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত সেদিন পুলিশ কোর্টে দাঁড়িয়ে সগর্বে বলে এসেছিলেন যে তিনি ইংরেজ-শাসনকে মানেন না, একমাত্র স্বদেশের অস্তিত্বকেই তিনি স্বীকার করেন, আর এই স্বদেশের সেবাই তাঁর ব্রত। সেদিন বিপিনচন্দ্র পালও বলেছিলেন, সাক্ষ্য তিনি দিতে পারবেন না, কারণ ইংরেজ-শাসনের চেয়েও বড় তাঁর নিজের বিবেক। এই প্রসঙ্গে ধীরেন্দ্রনাথ লিখছেন,

নবীন ভূপেন্দ্রনাথ শক্তির একদিক দেখাইয়াছেন, প্রবীণ বিপিনচন্দ্র আর একদিক দেখাইলেন। বড় সাধে সে বিপিনচন্দ্রকে সাক্ষী মানিয়াছিল, মনে করিয়াছিল, এক ঢিলে দুই পাখী মারিবে। কিন্তু "উল্টা বুঝিলি রে রাম।" বিপিনচন্দ্র সদর্পে বলিলেন, "আমি সাক্ষ্য দিব না।" এ বিকট উত্তরের জন্য আদালত আদৌ প্রস্তুত ছিল না, তাই ধাক্কা সামলাইতে কিছুক্ষণ লাগিল, শেষে কাষ্ঠ হাসি ভর করিয়া দাঁড়াইল।...বিপিনচন্দ্রের

উক্তিও এক মহা রাজনৈতিক ঝড়ের সূচনা করিতেছে। তিনি বলিতেছেন, "আমি শপথ করিব না, কেন না, ইংরেজের প্রভুশক্তিকে সকলের উপর বলিয়া মানি না, তার উপর আমার বিবেক। প্রজাশক্তি দলন করিবার জন্য তোমরা এই বেআইনী মোকর্দমা উপস্থিত করিতেছ, সুতরাং তাহার অংশী আমি হইব না, তোমাদের যা ইচ্ছা হয় কর।" ভূপেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "হে ইংরাজ, আদর্শক্ষেত্রে তোমার প্রভুশক্তির উপর আমার 'মা'।" বিপিনচন্দ্র বলিয়াছেন, "হে ইংরাজ, কার্যক্ষেত্রে তোমার প্রভুশক্তির উপর আমার 'আমি'— সমবেত প্রজাশক্তির প্রতিনিধি 'আমি'।" এই আদর্শক্ষেত্র ও কর্মক্ষেত্র যদি একত্রিত হয়, এই 'মা' ও 'আমি' যদি মিলিত হয় তাহা হইলে মাঝখান হইতে যে আর সব মুছিয়া যাইবে, ইহা যদি ইংরাজের বোধগম্য হয়, তবে সে নিশ্চয়ই ভাবিবে, "স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।"

'ভারত শাসনে ব্রিটিশ রাজশক্তির স্থান' প্রবন্ধেও ধীরেন্দ্রনাথ এই প্রজাশক্তির জাগরণের কথাই বলেছেন—

> তিন লক্ষ লোকের দ্বারা যে ত্রিশ কোটি লোক শাসিত হইতেছে সে কেবল এক ভেল্কীবাজীর জোরে। 'ত্রিশ কোটি তিন লাখ, লাগ্ ভেল্কী লাগ্' বলিয়া একবার উল্টা ভেল্কী লাগাও, দেখিবে প্রজাশক্তির যে অশরীরী মূর্তি আজ ভারত-খণ্ডকে ধরিয়া রাখিয়াছে, সে মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবে।

ধীরেন্দ্রনাথের এই সময়কার বহু প্রবন্ধে এই ধরনের চরম মনোভাবের নির্ভীক প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। গণ-অভ্যুত্থানকে তিনি চেয়েছিলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চেয়েছিলেন, আয়ারল্যাণ্ডের মতো আত্ম-সংগঠন। কিন্তু সে সময়ের রাজনৈতিক পরিবেশে এবং দেশের অবস্থায় এ দুটি কাজ এক সঙ্গে হওয়া সম্ভব ছিল না। তাই রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সূক্ষ্ম বিচারশীল মনীষীরা আত্ম-সংগঠনের কাজেই দেশবাসীকে আহ্বান জানিয়েছিলেন।

সৈয়দ আবু মোহাম্মদ ইস্‌মাইল হোসেন সিরাজী: তখনকার মুসলমান লেখকদের মধ্যে সিরাজগঞ্জের সৈয়দ আবু মোহাম্মদ ইস্‌মাইল হোসেন সিরাজী ছিলেন অন্যতম। নব্যভারতে এঁর স্বাদেশিকতা-মূলক দুএকটি কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সিরাজীর দুটি কাব্যগ্রন্থও এই সময়ে মুদ্রিত

হয়েছিল। কবিতা ও গানের আলোচনা প্রসঙ্গে সে দুটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। নব্যভারতে প্রকাশিত তাঁর 'জলন্তপ্রাণ' (ফাল্গুন, ১৩১২) প্রবন্ধটি থেকে এখানে সামান্য অংশ উদ্ধৃত হল,

> সলিল সিঞ্চন ব্যতীত ভূমি সরস হয় না, বৃক্ষে ফল ফুল ধরে না; তেমনি হৃদয়ের রক্তদান ব্যতীত জাতীয় জীবন-তরু অঙ্কুরিত এবং মুকুলিত হয় না।…সম্প্রতি নব্যবঙ্গে বিধাতার বিশেষ আশীর্বাদ এবং ইঙ্গিতে স্বদেশপ্রেমের যে তুমুল আন্দোলন-প্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছে এই প্রবাহ-প্লাবনে দেশের নেতৃগণের মধ্যে যদি একজনও ম্যাট্‌সিনি, ওয়াশিংটন বা ওয়ালেসের মত আত্মোৎসর্গ করিতেন তাহা হইলে সত্য-সত্যই এ দেশ নব-জীবনের পথে অগ্রসর হইত।

নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী : নগেন্দ্রনাথ চৌধুরীর 'আবারও রোদন' (চৈত্র, ১৩১২) আর একটি উত্তেজনাপূর্ণ লেখা। বিদেশীর অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি পেতে গেলে যে দেশবাসীকে রক্তদান করতে হবে, নেতাদের ভিক্ষানীতিতে যে সে অত্যাচারের কোন প্রতিবিধান সম্ভব নয় এই কথাই লেখক পরিষ্কার ভাষায় জানিয়েছেন,

> যখন আমাদের অবস্থা স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি তখন আর স্বেচ্ছায় অন্ধ সাজিয়া বসিয়া থাকায় ফল কি? যতদিন ভারতে এক বিন্দু শোণিতও থাকিবে ততদিন ভারত শোষিত হইবেই হইবে। ভারত দেহে যখন শোণিতের অত্যন্ত অল্পতা উপলব্ধি হয়, তখন কর্তারা কোন একটি স্বল্পমূল্য টনিক ব্যবস্থা করেন, ইহা আমাদের আন্দোলনের ফল নহে। না করিলে তাহাদেরই শোষণের ব্যাঘাত হয়। অতএব কাঁদাকাটি ছাড়িয়া দাও; ভিক্ষা করিয়া যাহা পাইবে, নিশ্চেষ্ট হইয়া ঘরে বসিয়া থাকিলেও উহারা তাহা তোমাদিগের ঘরে সাধিয়া দিয়া যাইবে। সভা করিয়া, গলা চিরিয়া, গগন-বিদারী রোদনের রোল তুলিয়া অর্থ নষ্ট, সময় নষ্ট করিয়া মনঃকষ্ট সার করায় লাভ কি?…স্বদেশী আন্দোলন কেবল কথায় হয় না, স্বদেশী আন্দোলনে কিছু স্বার্থত্যাগ আর কিছু রুলের গুঁতা আছে বলিয়াই কি বড় রুচিকর হইতেছে না।…যদি আত্মশক্তির উপর বিশ্বাস না ছিল, যদি মায়ের পূজা সুসম্পন্ন করিতে না পারিবে তবে অকাল-বোধন কেন

করিলে? জানা উচিত মায়ের পূজা শক্তিপূজা, কথায় হয় না, বলি চাই, রুধির চাই।

বিনয়কুমার সরকার (১৮৮৭-১৯৪৯): নব্যভারতে প্রকাশিত পণ্ডিত-প্রবর বিনয়কুমার সরকারের একটি প্রবন্ধের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। 'স্বদেশ-সেবা' নামে এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ১৩১৪ সালের ভাদ্র মাসে। বিনয়কুমার তখন যুবক, কিন্তু তখন থেকেই স্বদেশ-চিন্তাতে তাঁর বেশির ভাগ সময় কাটত। আর একটা কথা। বাংলা লেখায় বিনয়কুমারের একটি বিশেষ ভঙ্গি আছে। তার পরিচয় পাওয়া যায় সুরু থেকেই। প্রথম দিকের এই রচনাটি থেকে কিছু প্রমাণ উদ্ধৃত হল।

Government সকল কাজেই বাধা দিবে, এটা জানা কথা। আমাদের কাছে যা' গুণ ও পুণ্যের জিনিষ, ওদের হিসাবে তা' দোষ ও পাপের। আমাদের Patriotism ওদের আইনে Crime. মাতৃপূজার ওপর ট্যাক্স বসিয়েছে ব'লে তো মাতৃভক্তি বা মাতৃসেবা বন্ধ করা যেতে পারে না। এ অবস্থায় Government-কেও খুসী করব, আর দেশেরও উপকার করব, এ অসম্ভব। ভগবানের অর্চনা আর স্বার্থসিদ্ধি একসঙ্গে চলতে পারে না। শ্যাম ও কুল এ দু'য়ের এককে ছাড়তে হ'বেই।

বিধুভূষণ দত্ত: বিধুভূষণ দত্তের 'বিলাতী পণ্য-বর্জনে স্বদেশী দীক্ষা' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ১৩১৩ সালের আশ্বিন সংখ্যায়। এই বছরেই ৭ই আগষ্টের উৎসবে কুমিল্লা জাতীয় বিদ্যালয়ে এটি পঠিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধটির মধ্যে লেখক আলোচনা-প্রসঙ্গে কলকাতার গোলদিঘির ঐতিহ্যের একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। এখানে শুধু সেই অংশটুকু উদ্ধৃত হল—

বঙ্গীয় নব-উদ্দীপনাক্ষেত্রে গোলদিঘি রাজনৈতিক পীঠস্থান। অন্যান অর্ধশতাব্দী পূর্বে বঙ্গের অমর কবি মধুসূদন সহাধ্যায়িগণসহ ইহারই তীরে, অখাদ্য-ভক্ষণ, সুরাপান ইত্যাদি পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষার ও সভ্যতার (?) স্রোত 'ইয়ং বেঙ্গল' অর্থাৎ নব্যবঙ্গসমাজে প্রবাহিত করিয়া প্রাচীনের সহিত নবীনের সমর ঘোষণা করেন। প্রথম অবস্থায় যাহা হইবার তাহা হইল।...দেশের সমস্ত চিত্তবৃত্তি বহির্মুখীন হইল; ইংরাজ তাহাদের চক্ষে দেবতা;

তাহাদের অনুকরণই কর্তব্য বিবেচিত হইল। কালের কুটিল গতিতে আবার ঠিক সেই স্থানেই বর্তমান বঙ্গীয় যুবকসমাজ অর্ধশতাব্দীর পরে ঘরে ফিরিয়াছে, দেশ চিনিয়াছে। গোলদিঘির ধারে প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে মাতৃমন্দিরে আহ্বান করিয়া যুবকবৃন্দকে যে উৎসাহপূর্ণ উপদেশ দেওয়া হইত, বঙ্গের প্রতি পল্লীতে পল্লীতে আজ তাহার প্রতিধ্বনি শ্রুত হইতেছে।... দেশের সমস্ত নেতৃবৃন্দের পাদস্পর্শে সেই পীঠস্থান ধন্য। এই গোলদিঘির তীরে দাঁড়াইয়াই অঙ্গচ্ছেদে অশৌচগ্রস্ত-যুবকগণ তিন দিন নগ্ন পদে উত্তরীয় ধারণ করিয়াছিলেন।...যেদিন অঙ্গচ্ছেদের ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইল, সেদিন কলিকাতার সমস্ত কলেজের ছাত্রবৃন্দ দেখিতে দেখিতে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া গোলদিঘিতে সমবেত হইল। অদ্ভুত-কর্মী, প্রকৃত ত্যাগী স্বর্গীয় রমাকান্ত রায়ের কার্যক্ষেত্রও এই গোলদিঘি।...এই গোলদিঘির তীরেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়েরও সূচনা হয়! জাতীয় সংগীতের মর্মস্পর্শী ভাষায় মায়ের নাম প্রচার করিবার প্রথাও আরম্ভ হয় এই গোলদিঘি হইতে। সেই জাতীয় উদ্দীপনার বোধনকালে নিত্য নিত্য গোলদিঘির পশ্চিম পার হইতে জনৈক যুবক সুললিত কণ্ঠে—'স্বদেশের ধূলি স্বর্ণরেণু বলি, রেখ রেখ মনে ধ্রুব জ্ঞান' গান করিত।...তারপর ক্রমে ক্রমে সহরের নানা স্থানে দলে দলে স্বদেশ-প্রীতিতে মাতোয়ারা ছাত্রবৃন্দ মাতৃ-সংগীতের মিছিলও বাহির করিল। এই আন্দোলনের কেন্দ্রভূমি গোলদিঘি।

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ ১৯১১ সালের ডিসেম্বর মাসে পঞ্চম জর্জের ঘোষণা অনুযায়ী ভাঙা বাংলা আবার যুক্ত হয়; এবং এই সময় থেকে স্বদেশী আন্দোলনের স্রোত অনেকটা কমে আসে। দেশের একদল নেতা একে বাঁচিয়ে রাখতে চাইলেন আর এক দল বললেন এর প্রয়োজন শেষ হয়েছে। প্রথমে অনেকে বলেছিলেন বঙ্গভঙ্গকে উপলক্ষ্য করে স্বদেশী-গ্রহণ ও বিদেশী-বর্জন নীতি গৃহীত হলেও বঙ্গভঙ্গ রদের সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধ থাকবে না, এ নীতিকে তাঁরা অনুসরণ করে চলবেন কারণ এর ভিত্তি মহত্তর আদর্শ। কিন্তু ১৩১৯ সালে 'অরন্ধন' ও 'রাখি-বন্ধন' অনুষ্ঠানের ব্যাপার নিয়ে নেতাদের মধ্যে গুরুতর মতভেদ সৃষ্টি হল। কোন কোন পঞ্জিকায় এ বছর ৩০শে আশ্বিন 'রাখি-বন্ধন' অনুষ্ঠানের উল্লেখ করা হয়, কোন কোন পঞ্জিকায় করা হয় নি।

নেতাদের মধ্যে এই মতভেদের ব্যাপার নিয়ে চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সে সময়ে নব্যভারতে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন—'অরন্ধন ও রাখী-বন্ধন' (অগ্রহায়ণ, ১৩১৯)। প্রবন্ধটি থেকে এখানে সামান্য অংশ উদ্ধৃত হল ;

এই বেওয়ারিশ দেশে জাতীয়-জীবন-শিশুর রক্ষণা-বেক্ষণ ও প্রতিপালন জন্য অভিভাবকতা করিতে নরম-গরম বা মধ্য ও চরমপন্থী দলে কি না কলহ! এরা বলে আমরাই ঐ শিশুর মা-বাপ, ওরা বলে, যেই মা-বাপ হউক, ওটি আমাদের কলমের চারা। যতক্ষণ জিনিসটা ছিল, ততক্ষণ উভয় দলের যে কলহ-কোলাহল উত্থিত হইয়াছিল, তাহার তীব্র জ্বালা দেশের লোক এখনো সহ্য করিতেছে, আর মাঝখান হইতে কেমন সহজে এ জাতীয়-জীবনের চিত্র-পট হইতে ঐ মূল্যবান বস্তুটি—ঐ সাত রাজার ধন মাণিক চুরি হইয়া গেল, কেহই দেখিল না।…

…তোমরা স্বদেশীর আসর ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেও বাঙালীর ঘরে এখনও এমন নিষ্ঠাবান লোক অনেক আছেন, যাঁহারা স্বদেশী ভিন্ন বিদেশী ব্যবহার করেন না। সেই সকল মহানুভব ব্যক্তির পক্ষে তোমরা পতিত।

এই সময়ে কবিতার মধ্যে দিয়েও নব্যভারত উগ্র স্বাদেশিকতা প্রচার করেছিল। দেখা যায়, অনেক কবিই তখন সাময়িকভাবে উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন। ইংরেজের গোলাগুলির সামনে নির্ভয়ে দাঁড়িয়ে বুকের রক্ত ঢেলে দিতে না পারলে যে দেশোদ্ধার সম্ভব নয় এমনি একটা বিদ্রোহী মনোভাব এই সময়ে প্রকাশিত নব্যভারতের অনেক কবিতাতেই পাওয়া যায়। তা ছাড়া স্বদেশ-ভক্তির সাধারণ ভাবের কবিতাও আছে। কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—বিজয়চন্দ্র মজুমদার, কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত, গোবিন্দচন্দ্র দাস, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, অম্বুজাসুন্দরী দাশগুপ্তা, মানকুমারী বসু এবং সৈয়দ আবু মোহাম্মদ ইসমাইল্ হোসেন সিরাজী।

বিজয়চন্দ্র মজুমদার (১৮৬১-১৯৪২): নব্যভারতে বিজয়চন্দ্র মজুমদারের যে কটি কবিতা প্রকাশিত হয় সেগুলিতে উগ্র স্বাদেশিকতার কোন নিদর্শন নেই ; এই জাতীয় মাত্র দুএকটি কবিতাই তিনি লিখেছিলেন এবং

সেগুলি প্রকাশিত হয় প্রবাসীতে।[৩] এখানে তাঁর দুটি কবিতার অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত হল। প্রথম কবিতাটির নাম 'মাভৈঃ মাভৈঃ' (ফাল্গুন, ১৩০৮)—দেশের তৎকালীন অবস্থার ওপর লেখা বিদ্রূপাত্মক কবিতা; এবং দ্বিতীয়টির নাম 'প্রভাত' (আশ্বিন, ১৩১২)— দেশপ্রেমের আবেগময় সাধারণ কবিতা।

উড়ে গেল বর্ষা বাদল পুড়ে গেল ধান ;
নাহি অন্ন অবসন্ন হচ্ছে জীবের প্রাণ।
ছিল পৈতৃক ম্যালেরিয়া, প্লেগটা স্বোপার্জিত,
দু'টোয় মিলে চুলোয় দিলে সুখ-শান্তি যত।
এত টাকে তবু টিঁকে রইল রোগের মূল,
কেমনে ভাই বাঁচি প্রাণে পাই না ভেবে কূল।
কিন্তু দেশে খ্রীষ্টমাসে দেখছ না কি মজা ভাই ;
বছর বছর কেঁচর-মেচর কচ্চে দেশের কত চাঁই।
মাভৈঃ মাভৈঃ কংগেরেসে[৪] হাঁসিল কোরে দাবি,
পোক্তা যত বক্তাবাবু কবে কাবু সবি।
('মাভৈঃ মাভৈঃ')

জাগরে জাগ বঙ্গবাসী প্রভাত আসি উদিছে,
জলদ ভেদি ভাতিছে নীল গগন রে!
গৌরবেতে সৌর করে আশার কলি ফুটিছে
সৌরভেতে মোহিয়া বন-পবন রে!
হেরি পুলকে ধরা আলোকে
রঞ্জিত,
বঙ্গময় গাহরে জয়-
সংগীত। ('প্রভাত')

কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত (জন্ম, ১২৯১): ইনি ছিলেন বরিশালের অধিবাসী। এই জেলার বিখ্যাত ফুল্লশ্রী গ্রামে তাঁর জন্ম। বর্তমানে শিশু-

৩ প্রবাসীর আলোচনা দ্রষ্টব্য।

৪ এই বছর কলকাতায় কংগ্রেসের সপ্তদশ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

সাহিত্য জগতেই এই প্রবীণ সাহিত্যিক সুপ্রতিষ্ঠিত। অবশ্য আগেও ইনি শিশুদের জন্যে লিখতেন এবং সে লেখার জন্যে রবীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষীদের অকুণ্ঠ প্রশংসাও অর্জন করেছিলেন। কিন্তু স্বদেশী যুগে কবি হিসাবে এঁর যে বিশেষ পরিচয়টি ছিল আজ তা শিশু-সাহিত্যিকের পরিচয়ের আড়ালে আত্মগোপন করেছে। প্রবাসী সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে সে সময়ে বিশেষ করে তিনজন কবির লেখায় কাজী নজরুলের বিদ্রোহ-মূলক রচনার পূর্বাভাস লক্ষ্য করা যায়। তাঁরা হলেন গোবিন্দচন্দ্র দাস, বিজয়চন্দ্র মজুমদার এবং কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত। বিজয়চন্দ্রের এ ধরনের লেখা দুএকটি মাত্র, কিন্তু কার্তিকচন্দ্রের অনেকগুলি। কার্তিকচন্দ্রের এ ধরনের কবিতার দুটি সংকলনও তখন প্রকাশিত হয়েছিল ; কবিতা ও গানের আলোচনা প্রসঙ্গে সে দুটির উল্লেখ করা হয়েছে। শুধু নব্যভারতে নয় ; সন্ধ্যা, নবশক্তি, নায়ক, সুপ্রভাত প্রভৃতি সে সময়ের অনেক পত্রিকাতেই কার্তিকচন্দ্রের লেখা প্রকাশিত হত। নব্যভারতে প্রকাশিত তাঁর তিনটি কবিতার উল্লেখ করছি—'দেশের আশা আছে' (অগ্রহায়ণ, ১৩১২), 'ওদের শিশুর রক্ত চাই' এবং 'কিসের খোসামোদ' (আষাঢ়, ১৩১৩)।[৫]

'দেশের আশা আছে' কবিতাটির একটি স্তবক—

দেশের আশা আছেরে ভাই, দেশের আশা আছে !
মরলে মানুষ আবার হয়,
ভাঁটার পরে জোয়ার বয়,
নতুন ডাল গজিয়ে ওঠে, দেখছি, মরা গাছে !
দেশের আশা আছেরে ভাই দেশের আশা আছে।

সে সময়ে বাংলার কিশোর-প্রাণের ওপর যে অত্যাচার চলেছিল তাতে কবি যে কতখানি উত্তেজিত হয়েছিলেন তার প্রমাণ—

ওরা শিশুর রক্ত চায় গো, ওরা শিশুর রক্ত চায় !
পরীক্ষা আজ বিষম অতি,—
ও মোর দেশের পদ্মাবতি,
ছেলে বলির সমারোহে আয়, মা, ছুটে আয় !

৫ কবির কাছ থেকে জেনেছি, 'ওদের শিশুর রক্ত চাই' এবং 'কিসের খোসামোদ' কবিতা দুটি তাঁর 'আমার দেশ' কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়েছিল। প্রকাশ—১৯০৬।

কান্নাকাটি রাখ মা, দূরে
ও সব হবে অন্তঃপুরে,
রণাঙ্গনে মাতঙ্গিনীর বেশ তুলে দে গায় !
ওরা শিশুর রক্ত চায় গো, ওরা শিশুর রক্ত চায় !

ওরা শিশুর রক্ত চায় গো ওরা শিশুর রক্ত চায় !
একটি ছেলে দিবি বলি,
উঠ্‌বে শত মৃত্যু ঠেলি,
দেখ্‌ব এবার কত খেয়ে তৃপ্তি ওরা পায় !
জানিস্‌ তো মা, আগাগোড়া,
রক্তবীজের বংশ মোরা,
রক্ত ফুটে লক্ষ হ'ব ধ্বংস-সাধনায় !
ওরা কত রক্ত চায় গো, দেখ্‌ব, কত রক্ত চায় !

('ওদের শিশুর রক্ত চাই')

কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদনের বিরুদ্ধে কবির অন্তরের গ্লানি-মিশ্রিত তীব্র প্রতিবাদ ব্যক্ত হয়েছে 'কিসের খোসামোদ' কবিতায়। এখানে প্রথম স্তবকটি উদ্ধৃত হল—

আবার কিসের খোসামোদ ?
পায় ধরিলে কয় না কথা, তাহার সনে আত্মীয়তা ?
পিত্ত-খেকো চিত্তে আর নাইকো আত্মবোধ ?
সেই সাতান্ন[৬] হতে সুরু—ত্রক্ষণে পা করলি পুরু,
মরলি-গরু অতঃপরে দিচ্ছে না বেশ শোধ ?
অতদিন তো দেখলি সাঁচা—ও সব আশা বাঁদর-নাচা,
'রক্ষণে' কি 'লক্ষণে' নাই ভক্ষণে বিরোধ !
কাহার পদে কপাল ঠুকা, কিসের খোসামোদ ?

গোবিন্দচন্দ্র দাস (১৮৫৫-১৯১৮) : পূর্ববঙ্গের বিখ্যাত কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত। তাঁর কাব্য-গ্রন্থের সংখ্যা নগণ্য নয়।

---

৬ ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ।

স্বাদেশিকতামূলক কবিতাও তিনি অনেক লিখেছিলেন, যেগুলি তখনকার অনুরাগী পাঠকদের কণ্ঠে প্রায়ই শোনা যেত। নানা কাজে গোবিন্দচন্দ্রকে মাঝে মাঝে কলকাতায় আসতে হত। একবার তিনি নব্যভারত সম্পাদক দেবীপ্রসন্নের 'আনন্দ আশ্রমে' কিছুদিন কাটিয়েছিলেন। সেই সময় থেকেই দেবীপ্রসন্নের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা জন্মায় এবং তিনি নব্যভারতে লিখতে সুরু করেন। দারিদ্র্য-প্রপীড়িত উপেক্ষিত গোবিন্দচন্দ্রের কবিত্ব-শক্তি বিকাশের ব্যাপারে দেবীপ্রসন্ন বিশেষ সহায়তা করেছিলেন। গোবিন্দচন্দ্রের স্বদেশপ্রেমের অনেক কবিতা এখনো বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই পড়ে আছে। নব্যভারতে এই ধরনের কয়েকটি কবিতা পাওয়া যায় যেগুলির মধ্যে চারটি কোন গ্রন্থে সংকলিত হয় নি। শ্রদ্ধাস্পদ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সম্পাদনায় গোবিন্দচন্দ্রের কবিতাগুলির যে মূল্যবান সংকলনটি প্রকাশিত হয়েছে (১৩৫৫) তাতেও এই কবিতাগুলি দেখা গেল না। অবশ্য এই চারটি কবিতার একটিতে ইংরাজ-প্রীতির সুর কিছুটা ধ্বনিত হয়ে উঠেছে ('গীত ও কবিতা'—বৈশাখ, ১৩১৮); কিন্তু অন্য তিনটি কবিতা বেশ উপভোগ্য। এই কবিতা তিনটি হল—'বজ্র পেলে কই' (কার্তিক, ১৩১৮) 'নববর্ষ' (বৈশাখ, ১৩১৯) এবং 'বাঁশী' (আষাঢ়, ১৩২৩)। শেষের কবিতাটির প্রকাশকাল আমাদের নির্দিষ্ট সময়-সীমার বাইরে। গোবিন্দচন্দ্রের অন্য কবিতাগুলির মধ্যে 'আমরা হরিহর' (কার্তিক, ১৩১২) এবং 'হিন্দু-মুসলমান' (পৌষ, ১৩২০) কবিতা দুটি উল্লেখযোগ্য। এখানে দুটি কবিতা থেকে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত হল।

মরতে হ'বে মরব, তাহে ক্ষতি কিছু নাই,
পচা মরণ দিও না আর তাজা মরণ চাই।
সিংহ মরে ব্যাঘ্র মরে মহিষ মরে বনে,
বন্য পশুর ধন্য জীবন আত্ম-সমর্পণে!
ক্ষুদ্র পোকা সেও মরে রুদ্র পিপাসায়,
জলন্ত আগুনে সেও আলোর মরণ চায়।
মানুষ আমি মরব নাকি অন্ধ কারাগারে
কাপুরুষ পাতকীর মত চরণ প্রহারে?
ব্যোমের মত বক্ষ চাহি দিগ্‌দিগন্ত খোলা,
জলন্ত জ্যোতিষ্কের মত চাই সে গুলিগোলা!

কালান্ত তার তেজের ছটা জ্বলন্ত প্রলয়,
মৃত্যুমারা মৃত্যু চাহি জীবন জ্যোতির্ময়!

* * *

লহ পুত্র, লহ কন্যা, লহ ভগ্নী ভাই,
অভিমন্যুর মত বর্ষ অভয়-মৃত্যু চাই! ('নববর্ষ')

মৃত্যুকে দিয়ে মৃত্যুকে অতিক্রম করার দুর্নিবার কামনা কবি-চিত্তকে আকুল করে তুলেছিল; আর এই কামনাই প্রচণ্ড ভূমিকম্পের মতো নাড়া দিয়েছিল তখনকার যুব-শক্তিকে। 'হিন্দু-মুসলমান' কবিতাটিও এই ধরনের রচনার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। যে ভেদ-নীতির মধ্যে দিয়ে ইংরেজ-সরকার ভারতের বুকে তার শাসন-কর্তৃত্ব কায়েম রাখতে চেয়েছিল, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিরোধ সৃষ্টিতেই তার পূর্ণ সার্থকতা। কিন্তু কবি বলছেন, বাংলা দেশের অধিকাংশ মুসলমানেরই পূর্ব-পুরুষ হিন্দু। তাঁদের দেহ থেকে হিন্দুর রক্ত বাদ দিলে "কতটুকু আরব রক্ত রহে বিদ্যমান?" কবি এই প্রশ্ন তুলে তাঁদের সচেতন করে দিয়ে কবিতাটির শেষ স্তবকে লিখলেন,

হিন্দু-মুসলমান—
দু'জনেতে হও হে মাল্লা, মাঝী কর খোদাতাল্লা,
ভাসায়ে দিয়ে জীবন-তরী দাঁড়ে মার টান,
হাজার বজ্র আসুক মেঘে, চলুক তুফান ভীষণ বেগে,
আসুক ধেয়ে আকাশ ছেয়ে প্রলয় ডেকে বান!
ভক্তিভাবে কর্ম কর, কিম্বা বাঁচ, কিম্বা মর,
ঘোর তরঙ্গে রণরঙ্গে কবুল কর জান্!
বেহেস্তে ফেরেস্তা শুন, ডাক্‌ছে সবে পুনঃ পুনঃ,
নায়ের ওপর পাল তুলে দাও মায়ের আঁচলখান!
হিন্দু-মুসলমান!

গোবিন্দচন্দ্রের এই ধরনের কবিতার মধ্যেও কাজী নজরুলের রচনা-বৈশিষ্ট্যের কিছু পূর্বাভাস লক্ষ্য করা যায়। এই উদ্ধৃতাংশের একটি ছত্রে আর একটি লক্ষণীয় বিষয় আছে। 'ভক্তি ভাবে কর্ম কর, কিম্বা বাঁচ কিম্বা মর,'—এ যেন বহু বছর পরে দেশবাসীকে প্রদত্ত গান্ধীজীর কর্মাদর্শের কথা—'do or die' বা

'করেঙ্গে য়্যা মরেঙ্গে'। জাতীয় মুক্তি-সাধনার ক্ষেত্রে এই নীতির শ্রেষ্ঠত্ব ও গুরুত্ব স্বদেশী আন্দোলনের সময়েই বাঙালী উপলব্ধি করে।

বীরেন্দ্রনাথ শাসমল: বিখ্যাত ব্যারিষ্টার বীরেন্দ্রনাথ শাসমলও নব্যভারতে মাঝে মাঝে লিখতেন। কবিতা লেখাতেও এঁর হাত ছিল। এখানে দুটি কবিতার উল্লেখ করছি—'মায়ের ডাকে' (পৌষ, ১৩১২) এবং 'আমার দেবতা' (চৈত্র, ১৩১২)। এঁর লেখায় উগ্রতা তেমন নেই বটে, কিন্তু মনোভাবটি বলিষ্ঠ। 'মায়ের ডাকে' কবিতাটির এই চারটি পংক্তিতেই তার প্রমাণ রয়েছে—

যত লিখি জোরে যত পড়ি পায়
শুনিবেনা কেহ মোদের কথা
হৃদয়ের ব্যথা ঘুচাতে হইলে
দিতে হবে জেনো হৃদয়ে ব্যথা।

এই কবিতাটির চেয়ে 'আমার দেবতা' কবিতাটির ভাব এবং প্রকাশভঙ্গি উন্নততর।

তোমরা করগে গোল
পড়গে বিজ্ঞান ক'সে,
সাকার কি নিরাকার
ভাবগে আজন্ম ব'সে!
সগুণ বলিবে বল,
না হ'লে নির্গুণ ঠিক;
দ্বৈত কি অদ্বৈত তিনি,
খুঁজে মর চারিদিক!

* *

আমার দেবতা দীনা
বঙ্গভূমি মা আমার,
অনন্ত অসংখ্য গড়
যুগল চরণে তাঁর!

দুজন মহিলা কবি ঃ এই সময়ে কয়েকজন মহিলা কবিরও নাম পাওয়া যায়। এঁদের অনেকের লেখাই গতানুগতিক ধারার অনুবর্তন; তবে কয়েকজন কিছু বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছেন। এঁদের মধ্যে অম্বুজাসুন্দরী দাশগুপ্তা (১৮৭০-১৯৪৬) এবং মানকুমারী বসুর (১৮৬৩-১৯৪৩) নাম করা যায়। নব্যভারতে এঁদের কিছু কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। অম্বুজাসুন্দরীর দুটি কবিতার উল্লেখ করা হল—'অভ্যুত্থান' (আশ্বিন, ১৩১২) এবং 'স্বদেশ-সেবায়' (পৌষ, ১৩১২)।

'অভ্যুত্থান' কবিতার বিষয় বঙ্গভঙ্গ এবং কবির মূল বক্তব্য "বঙ্গচ্ছেদে দুঃখ বটে, তবু আমি ভাগ্য মানি।" কারণ এই ঘটনার আঘাতেই বাঙালী একসঙ্গে মিলেছে। 'স্বদেশ-সেবায়' কবিতার বিষয় বিদেশী-বর্জন ও স্বদেশী-গ্রহণ। কবি বাঙালী মহিলাদেরও এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করেছেন—

ছোঁব না বিদেশী বস্তু করিয়াছি পণ
এস আজ সবে মিলি,
দাঁড়াইব গলাগলি,
করিব যাহাতে হয় প্রতিজ্ঞা পূরণ।
সঁপিব জীবন-মন স্বদেশ-সেবায়
আপন প্রতিজ্ঞা স্মরি
শক্তিরে স্মরণ করি,
বঙ্গ-নিবাসিনী যত ভগ্নিগণ আয়।

মানকুমারী বসুর এই জাতীয় কবিতায় বেশ একটা বলিষ্ঠভাবের সন্ধান পাওয়া যায় যা তখনকার মহিলা কবিদের লেখায় বিশেষ সুলভ নয়। বিজাতির অন্যায় আর অত্যাচারের কথা বলতে গিয়ে স্বজাতির শক্তি-হীনতাকেও তিনি কঠিন আঘাত হেনেছেন। নব্যভারতে প্রকাশিত তাঁর তিনটি কবিতার উল্লেখ করছি—'আনন্দ-মঠ' (আশ্বিন, ১৩১২), 'আহ্বান' (বৈশাখ, ১৩১৪) এবং 'আবেদন' (চৈত্র, ১৩১৪)। 'আবেদন' একটি দীর্ঘ কবিতা। এটি থেকে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করে কবির এই জাতীয় লেখার বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেওয়া হল—

চিরদিন 'রাজভক্ত' জাতি, আজি তারা 'রাজদ্রোহী' কিসে,
'লাল টুপী লাল কোর্তা'-ধারী রক্ত পিয়ে নিমেষে নিমেষে!
প্রজাদের জাতীয় উন্নতি—মাতৃসেবা, স্বদেশ-পূজন,
তারি নাম 'রাজদ্রোহ' যদি, 'রাজভক্তি' নীরবে মরণ?

স্বেচ্ছাচারী অত্যাচারী দল মর্মগ্রন্থি ফেলিবে ছিঁড়িয়া,
অর্ধাশন অনশনে মোরা মৃতবৎ রহিব পড়িয়া ?
জননীর ধনরত্ন লুঠি যাবে চলি বিদেশী বণিক,
নিবারিতে পদাঘাত সব, আমরা কি পশু বাস্তবিক ?

মহিলা কবিদের লেখায় এই ধরনের প্রকাশভঙ্গি খুব কমই চোখে পড়ে।

সৈয়দ আবু মোহাম্মদ ইস্‌মাইল হোসেন সিরাজী ঃ এঁর একটি উল্লেখযোগ্য কাব্য নব্যভারতে প্রকাশিত হয়। কাব্যটির নাম 'নব-উদ্দীপনা' (অগ্রহায়ণ, ১৩১২)। পরে একটি গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয় (১৩১৪)। কিন্তু গ্রন্থটি দুষ্প্রাপ্য বলে এখানে তাঁর কাব্য থেকে কিছুটা অংশ উদ্ধৃত হল। সে সময়ের মুষ্টিমেয় কয়েকজন মুসলমান কবির মধ্যে সৈয়দ সিরাজীর লেখাই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। কবির মনোভাব সাম্প্রদায়িকতার বহু উর্ধ্বে হিন্দু-মুসলমানের একপ্রাণতার আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতমাতার সন্তান হিন্দু-মুসলমানকে তিনি হাতে হাত মিলিয়ে বিদেশীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্যে আহ্বান জানিয়েছেন। অত্যাচার-জর্জরিত দেশবাসীর অবস্থা সম্বন্ধে তিনি তাদের সচেতন করার চেষ্টা করেছেন,

সোনার ভারত হ'য়ে গেল ছাই
বল বীর্য ধন কিছু আর নাই !
শিল্প-বাণিজ্য লুপ্ত সব ভাই !
গোলাম মজুর সেজেছি সকলে।
উঠিতে বসিতে শয়নে স্বপনে,
চলিতে ফিরিতে কিবা সে ভ্রমণে,
শ্বেতাঙ্গের ঘুষি সদা জাগে মনে,
বুটের আঘাতে প্লীহা বিদারণে
নিত্য কত ভাই মরিছে অকালে।
'নেটিভ' 'নিগার' সদা খাই গালি,
আপত্তি করিলে বন্দুকের গুলি
ভাঙিয়া দিতেছে মস্তকের খুলি
অহো কি ভীষণ অত্যাচার হায় !

পেটে নাই অন্ন পরিধানে বাস !
অর্থ বল বিনা মানস উদাস।
কেবলি অভাব ! কেবলি হতাশ !!
ফিরিয়া চাহে না কেহই ঘৃণায়।

এই অত্যাচার-অবিচারের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে কবি ভারতবাসীকে প্রাণপণ সংগ্রামে আহ্বান জানালেন—

ভারত-সন্তান কর আজি পণ
প্রাণ দিয়া আজি লভিব জীবন ;
সাধন করিতে মায়ের কল্যাণ,
মহোল্লাসে দিব প্রাণ বলিদান,
তথাপি রব না এমনি পড়ে।
হইব না আর মথিত দলিত,
রহিব না আর অধম ঘৃণিত
সহিব না আর কোন অত্যাচার,
সহিব না আর বিন্দু অবিচার
জড়ের মতন এমনি করে।

কবি এ আশাও পোষণ করেন, যদি হিন্দু-মুসলমান একপ্রাণ হয় তাহলে "বহিবে ভারতে বিপ্লব প্লাবন, যাইবে জঞ্জাল ভাসিয়া দূরে।" সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক মনোভাব নিয়ে ইংরেজ-সরকারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে এমন বলিষ্ঠ লেখনী ধারণ করতে সে সময়ে আর কোন মুসলমান কবিকে দেখা যায় নি। তাই এই প্রসঙ্গে সৈয়দ সিরাজীর নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়।

সাহিত্য

"'কল্পদ্রুমে'র ন্যায়, যিনি যাহা চাহিবেন, তাঁহাকে সেইরূপ 'সাহিত্য' দিয়া তৃপ্ত করিব আমাদের এমন দুরাশা নাই।"—সাহিত্য-কল্পদ্রুমের সম্পাদকীয় দায়িত্ব গ্রহণ করার দুমাস পরেই পত্রিকাটির প্রথম বর্ষের শেষ সংখ্যায় 'সম্পাদকের নিবেদনে' এই কথা লিখে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি নামটাকে অনেকটা হালকা করে দিলেন। শুধু সাহিত্য নামে পত্রিকাটি প্রকাশিত হতে লাগল ১২৯৭ সালের বৈশাখ মাস থেকে। শিবপ্রসন্ন ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় সাহিত্যকল্পদ্রুম প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৯৬ সালের শ্রাবণ মাসে। এই বছরেই মাঘ মাস থেকে এর সম্পাদক হন সুরেশচন্দ্র।

অল্প সময়ের মধ্যেই সাহিত্য তৎকালীন বাঙালী পাঠক-সমাজে প্রতিপত্তি বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল; ফলে অচিরেই সাহিত্য-কল্পদ্রুমের পূর্বতন পরিচালক-নির্দেশকের প্রভাব-কর্তৃত্ব থেকে সাহিত্যকে মুক্ত করে সুরেশচন্দ্র নিজের আদর্শ অনুযায়ী একটি লেখক-গোষ্ঠী তৈরি করেন। অবশ্য তারপর ব্যোমকেশ মুস্তাফীর সম্পাদনায় সাহিত্য-কল্পদ্রুম আরও কিছুকাল প্রকাশিত হয়। সুরেশচন্দ্রের মৃত্যুর (১৭ই পৌষ, ১৩২৭) পর পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় পত্রিকাটির পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। তাঁর সম্পাদনায় সাহিত্য ১৩৩০ সাল পর্যন্ত চলেছিল।

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি (১৮৭০-১৯২১) ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৌহিত্র। কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস, সমালোচনা, সব রকম লেখাই তাঁর লেখনী থেকে বেরিয়েছে। সাহিত্য-বিচারের মাপকাঠিতে তাঁর এ সব রচনার মূল্য কতখানি সে আলোচনা এখানে অবান্তর। স্বাদেশিকতামূলক তাঁর কোন রচনা সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নি। তবে তিনি না লিখলেও দেশাত্মবোধক রচনা সাহিত্যের পাতায় কিছু কিছু পাওয়া যায়। যাঁরা লিখতেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথনাথ সেন, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, সরোজনাথ ঘোষ এবং মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৮-১৯২৯): স্বদেশী আন্দোলন নিয়ে লেখা ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি প্রবন্ধের কথা এখানে উল্লেখ করছি। "স্বদেশী আন্দোলন ও পলিটিক্স্" নামে তাঁর এই প্রবন্ধটি ১৩১২ সালের কার্তিক মাসের সাহিত্যে প্রকাশিত হয়। কুখ্যাত কার্লাইল সার্কুলার জারি হওয়ার কিছুদিন আগে প্রবন্ধটি লেখা। তখন সবেমাত্র স্টেট্স্ম্যান পত্রিকায় সার্কুলারটি সম্বন্ধে একটু আভাস বেরিয়েছিল। স্বদেশী আন্দোলনকে তখনকার ইংরেজ সরকার এবং সরকারপক্ষের লোকেরা একটা জটিল পলিটিক্স্ আখ্যা দিয়ে তাতে ছাত্রদের যোগ দেওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দেয়। কিন্তু আসলে এই আন্দোলনের সঙ্গে পলিটিক্সের কতটুকু খাদ মিশান আছে এবং তাতে ছাত্ররা যোগ দিলে তাদের সুবুদ্ধি না কুবুদ্ধির পরিচয় দেবে, সে সময়ের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি নিয়ে ললিতকুমার এই প্রবন্ধে পরিষ্কার ভাবে আলোচনা করেছেন।

> বৃটিশ শাসিত ভারতবর্ষে কোন্‌টা পলিটিক্স্, কোন্‌টা পলিটিক্স্ নহে, ইহা স্থির করা শক্ত।···আমাদের ছাত্রজীবনে ইল্‌বার্ট-বিল্ লইয়া ঘোরতর আন্দোলন হইয়াছিল। সাহেব-মেম ফৌজদারী মোকদ্দমায় আসামী বা ফরিয়াদী হইলে এদেশী হাকিম তাহার বিচার করিতে পাইবে কিনা ইহা লইয়া তর্ক উপস্থিত হইয়াছিল। কথাটা অতি সহজ, আইন ও আইনগত অধিকার লইয়া। কিন্তু এ দেশের জলবায়ুর দোষে বা আমাদের অদৃষ্টদোষে বিষয়টা অনতিবিলম্বেই পলিটিক্স্ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বিজেতা ও বিজিত জাতির মধ্যে একটা বিদ্বেষ-বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল। আবার আজকাল স্বদেশী আন্দোলন লইয়া নূতন করিয়া এই প্রশ্ন উঠিয়াছে,—ইহা পলিটিক্স্ কি না? দেশের লোক দেশের শিল্পীর প্রস্তুত জিনিস ব্যবহার করিয়া দেশের ধনবৃদ্ধি করিবে, বিদেশী জিনিস কিনিয়া বিদেশীর পায়ে অজস্র টাকা ঢালিয়া দেশটাকে দিন দিন নিঃস্ব করিয়া তুলিবে না, ইহারই নাম স্বদেশী আন্দোলন। কথাটা অত্যন্ত সোজা। পলিটিক্স্ বলিলে সহজবুদ্ধিতে লোকে যাহা বুঝে ইহা ত তাহার ত্রিসীমানায়ও আসে না। এটা অর্থনীতির কথা, বড় জোর সমাজনীতির কথা, রাজনীতির বা রাষ্ট্রনীতির নহে। কিন্তু সরকার বাহাদুরের ঘোষণা অন্যরূপ। লোকে দেখিয়া শেখে, এবং ঠেকিয়া শেখে। আমরাও ক্রমে বুঝিতে পারিতেছি যে, যাহাতে

বিজেতা জাতির স্বার্থের সহিত বিজিত জাতির স্বার্থের সংঘর্ষ অপরিহার্য, এবং সেই সংঘর্ষে বিজেতা জাতির স্বার্থহানির সম্ভাবনা আছে, তাহাই বৃটিশ-শাসিত ভারতবর্ষে পলিটিক্‌স্ আখ্যা লাভ করে।

আত্মরক্ষা এবং আত্মোন্নতির উদ্দেশ্যেই স্বদেশী আন্দোলনের সৃষ্টি। কোন বিদ্বেষ বা জাতক্রোধের মধ্যে দিয়ে এর জন্ম হয় নি। তাই তখন অনেকেই ধারণা করেছিলেন যে, ছাত্ররা যদি এতে যোগ দেয় তাতে ক্ষতি নেই। এই ধারণার বশবর্তী হয়েই ললিতকুমারও এই আন্দোলনে তাদের যোগদান সমর্থন করেছিলেন। তর্কের খাতিরে যদি একে রাজনৈতিক আন্দোলনই বলতে হয় তবু, তাঁর মতে, এতে ছাত্রদের যোগদান করা অন্যায় নয়; কারণ ললিতকুমার মনে করতেন, "আমাদের ছাত্রগণ রুসিয়া, জার্মানী, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের ছাত্রগণের ন্যায় রাজবিপ্লব ঘটায় নাই, ঘটাইবেও না।" তবে নতুন রক্তের অসহিষ্ণুতায় যদি দুএকটা বে-আইনী কাজ করেই বসে, কর্তৃপক্ষের স্নেহময় মৃদু ভর্ৎসনাতেই তার প্রতিবিধান সম্ভব। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখছেন,

> আমাদের শাস্ত্রে আছে পরমযোগী মহাদেবেরও দুইবার চিত্তবিকার জন্মিয়াছিল। একবার দক্ষযজ্ঞে দেবাদিদেব মহাদেবকে ছাঁটিয়া ফেলিয়া অন্য সমস্ত দেবতা নিমন্ত্রিত হইলে, তিনি সতীর অবমাননায় যজ্ঞ ধ্বংসের জন্য উদ্যোগী হইয়াছিলেন। আর একবার কামনার পূর্ণমূর্তি কন্দর্পের বিলাস-লাস্যে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে ভস্মসাৎ করিয়াছিলেন। আমাদের দেশের ধীরচিত্ত ছাত্রগণেরও দুইবার ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়াছে। একবার বঙ্গদেশ ছাঁটিয়া বাঙলা-বিভাগ গড়াতে মাতৃভূমির অবমাননায় তাহারা উত্তেজিত হইয়াছে। আর একবার বিলাতী বণিকের বিলাসোপকরণ সিগারেটের রাশি সজ্জিত দেখিয়া তাহা ভস্মসাৎ করিয়াছে। এ উত্তেজনা স্বাভাবিক, ইহা রোধ করা শমপ্রধান বৃদ্ধেরও অসাধ্য, উষ্ণশোণিত যুবকগণের তো কথাই নাই। একটা কিংবদন্তী আছে, "পৃথিবীর সর্বত্র ভূমিকম্প হইলেও কাশীতে ভূমিকম্প হয় না; কেন না কাশী শিবের ত্রিশূলের উপর আছে।" কর্তৃপক্ষেরও সেইরূপ ধারণা; সমস্ত বঙ্গ-সমাজ আলোড়িত হইলেও ছাত্রদিগের হৃদয় কম্পন অনুভব করিবে না; কেন না তাহারা পেড্‌লার সাহেবের ত্রিশূলের উপর আছে। এই ত্রিশূলের এক ফলা বিশ্ববিদ্যালয়, আর এক ফলা শিক্ষা-বিভাগ (Department of Public Instruction),

তৃতীয় ফলা পাঠ্য-নির্বাচন-সমিতি (Text-Book Committee) রূপে বিরাজমান। তবে এ কলিকাল কিনা, তাই কাশীতেও ভূমিকম্পের কথা শুনি। আমাদের শাসন-তন্ত্রেও ঘোর কলির প্রকোপ, তাই ছাত্রদিগের হৃদয়ও উদ্বেলিত হইয়া পড়িয়াছে।

আলোচনা-প্রসঙ্গে ইংরেজী শিক্ষা-দীক্ষার জন্যে ইংরেজের কাছে ঋণ স্বীকার করতেও লেখক ভোলেন নি। প্রবন্ধটির মধ্যে ললিতকুমারের সরস রচনাভঙ্গির সঙ্গে বলিষ্ঠ মতবাদের একটি অপূর্ব সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। এ ধরনের লেখা সাহিত্যে বিশেষ প্রকাশিত হয় নি।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৬-১৯২৩) ঃ বিখ্যাত বাগ্মী ও সাংবাদিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যিক পরিচয়ও বিশেষ কম ছিল না। গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত তাঁর বহু রচনা এখনো বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে আছে; অবশ্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তরফ থেকে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীসজনীকান্ত দাস অনেকগুলি প্রবন্ধ উদ্ধার করে প্রকাশ করেছেন।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্বন্ধে এমন কথাও শোনা যায় যে, তাঁর নাকি নিজস্ব কোন মতবাদ ছিল না। এই অভিমতের যাথার্থ্য প্রমাণে প্রয়াসী না হয়েও এ কথা সত্য বলে মেনে নেওয়া যায় যে অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর মতের পরিবর্তন ঘটত।

সুরেশচন্দ্র সমাজপতির মৃত্যুর পর শেষের কবছর পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। সে সময়ের অনেকগুলি পত্র-পত্রিকার সঙ্গেই তাঁর সম্পাদকীয় যোগসূত্র ছিল। স্বদেশী আন্দোলনের সময় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সন্ধ্যা পত্রিকাতেও তিনি লিখতেন। তাঁর দেশাত্মবোধক লেখার বিশেষ কোন নিদর্শন সাহিত্যে পাওয়া না গেলেও এখানে তাঁর 'নবীনচন্দ্র ও জাতীয় অভ্যুত্থান' (মাঘ, ১৩১৫) প্রবন্ধটির উল্লেখ করা যেতে পারে। লেখক এতে জাতীয়তাবোধের ধারাটিকে ঐতিহাসিক পটভূমিতে বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করেছেন।

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৬৬-১৯৩১) ঃ সাহিত্যে গল্পকারদের মধ্যে যাঁদের লেখায় স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাব মাঝে মাঝে প্রতিফলিত

হয়েছিল তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, সরোজনাথ ঘোষ (১৮৭৮-১৯৪৪) এবং শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ (জন্ম—১৮৭৬)। এখানে শুধু সুরেন্দ্রনাথের রচনার সামান্য পরিচয় দেব।

স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাসে ১৯০৭ সাল একটি গুরুত্বপূর্ণ বছর। একদিকে সন্ত্রাসবাদ, অন্য দিকে সরকারী দমননীতি তখন প্রবলতর হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই সময়েই স্বদেশী-গ্রহণ ও বিদেশী-বর্জন নিয়ে সাহিত্যে গল্প লিখেছেন ডেপুটি কলেক্টর সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।[১] গল্পের উপসংহারে দেখা যায় কয়েকটি চরিত্র স্তূপীকৃত বিদেশী পোষাক-পরিচ্ছদে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। সুরেন্দ্রনাথের অনেক রচনায় ব্যঙ্গ-কৌতুক-মিশ্রিত যে ভাবটি সাধারণত চোখে পড়ে এখানেও সেটি অনুপস্থিত নয়। তবু গল্পটি পড়লে মনে হয় স্বদেশীর প্রতি লেখকের আন্তরিক সমর্থন ছিল।

গল্পলেখক হিসাবে সুরেন্দ্রনাথের একটি বিশেষ দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। পরিমিত কথায় কতকগুলি চিত্রের মাধ্যমে চরিত্রগত মনোভাব অথবা নিজের বক্তব্যকে পরিস্ফুট করার সুন্দর ক্ষমতা ছিল তাঁর। এ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রদ্ধাস্পদ ডাঃ সুকুমার সেন লিখেছেন, "গদ্য রচনায় সুরেন্দ্রনাথের স্টাইল তাঁহার নিজস্ব। সে স্টাইল বিষয়ের সঙ্গে অচ্ছেদ্য।"[২] এই উক্তির সমর্থনে সুরেন্দ্রনাথের 'স্বদেশী ও বিলাতী' (পৌষ, ১৩১৪) গল্পটি[৩] গ্রহণ করা যেতে পারে।

> বিলাত হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া 'মিস্টার' সেন সুমধুর শারদীয়া রজনীর দ্বিতীয় যামে স্বদেশের পুরানো পুষ্করিণীটির পাড়ে সটান লম্বা হইয়া নিদ্রা যাইবার উপক্রম করিতেছিলেন।
>
> স্বদেশের পুকুরটা পানায় পরিপূর্ণ। বন-বাদাড় ভরা ভাঙা পাড়ের অন্ধকার ভাগে ঝিল্লিকুল বিষম চীৎকার করিতেছিল। স্বদেশী শৃগাল বিলাতীয় ব্যারিস্টারের সহৃদয়তা লক্ষ্য করিয়া ক্ষণকালের জন্য দার্শনিক

১ পুরীর ডিস্ট্রিক্ট্ ম্যাজিস্ট্রেট্ এবং বিহার ও উড়িষ্যার কমিশনার অব্ ইন্‌কম্ ট্যাক্স্-এর পদেও ইনি কিছুকাল কাজ করেছিলেন।

২ 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস',—ডাঃ সুকুমার সেন। ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৫।

৩ এই গল্পটি ছাড়া সাহিত্যে প্রকাশিত অন্যান্য গল্প লেখকের 'কর্মযোগের টীকা' গল্পগ্রন্থে স্থান পেয়েছে। প্রকাশ ১৩২৩।

বিচার-পরায়ণতার পরিচয় দিয়া নীরব হইল। গোটাকয়েক অন্ধকার আর গোটাকয়েক আলোক স্বদেশী ও বিলাতী ভাব ধরিয়া দুই দলে বিভক্ত হইয়া গেল। গোটাকতক বিলাতী স্বপ্ন ও গোটাকতক দেশী স্বপ্ন দুই দিকে সারি সারি দাঁড়াইয়া চন্দ্রকরে নৃত্য করিতে লাগিল।

মিস্টার সেনের হৃদয় চিরকালই উদার। সম্মুখের ছবিগুলি তাঁহার পক্ষে একটু নূতন বোধ হইল। অতএব বিদেশীয় সিগারেটটার প্রথম ধূম একবার টানিয়াই অবশিষ্ট ভাগটা একেবারে পদদলিত করিয়া ফেলিলেন।

তখন বঙ্গের প্রথম পরিবর্তনের সময়। বঙ্গ নিশি প্রতি শিশিরকণায় শতাব্দীর দূষিত হৃদয়-রক্ত অন্ধকারে পরিবর্জন করিতেছিল। অতি ব্যথা পরিপূর্ণ, অতি শোকক্লিষ্ট বঙ্গ নৈশবায়ু পুরাতন চঞ্চলতা রুদ্ধ করিয়া স্তব্ধ নিশীথিনীর সহিত ঘোর অস্পষ্ট ভবিষ্যতের দিকে চাহিতেছিল।

বাগানের ওপারে প্রকাণ্ড মাঠ। সেই মাঠে মিস্টার সেন বাল্যসখা বিনোদের হাত ধরিয়া অনেকদিন পূর্বে স্বদেশের হিত চিন্তা করিয়াছিলেন।

বিলাতী ভাবগুলি পশ্চাতে রাখিয়া এবং স্বদেশীয় ভাবগুলির হাত ধরিয়া মিস্টার সেন মাঠ ভাঙিয়া বিনোদদের বাটীর দিকে অগ্রসর হইলেন। মিস্টার সেনের আলোক ও মিস্টার সেনের ছায়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

গিয়ে দেখলেন বিনোদদের সেই পুরানো ভাঙা বাড়ী, ভাঙা মণ্ডপ বন-জঙ্গলে পরিপূর্ণ। বিনোদের বাবার সঙ্গে তাঁর দেখা হল। তাঁর কাছ থেকে মিঃ সেন জানতে পারলেন, কিছুকাল হল বিনোদ বিয়ে করেছিল। কলকাতার কোন্ একটা কলেজে অধ্যাপনা করত, আর করত দেশের কাজ। এই কাজেই তার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে, মৃত্যু হয়।

অন্তরঙ্গ স্বদেশ-প্রেমিক বাল্যবন্ধুর মৃত্যু সংবাদে একটু ভেঙে পড়লেন অপূর্ব কৃষ্ণ সেন। চলে এলেন তাঁদের কলকাতার বাড়ীতে। মার সঙ্গে দেখা হল। বিলেত-ফেরৎ, তবু ধুতি চাদর পরিহিত ছেলেকে দেখে "জননীর হৃদয়ে মাতৃস্নেহ স্বদেশী প্রস্রবণে উছলিয়া উঠিল।"

বিলেত যাবার কিছু আগে কাঁসারিপাড়ার রামহরি গুপ্তের মেয়ে অনিলার সঙ্গে অপূর্বকৃষ্ণ "একটু বিলাতী ধরণের কোর্টশিপ্" করেছিলেন। কিন্তু সেটা তেমন গভীর হয়নি। অপূর্বকৃষ্ণ গেলেন অনিলার সঙ্গে দেখা করতে। অনিলার বাবা রামহরির রীতিমত পানদোষ ছিল। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের চাপে

পড়ে 'বিলাতী'র বদলে 'দেশী'তেই তাঁকে তৃষ্ণা মেটাতে হচ্ছিল। এই অবস্থায় অপূর্বকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর দেখা।

সেন, তুমি ঠিক সময়ে আসিয়াছ। সেন, স্বদেশী তরঙ্গে প্রাণটা যায়, রক্ষা কর লাউ সেন!

মিঃ সেন। আমার নাম অপূর্বকৃষ্ণ সেন।

রামহরি। বাবা, অবস্থা বিশেষে এখন তুমি লাউ সেন!

রামহরি ডাকলেন তাঁর মেয়েকে। বহুকাল পরে অনিলার সঙ্গে অপূর্বকৃষ্ণের দেখা হল।

অনিলা অনেকটা বিলাতী। চক্ষু কটা, কিন্তু কটার মধ্যেও স্বদেশী বেগুনের মত একটু মাধুর্য ছিল। অনিলা আনন্দময়ী। অনিলা পিতার শিক্ষায় গা ঢালিয়া দিয়া বিলাতী ভাবে ও বিলাতী উপাদানে মিশিয়া গিয়াছিল। কিন্তু অনিলার পশ্চাতে যে একটা স্বদেশী ভাব ছিল সেটা কেহই জানিত না।

অপূর্বকৃষ্ণের বাল্যবন্ধু বিনোদের বিধবা স্ত্রী শান্তি অনিলার অন্তরঙ্গ সহচরী। বিনোদের শ্বশুরালয় অনিলাদের বাড়ীর পাশেই। শান্তির দাদা নরেন্দ্র বিনোদের চেলা, পুরোদস্তর স্বদেশী। অপূর্বকৃষ্ণকে দেখতেও অনেকটা বিনোদের মতো। মৃত্যুর সময় বিনোদ শান্তিকে বলে গিয়েছিল, "শান্তি, যদি সংসারে কখনও সহায়-হীনা হও, যদি কখনও হৃদয়ের বল না পাও, তবে অপূর্বের সাহায্য লইও।" অপূর্বকে দেখে, আর এই সব কথা চিন্তা করে শান্তি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল। অনিলা অপূর্বকে দিয়ে খবর পাঠাল নরেন্দ্রের কাছে।

নরেন্দ্র অনিলার বাটীতে গিয়া শান্তিকে লইয়া আসিল। শান্তির সহিত অনিলা আসিল। অনিলা নরেন্দ্রকে দেখিয়া লজ্জা করে; আগে করিত না, এখন করিতেছে।

নরেন্দ্র বলিল, শান্তি, অনিলার মাথায় ওটা কি?

শান্তি। বিলাতী পুঁটুলি।

এটা অনিলার পূর্বেকার বিলাতী সাজসজ্জা। অনিলা বাহিরে আসিয়া মিঃ সেনকে বলিল, 'আপনার বিলাতী সাজগুলা আমাকে দিন।'

তখন অপূর্বের পোষাক ও অনিলার সরঞ্জাম একত্রিত হইয়া স্তূপাকার হইয়া পড়িল। চতুরা অনিলা তাহাতে একটা দীপশলাকা জ্বালিয়া দিল।

বিলাতী ও দেশী ভাব তুমুল সংগ্রাম-পূর্বক ধূম আশ্রয় করিল। অনিলা হাসিল। সে হাসি নরেন্দ্রের বড় ভাল লাগিল।

নরেন্দ্র অপূর্বকে ডাকিয়া বলিল, 'সেন, তোমার পরামর্শ মন্দ নয়। আমার বোধ হয় দেশী ও বিলাতী মিশিয়া যাহা হইয়াছে তাহার নাম স্বদেশী।'

বাস্তবিক তাহাই। কেননা বিধবা-বিবাহটা স্বদেশী হইলেও কেমন যেন বিলাতী ধরনের।

এর পর অপূর্বের সঙ্গে শান্তির বিধবা-বিবাহ এবং নরেন্দ্রের সঙ্গে অনিলার বিবাহের ইঙ্গিত দিয়ে গল্প শেষ হয়েছে।

ঘটনা-বিন্যাস বা পরিস্থিতি রচনার দিক থেকে গল্পটি ত্রুটিপূর্ণ হলেও সুরেন্দ্রনাথের নিজস্ব স্টাইলের কিছু পরিচয় এতে সুস্পষ্ট।

মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ : এই পত্রিকায় দেশাত্মবোধের কবিতা লিখতেন মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ। ভাব এবং প্রকাশভঙ্গির দিক থেকে তাঁর কবিতা বৈচিত্র্যহীন হলেও অনুভূতির গভীরতায় প্রাঞ্জল হয়ে উঠেছে। সাহিত্যে যাঁরা কবিতা লিখতেন তাঁদের মধ্যে একমাত্র মুনীন্দ্রনাথের কবিতাতেই নিবিড় স্বদেশানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর কবিতাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল,—'উদ্বোধন' (শ্রাবণ, ১৩১৩), 'আহ্বান' (অগ্রহায়ণ, ১৩১৩) 'সাধনা' (পৌষ, ১৩১৪), 'আত্মচৈতন্য' (মাঘ, ১৩১৪), 'উত্থান-সংগীত' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৫), 'আবাহন' এবং 'অর্ঘ্যদান' (কার্তিক, ১৩১৫), 'অধিকারী' এবং 'জাগরণ' (পৌষ, ১৩১৫) এবং 'অগ্নিহোত্রী' (পৌষ, ১৩১৭)। উদাহরণ-স্বরূপ একটি কবিতা এখানে উদ্ধৃত হল।

সাধনা

চাই মুক্তি ?—চাহ যদি সে দুর্লভ ধন,
পরপদধূলিশয্যা ত্যাজি' উঠ তবে।
মুক্ত কণ্ঠে ভক্তিভরে কর উচ্চারণ
অগ্নিমন্ত্র মাতৃমন্ত্র—মেঘমন্দ্র রবে!
বজ্রবহ্নিসম তেজে পৌরুষ গৌরবে
যাও সাধনার পথে ; হও অগ্রসর ;

রহ স্থির গিরিসম জীবন-আহবে,
চূর্ণ কর পদতলে কণ্টক কঙ্কর।
ভক্ত-হৃদি-রক্ত-জবা শোণিত-চন্দনে
পূজ জননীর রাঙ্গা চরণ দু'খানি!
প্রসন্ন হইয়া মাতা দিবেন নন্দনে
বাঞ্ছিত অমৃত ফল তুলি' পুণ্যপাণি।
সাধকের হৃদি-রক্ত—আত্ম-বলিদান
অমৃত মুক্তির স্পর্শে মৃতে পায় প্রাণ।

স্বদেশ-প্রেমের সুরে নতুন প্রাণ-ছন্দ আনার প্রয়াসে সাহিত্য পত্রিকার বিশেষ কোন ভূমিকা ছিল না; তবু মাঝে মাঝে এই ধরনের লেখাগুলি স্বাদেশিকতা-চর্চার ব্যাপারে দেশবাসীকে যে কিছুটা সাহায্য করেছিল একথা অস্বীকার করলে এই পত্রিকার প্রতি অবিচার করা হবে।

অন্যান্য পত্রিকা

সে সময়ে আরো কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশিত হত যেগুলি স্বদেশী-আন্দোলন-প্রসূত নতুন জাতীয়-চেতনার পোষকতা করে। বিভিন্ন বিষয়ের রচনার সঙ্গে স্বাদেশিকতা-মূলক রচনাও এগুলিতে স্থান পেত। তবে তার পরিমাণ অল্প এবং স্বাদেশিকতার দিক থেকেও নতুন চিন্তার পরিচয়বহ নয়। রাজনৈতিক অবস্থার প্রকৃত বিচার-বিশ্লেষণের ব্যাপারে এই পত্রিকাগুলি বিশেষ কোন দায়িত্ব পালন না করলেও আবেগ ও উত্তেজনাময় কিছু কিছু রচনার মধ্যে দিয়ে জনচিত্তে জাতীয়তাবোধ অক্ষুণ্ণ রাখতে চেষ্টা করেছে। এগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য পত্রিকাটি হল সুপ্রভাত। কুমুদিনী মিত্র সম্পাদিত এই পত্রিকাটি আত্মপ্রকাশ করে ১৩১৪ সালের শ্রাবণ মাসে। বাংলা দেশে তখন চরমপন্থীরা খুব সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। কৃষ্ণকুমার মিত্রের সঞ্জীবনী, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সন্ধ্যা, স্বরাজ, করালী, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার নবশক্তি এবং বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতির যুগান্তর—বাংলাভাষায় প্রকাশিত এই কটি দৈনিক, সাপ্তাহিক ও অর্ধ-সাপ্তাহিক পত্রিকা দেশের লোককে চরম-কথা শুনিয়ে রাজনৈতিক আবহাওয়া বেশ গরম করে তুলেছিল। সুপ্রভাত এই উত্তাপকেই আরো একটু বাড়িয়ে দিলে। এতে যাঁরা লিখতেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন হলেন—যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার, ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, অরবিন্দ ঘোষ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, ইন্দুমাধব মল্লিক, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত, জীবেন্দ্রকুমার দত্ত, মানকুমারী বসু এবং স্বর্ণপ্রভা বসু। রুদ্রনীতির সমর্থনে এই পত্রিকায় কি ধরনের লেখা প্রকাশিত হত তার সামান্য নিদর্শন গ্রহণ করা যাক। চট্টগ্রামের কবি জীবেন্দ্রকুমার দত্তের (১৮৮৩-?) কয়েকটি কবিতা এতে ছাপা হয়। 'নববর্ষ' (বৈশাখ, ১৩১৮) নামক কবিতাটির কয়েকটি পংক্তি—

ছুটিনু আলেয়া পিছে? মুগ্ধ কিবা মৃগতৃষ্ণিকায়?
জীবন-শোণিত-দান সব ভ্রান্তি? সকলি বৃথায়?
নহে, নহে, হে মহান্! তপস্তেজ-দীপ্ত আর্যভূমি!
অনন্ত কালের সাক্ষী, মৃত্যুঞ্জয় চিরন্তন তুমি!

ইংরেজের আঘাতে বাঙালীর রক্তদান যে মিথ্যা হয় নি কয়েকটি প্রবন্ধেও সেকথা দৃপ্তভাবেই ঘোষণা করা হয়। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের 'আত্মদান' (শ্রাবণ, ১৩১৭) প্রবন্ধের অংশ-বিশেষ তার প্রমাণ-স্বরূপ উদ্ধৃত করা হল—

> নরশোণিত ধরাকে অভিষিক্ত ও কলঙ্কিত করিল এবং ভ্রাতৃবিরোধ ও আত্মদ্রোহ মানবসমাজকে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিল। সংগ্রামের আর অবসান হইল না। কিন্তু তাহারই মধ্য হইতে আত্মরক্ষা ও অমরত্ব লাভের গুপ্তমন্ত্র প্রকাশিত হইয়া পড়িল।…আত্মহত্যা মস্তিষ্কবিকৃতির পরিণতি, আত্মহত্যা পৈশাচিক; আত্মবলি স্বর্গীয়, আত্মবলি পাবনীয়।

এই ধরনের কিছু প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প ও গান সুপ্রভাতে প্রকাশিত হয় যেগুলির অন্তত দুএকটি সাময়িক প্রয়োজনের গণ্ডিকে অতিক্রম করেছে[১]। গল্পলেখকদের মধ্যে চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একমাত্র পুত্র ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামই এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

অরবিন্দ ঘোষের 'কারা-কাহিনী' ১৩১৬ সালের সুপ্রভাতে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। কিন্তু এটি সম্পূর্ণ না করেই তিনি হঠাৎ বাংলা ছেড়ে চলে যান[২]। এই সময়েই ভারতীতেও তাঁর একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়—'কারাগৃহ ও স্বাধীনতা' (আষাঢ়, ১৩১৬)। এই লেখাগুলি যদি তাঁর মৌলিক রচনা হয় তাহলে অল্পকালের মধ্যেই বাংলা লেখাতেও তাঁর যে বেশ দক্ষতা জন্মেছিল এ কথা স্বীকার করতে হবে।

"শ্রীসত্যলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সার্বভৌমেন সম্পাদিতম্" বসুধা পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় ১৩০৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে। অবশ্য অল্পকাল পরে সম্পাদক হিসাবে সার্বভৌম মহাশয়ের নাম আর পাওয়া যায় না, তখন এটি "সুপরিচিত লেখকবৃন্দের দ্বারা সম্পাদিত" হয়; পরে আবার সম্পাদক হিসাবে অন্নদাপ্রসাদ ঘোষালের নাম পাওয়া যায়। সম্পাদক যে বা যাঁরাই হোন্ এই পত্রিকাটিতেও দুএকটি উত্তেজনা-মূলক লেখা প্রকাশিত হয়, এবং অন্য লেখাগুলির কিছু কিছু দেশাত্মবোধক হলেও

---

১ রবীন্দ্রনাথের 'সুপ্রভাত' কবিতাটিও বোধহয় এই পত্রিকার জন্যেই কবি রচনা করেছিলেন। দ্রষ্টব্য—রবীন্দ্র-জীবনী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ২য় খণ্ড, পৃ ১৬০।

২ এটি অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই ১৩২৮ সালে প্রবর্তক পাব্‌লিশিং হাউস কর্তৃক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

গতানুগতিক। লেখকদের মধ্যে বঙ্কুবিহারী ধর, জিতেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রমোহন বসু এবং হেমেন্দ্রকুমার রায়ের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। জিতেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বন্দেমাতরম্' (আশ্বিন, ১৩১২) প্রবন্ধটির সামান্য অংশ—

> শোণিত পতন ভিন্ন জাতীয় উন্নতি সংসাধিত হয় না।···যদি বঙ্গমাতার এই শোণিত পাতে দীনহীন হতভাগ্য বাঙালিগণ জাতীয়-জীবন লাভ করে তবে তাহা পরম লাভ মনে করা উচিত।

এই সময়ে অন্যান্য যে মাসিক পত্রিকাগুলিতে মাঝে মাঝে দুএকটি করে এই ধরনের রচনা দেখা যেত সেগুলির মধ্যে নাম করা যায়—ঢাকা থেকে প্রকাশিত বান্ধব; ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত আরতি, কলকাতা থেকে প্রকাশিত অর্চনা এবং মানসী। আর একটি পত্রিকা ছিল—স্বদেশী; এটিতে স্বদেশী শিল্প-বাণিজ্য-সংক্রান্ত প্রবন্ধই বেশি থাকত।

১৩১৪ সাল থেকে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত স্বাদেশিকতামূলক রচনাবলীর ভাব, ভাষা এবং ভঙ্গিতে একটা লক্ষণীয় পরিবর্তন সূচিত হয়; দেখা যায় অনেকগুলি পত্রিকা, যেগুলি এ পর্যন্ত চড়া সুরে আলাপ করে আসছিল তাদের সুরে কোমল পর্দার প্রাধান্য ঘটেছে। স্বদেশী আন্দোলনের বাহিক উচ্ছ্বাসময়তা তখন কিছুটা কেটে গেছে আর অন্য দিকে সরকারী দমননীতির তীব্রতা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুর-পরিবর্তনের ব্যাপারে এই দুটি কারণই যুগপৎ ক্রিয়াশীল ছিল। আবার কয়েকটি নতুন পত্রিকা জন্মলাভ করেই সন্ত্রাসবাদের সমর্থনে দীপক রাগিণীতে তান ধরেছিল। তাদের মধ্যে এক সুপ্রভাত ছাড়া সবকটিই দৈনিক, সাপ্তাহিক বা অর্ধ-সাপ্তাহিক। অবশ্য সুপ্রভাতের এই ধরনের লেখাগুলিতেও তীব্রতার মাত্রা অনেক কম।

স্বদেশীযুগের নতুন স্বদেশ-চেতনায় দেশবাসীকে জাগিয়ে তোলার কাজে, এই অধ্যায়ে উল্লিখিত সাময়িকপত্রগুলি যে দায়িত্ব-নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছিল আমাদের জাতীয়-জীবনের ইতিহাসে তা এক অবিস্মরণীয় অধ্যায় রচনা করেছে।

প্রকাশিত গ্রন্থ

কবিতা ও গান

বাঙালীর অন্তরে জাতীয়তাবোধ স্বদেশী আন্দোলনের অনেক আগেই বিশেষ একটা রূপ লাভ করেছিল; কিন্তু এই বোধ তার শক্তিকে জড়তার হাত থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি দিতে পারে নি। যে-আঘাত এই জড়তাকে দূর করতে পারে, যে-আঘাত দুর্বার কর্মশক্তির উদ্‌বোধন ঘটায়, বাঙালীর জাতীয়-চেতনা তাকে স্বাগত জানানোর অপেক্ষায় ছিল। সে-আঘাত যখন এল তখনই তার কানে বাজলো অভয়-মন্ত্র,

> ভয় নাই, ওরে ভয় নাই।
> নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
> ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।

তখন সেই মরণনৃত্যে ছন্দ মিলিয়ে বাঙালীর হৃদয়-ডমরু বেজে উঠলো। বঙ্গভঙ্গের আঘাতে বাঙালীহৃদয়ের আবেগের মুক্তধারা দুর্বার হয়ে উঠলো বিশেষ করে সমসাময়িক কবিতা ও গানে।

যাঁদের লেখনীর উৎসমুখ থেকে এই জাতীয় কবিতা-গানের প্রস্রবণ প্রবাহিত হল তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অমৃতলাল বসু, রজনীকান্ত সেন, গোবিন্দচন্দ্র রায়,[১] বিজয়চন্দ্র মজুমদার, কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত, প্রমথনাথ রায় চৌধুরী, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী এবং সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১): ১৩০৮ সাল থেকে ১৩২১ সালের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের যে কখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলির মধ্যে প্রথম 'নৈবেদ্য'[২] (১৩০৮)। এ কাব্যে কবি স্বদেশপ্রেমের যে আদর্শকে প্রতিষ্ঠা

---

১ এই সময় গোবিন্দচন্দ্র দাসের অনেকগুলি দেশাত্মবোধক কবিতা বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়; কিন্তু সেগুলি সে সময় কোন গ্রন্থে সংকলিত হয় নি।

২ কবিতাগুলির রচনাকাল—অগ্রহায়ণ থেকে ফাল্গুন, ১৩০৭।

করতে চেয়েছেন তা কোন ভৌগোলিক চৌহদ্দির মধ্যে আবদ্ধ নয়। রবীন্দ্রনাথের স্বাজাত্যবোধ গোড়া থেকেই নেশন্-তন্ত্রের সংকীর্ণতা-মুক্ত। কিন্তু বিশুদ্ধ আদর্শবাদী না হলে এমনতর উদার মনোভাব নিয়ে দেশকে ভালোবাসা সম্ভব নয়। সেকালে তা সম্ভবও হয়নি অনেকের ক্ষেত্রে। সবকালেই তা শুধু দুএকজন মহা-মনীষীর পক্ষেই সম্ভব। অথচ ভারতের আত্মা কোনদিন ভালোবাসার টুক্‌রো রূপগুলোকে—জাতিপ্রেমের সংকীর্ণতাকে—প্রশ্রয় দেয় নি। সর্বমানবিক অনুভূতির ভিত্তিতেই তার জাতিপ্রেম প্রতিষ্ঠিত।

নতুন স্বদেশ-চেতনার সোনার কাঠি ছুঁইয়ে বিশ শতকের প্রথম দশক যখন বাঙালীর ঘুম ভাঙিয়ে দিলে তখন সে ইংরেজকে আর ঠিক শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতে পারে নি। বিরোধমূলক আদর্শের ওপরেই গড়ে উঠল প্যাট্রিয়টিজ্‌ম্।

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু একে স্বীকার করতে পারলেন না। তাই স্বদেশপ্রেমের সঙ্গে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার সমন্বয় সাধন করে তিনি দেশবাসীর সামনে তুলে ধরলেন। অবশ্য 'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে' দুজনেই তাঁর কাছে সমান পাপী; কিন্তু অন্যায়ের প্রতিবিধান করতে মনুষ্য-ধর্মকে হারালে চলবে না, একটা জাতকে আর একটা জাতের শত্রু হিসাবে গড়ে তুললে ভুল করা হবে। তাই দেখা গেল, "স্বদেশপ্রীতি ও ঈশ্বরে ভক্তি—নৈবেদ্যের কবিতারাজির প্রধান বিষয়বস্তু হইলেও, দেশাতীত মানবের মঙ্গলের জন্য তাঁহার অন্তর সদাই উদ্‌গ্রীব। আজ তাঁহার অন্তরাত্মা খণ্ডিতভাবে জগতকে দেখিতে পারে না;…সেই জন্য স্বদেশের দুঃখে কবির অন্তরে যে বেদনা জাগে, বিদেশের অপমানেও তাঁহার চিত্ত সেই আঘাতে সাড়া দিয়া উঠে।"[৩] আর এই কারণেই 'ভাবোন্মাদমত্ততায়' যে ভক্তির প্রকাশ, যে ভক্তি 'জ্ঞানহারা উদ্‌ভ্রান্ত' তা তিনি চান নি। কিন্তু আঘাতসংঘাতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে অন্তরে এই ভক্তিভাবকে গড়ে তোলা সহজ নয়। যেখানে লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয়, যেখানে দণ্ডে পলে পলে আত্মাবমাননা আর অন্তরে-বাহিরে দাসত্বের রজ্জু সেখানে কবির মনোভাব সংগ্রামী হয়ে উঠেছে, কবি হয়ে উঠেছেন শাক্ত। তাই সংগ্রামের জন্যে তিনি দীক্ষা চাইলেন রণগুরুর কাছে—

৩ 'রবীন্দ্র-জীবনী', প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ২য় খণ্ড, পৃ—১৪।

অস্ত্রে দীক্ষা দেহো,
রণগুরু। তোমার প্রবল পিতৃস্নেহ
ধ্বনিয়া উঠুক আজি কঠিন আদেশে॥

কবির এই রণসজ্জায় অস্ত্রটি হল অপ্রমত্ত সত্যনিষ্ঠা—

যেন রসনায় মম
সত্যবাক্য ঝলি উঠে খরখড়্গসম
তোমার ইঙ্গিতে।

এই সত্যনিষ্ঠার আদর্শই একদিন প্রাচীন ভারতের তপোবনে ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল। সে অতীতের কথা। কিন্তু অতীত তো অচেতন নয়; বর্তমান তার কণ্ঠ হতে সেই শাশ্বত ভারত-বাণী শোনার জন্যে অপেক্ষা করে আছে; অতীত আজ সত্য-কণ্ঠ হয়ে উঠুক। ('অতীত'—'উৎসর্গ' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত[৪])।

রবীন্দ্রনাথের কবি-চিত্ত এই সময়ে আদর্শ এবং বাস্তবের দ্বন্দ্বে সাংঘাতিক ভাবে দোলায়িত হয়েছে। স্বদেশের যে মূর্তিকে তিনি কল্পনায় গড়ে তুলতে চান, বাস্তব ঘটনার নিষ্ঠুর আঘাতে তা বারে বারে ভেঙে যায়। দেশাত্মবোধের উদার আদর্শগত ভিত্তিতে বার বার ফাটল ধরে। দেশের মাটি থেকে পুঞ্জীভূত পাপকে দূর করতে হলে শুধু কলম থেকে অশ্রু ঝরালে চলবে না, শুধু নাকিকান্না আর নালিশের জোরে অন্যায়ের প্রতিকার হয় না, তার জন্যে চাই দেহ-মনের শক্তি। 'স্বদেশ'[৫] কাব্য-গ্রন্থ থেকে তাঁর একটি বিস্মৃত-প্রায় কবিতা উদ্ধৃত করলে এই মন্তব্যের যাথার্থ্য প্রমাণিত হবে। কবিতাটির নাম 'অভিমান'।

কারে দিব দোষ, বন্ধু, কারে দিব দোষ!
বৃথা কর আস্ফালন, বৃথা কর রোষ!
যারা শুধু মরে কিন্তু নাহি দেয় প্রাণ,
কেহ কভু তাহাদের করেনি সম্মান।
যতই কাগজে কাঁদি, যত দিই গালি,
কালামুখে পড়ে শুধু কলঙ্কের কালী।

---

৪ এই গ্রন্থের কবিতাগুলির রচনাকাল ১৩১০; গ্রন্থের প্রকাশকাল—১৩২১।

৫ 'চিত্রা', 'কল্পনা', 'নৈবেদ্য' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ থেকে বিভিন্ন কবিতা চয়ন করে 'স্বদেশ' প্রকাশ করা হয় ১৩১২ সালে। প্রকাশক—মজুমদার লাইব্রেরী।

যে তোমারে অপমান করে অহর্নিশ,
তারি কাছে তারি পরে তোমার নালিশ !
নিজের বিচার যদি নাই নিজ হাতে,
পদাঘাত খেয়ে যদি না পার ফিরাতে,
তবে ঘরে নতশিরে চুপ্ করে থাক্,
সাপ্তাহিকে দিগ্বিদিকে বাজাস্ নে ঢাক !
এক দিকে অসি আর অবজ্ঞা অটল,
অন্য দিকে মসী আর শুধু অশ্রুজল !

অন্যায়ের প্রতিকার করার ব্যাপারে শারীরিক শক্তি প্রয়োগের সমর্থন রবীন্দ্রনাথের খুবই অল্প-সংখ্যক লেখার আনাচে-কানাচে পাওয়া যায়; এই লেখাটিও সেই জাতীয়। নিজের বিচার নিজের হাতে নিয়ে পদাঘাত খেয়ে পদাঘাত ফিরিয়ে দেওয়ার পরিষ্কার নির্দেশ এতে পাওয়া যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথও যে সাময়িক উত্তেজনায় কিছুটা পারিচালিত হয়েছিলেন সে কথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন,[৬] এবং শীঘ্রই তিনি নিজেকে সামলে নিয়ে তাঁর আদর্শলোকে ফিরে গেছেন। কিন্তু দেশের যুবকদের মনে এই ধরনের লেখার প্রতিক্রিয়া দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল একথা অস্বীকার করা যায় না। যে আলস্য ও ক্লীবতা বাঙালীর মজ্জায় প্রবেশ করে তাকে জড়পিণ্ডে পরিণত করে তুলছিল কবি তাকে আঘাত হানলেন 'দুরন্ত-আশা' কবিতায়—

দাস্য-সুখে হাস্য-মুখে বিনীত যোড় করে,
প্রভুর পদে সোহাগ-মদে দোদুল কলেবরে,
পাদুকা-তলে পড়িয়া লুটি ঘৃণায় মাখা অন্ন খুঁটি,
ব্যগ্র হ'য়ে ভরিয়া মুঠি যেতেছ ফিরি ঘরে ;
ঘরেতে বসে' গর্ব কর পূর্ব-পুরুষের,
আর্য-তেজ-দর্পভরে পৃথ্বী থর থর !

'নববর্ষের গান' ও বিখ্যাত 'শিবাজী-উৎসব' কবিতা দুটিও 'স্বদেশ'-এ সন্নিবেশিত হয়।

৬ ডন্ সোসাইটিতে ছাত্রদের কাছে প্রদত্ত প্রথম বক্তৃতা দ্রষ্টব্য—ভাণ্ডার—বৈশাখ, ১৩১৩, বিশেষ সংখ্যা।

এই প্রসঙ্গে 'গীতাঞ্জলি'-রও (১৩১৭)[৭] উল্লেখ করা যেতে পারে। কারণ 'গীতাঞ্জলি'তে আধ্যাত্মিকতা মুখ্য হলেও দেশাত্মবোধের সুরও মাঝে মাঝে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 'হে মোর চিত্ত পুণ্যতীর্থে জাগোরে ধীরে' ('মাতৃ-অভিষেক'—প্রথম নামকরণ), 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ' ('অপমানিত'—প্রথম নামকরণ) প্রভৃতি এই ধরনের কবিতা। এগুলিতে কবির দেশাত্মবোধ সম্পূর্ণ আদর্শ-নিষ্ঠ।

আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথ অনেক স্বদেশীগান লিখেছিলেন। ১৩১২ সালের শেষের দিকে 'বাউল' নামে এই গানগুলির একটি সংকলন প্রকাশিত হয়; এবং 'গান' নামে আর একটি সংকলন প্রকাশিত হয় ১৩১৫ সালে। সিটি বুক্ সোসাইটি থেকে যোগীন্দ্রনাথ সরকার এটি প্রকাশ করেন। এতে প্রায় একশ গান আছে; 'বাউল'-এর গানগুলিও বাদ পড়েনি এবং 'জাতীয়-সংগীত' নামে একটি পরিচ্ছেদে কতকগুলি গানকে পৃথক করে সাজান হয়েছে। 'জাতীয়-সংগীত' পরিচ্ছেদের গানগুলি—

১। আগে চল্ আগে চল্, ভাই! ২। (তবু) পারিনে সঁপিতে প্রাণ। ৩। একি অন্ধকার এ ভারত-ভূমি! ৪। আনন্দ-ধ্বনি জাগাও গগনে। ৫। কেন চেয়ে আছ গো মা মুখপানে। ৬। আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না। ৭। কে এসে যায় ফিরে ফিরে। ৮। একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্। ৯। আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে। ১০। জননীর দ্বারে আজি ওই। ১১। অয়ি, ভুবনমনোমোহিনী। ১২। এ ভারতে রাখ নিত্য প্রভু। ১৩। নব বৎসরে করিলাম পণ!

'বাউলের' গানগুলি—

১। 'সার্থক জনম'—সার্থক জনম আমার। ২। 'পথের গান'—আমরা পথে পথে যাব সারে সারে। ৩। 'সোনার বাংলা'—আমার সোনার বাংলা। ৪। 'দেশের মাটি'—ও আমার দেশের মাটি। ৫। 'দ্বিধা'—বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি। ৬। 'অভয়'—আমি ভয় করব না। ৭। 'হবেই হবে'—নিশিদিন ভরসা রাখিস্। ৮। 'বান'—এবার তোর মরা গাঙে। ৯। 'একা'—যদি তোর ডাক শুনে। ১০। 'মাতৃমূর্তি'—

৭ গ্রন্থ প্রকাশ ১৩১৭। গানগুলির রচনাকাল—১৩১৩-১৩১৭।

আজি বাংলা দেশের হৃদয় হ'তে। ১১। যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক্। ১২। যে তোরে পাগল বলে। ১৩। ওরে তোরা নেই বা কথা বললি। ১৪। যদি তোর ভাবনা থাকে। ১৫। আপনি অবশ হলি তবে। ১৬। জোনাকি, কি সুখে। ১৭। 'মাতৃগৃহ'—মা কি তুই পরের দ্বারে। ১৮। 'প্রয়াস'—তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে। ১৯। বিলাপী—ছি ছি, চোখের জলে। ২০। 'বাউল'—ঘরে মুখ মলিন দেখে গলিস্ নে।

গানগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। স্বাদেশিকতা-মূলক এত গান আর কোন গীতিকারের হাত থেকে বেরোয় নি। আবেগ-প্রেরণার দিক থেকে প্রত্যেকটি গানই অনবদ্য। অসংযত উত্তেজনার প্রকাশ গানগুলির কোথাও নেই, অথচ প্রকাশভঙ্গির বলিষ্ঠতায় এগুলি সেদিন নয়া-বাংলার হৃদয়কে জয় করে নিয়েছিল। সমসাময়িক পরিস্থিতির প্রভাবে রচিত হলেও অনেকগুলি গানে স্থায়ী আবেদন আছে। তাই আজ স্বদেশী আন্দোলন ইতিহাসের পাতা আশ্রয় করলেও গানগুলি বাঙালীর কণ্ঠ-হারা হয়নি।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২) : নাট্যকার ও অভিনেতা হিসাবেই বাঙালীর কাছে গিরিশচন্দ্র ঘোষের প্রতিষ্ঠা। আর সে প্রতিষ্ঠা মহিমান্বিত। কিন্তু গীতিকার হিসাবেও তাঁর দক্ষতা কম ছিল না। প্রয়োজনে, স্বেচ্ছায় বা অনুরোধে তিনি অনেক গান রচনা করেছিলেন। তাছাড়া তাঁর নিজস্ব নাটকের গানগুলি তো আছেই। নাটকের এই গানগুলির সঙ্গে তাঁর অন্যান্য গানগুলির একটি সংকলন গিরিশচন্দ্রের জীবিতাবস্থাতেই প্রকাশিত হয়েছিল। 'গিরিশ-গীতাবলী' নামে এই সংকলনটির প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়; প্রকাশ কাল—১৩১৪। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে এই সময়ে গিরিশচন্দ্র তাঁর নাটকে ঐতিহাসিক ভিত্তিতে স্বদেশপ্রেমকে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করছেন এবং দেশ তখন স্বদেশী আন্দোলনের বন্যায় ভাসছে।

এই সংকলনে ১৩০৮ সালের অনেক আগে লেখা কয়েকটি দেশাত্মবোধক গানও স্থান পেয়েছে; যেমন 'মহাপূজা' রূপকনাট্য থেকে 'নয়ন জলে গেঁথে মালা পরাব দুখিনী মায়' ইত্যাদি। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 'প্রায়শ্চিত্ত' নামে একটি প্রহসন রচনা করেন। সেটি সংশোধিত আকারে এবং 'বহুৎ আচ্ছা' এই

পরিবর্তিত নামে ৫ই মাঘ, ১৩০৮, ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনীত হয়। এই প্রহসনটির জন্মে গিরিশচন্দ্র পাঁচটি গান লিখে দেন। এখানে একটি গানের অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত হল।

স্ত্রী। নাক কাণ ম'লে ছাড়ো সাহেবয়ানা
চালিতে ব'ল না আর বিবিয়ানা।
রয়-সয় যেটা কর যদি তাই,
শুন গুণমণি তবে ঘরে যাই।
পু। তাই হ'বে তাই—
দেখো প্রিয়ে নাক কাণ মলা খাই॥
স্ত্রী। ইংরিজি বুলি যদি না চালাও,
ডাল ভাত যদি টেবিলে না খাও,
ফিরি ঘরে তবে, নয় তো পালাই,
পু। তাই হবে তাই—
দেখো প্রিয়ে দেখো তোমারি দোহাই।

গিরিশচন্দ্রের এই ধরনের হাসির গানগুলি দ্বিজেন্দ্রলালের মতো সার্থক হতে পারে নি। দুজনেই সামাজিক রীতি-নীতির ক্ষেত্রে অন্ধ বিজাতীয় মনোভাবকে ব্যঙ্গ করেছেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের প্রকাশভঙ্গির সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের একটা প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে বলে মনে হয়। গিরিশচন্দ্রের প্রকাশভঙ্গি আবেগ-প্রধান এবং দ্বিজেন্দ্রলালের বুদ্ধি-প্রধান। দ্বিজেন্দ্রলালের লেখা আমাদের খোঁচা দেয়, আহত করে; কিন্তু গিরিশচন্দ্রের লেখা শুধু দেখিয়ে দেয়, নির্দেশ করে।

এই প্রসঙ্গে সমসাময়িক দুটি নাটক থেকে দুটি গানের উল্লেখ করা যেতে পারে; 'বাসর'-এ (১৩১২)—'জয় জয় ভারত জননী' এবং 'মীরকাসিম'-এ (১৩১৩)—'পরাধীন জননী আমার।'

'সোনার-বাংলা'-র গানও বেশ আবেগময়। স্বদেশী আন্দোলনের সময় রচিত অন্যান্য টিপিকাল্ গানগুলির সঙ্গে এর ভাব-ভঙ্গিগত মিল আছে। একটি নিদর্শন—

(সন্তানের উক্তি)

শুনি মা তুই সোনার বাংলা,
শুনি যেমন সোনার কাশী।
তুই যদি মা সোনার বাংলা
আমরা কেন উপবাসী॥

* * *

দু'পাতা ইংরাজি চেটে,
দেমাকে মরেছি ফেটে,
সারা হলেম খেটে খেটে,
গলাতে গোলামী-ফাঁসী॥

* * *

(মাতার উক্তি)

ঘুমিয়ে আছ অঘোর হ'য়ে
তাইতে থাক উপবাসী
ডাকি কত উঠো নাতো,
চখের জলে সদাই ভাসি॥

* * *

সোনার আমি যাদুমণি,
ক্ষেত্র আমার সোনার খনি,
ভ্রাতৃপ্রেমের বিমল জলে
ধোও রে মায়ের মলারাশি।

পূর্বেই বলা হয়েছে অনুরোধ-উপরোধে পড়ে গিরিশচন্দ্রকে অনেক গান লিখে দিতে হয়েছিল। এখানে সেই জাতীয় একটি গান উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। গিরিশচন্দ্রের এ ধরনের গানের নিদর্শন এখন প্রায় বিস্মৃতির নিচে চাপা পড়ে গেছে। জোড়াসাঁকো স্বদেশ-সমিতির অনুরোধে এটি রচিত। স্বদেশী আন্দোলনের মূলতত্ত্বটিই এতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

কেন আর ভাবছ অত, দু'দিন থাক র'য়ে স'য়ে।
এস ভাই থাকি সবাই, মায়ের ছেলে মায়ের হ'য়ে॥

স্বদেশী কাপড় নিতে পেছিয়ো না ভাই দু'পাই দিতে,
হার হ'বে না, যাবে জিতে, দেশে টাকা যাবে র'য়ে ॥
ভয় ক'রো না চড়া দরে, সস্তা হ'বে দু'দিন পরে,
তাঁত বসেছে ঘরে ঘরে, সস্তা কাপড় দেবে ব'য়ে ॥
কাজ কি বিদেশী ধাঁজে, ফক্কিকারী কিনে বাজে,
আধা দিলে দেশের কাজে, কেউ তো ভাই যাব না ক্ষয়ে ॥
প'ড়ে থেকে পরের পায়ে, পেটে ভাত নাই, বস্ত্র গায়ে,
মাথা দিতে আপন দায়ে, ভীরু যে সে পেছোয় ভয়ে ॥
দুখের তো নাই অবধি, দেখি কিছু হয় হে যদি,
সইবো কত নিরবধি, যা' হ'বার যাক্ হ'য়ে ব'য়ে ॥

'মীরকাসিম' রচনার পর গিরিশচন্দ্রের একটি অনুবাদমূলক রচনা 'য্যায়সা কা ত্যায়সা' (১৩১৩) প্রকাশিত হয়। মলিয়েরের লেখা 'ল আমুর মেদিসঁ্যা'র ইংরেজী অনুবাদই এটির ভিত্তি। এই রচনাটির ওপরেও স্বদেশী আন্দোলনের স্পষ্ট প্রভাব পড়েছে। এখানে দুটি গানের উল্লেখ করলেই এই প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যাবে।

১। 'স্বদেশী' বলিয়া বিলাতী দ্রব্যবিক্রেতা ভণ্ড জহুরী, ছবিওয়ালা, পোষাকওয়ালা ও এসেন্সওয়ালা চারিজন এবং স্পষ্টবক্তা সনাতন।—

মিশ্র দাদ্‌রা

৪জনে। রুখেছি স্বদেশহিতে, জীবন দিতে, চার্ জনে,
সনা। ভির্‌কুটিতে চারটি সমান,
কম-বেশী নাই ওজনে ॥
জহুরী। ঠিক স্বদেশী 'বঙ্গবাসী নেক্‌লেস্' যে পরে,
দেশহিতৈষী ঠিক বলি তারে,
দেশের মুখ আলো করে ;
ছবি। 'কোকিল-কূজিত-কুঞ্জকুটীর',
স্বদেশী তস্‌বীর্—
দেখ্‌লে ক্রমে স্বদেশপ্রেমে
ঝর্‌বে চোখে নীর,

পোষাক। আঁট্‌লে জ্যাকেট্‌—'বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ',
আয়না ধ'রে বুকে দেখে স্বদেশপ্রেমের জেদ,
জ্যাকেটে জমাট বাঁধে বঙ্গচ্ছেদের খেদ্‌ ;
এসেন্স। সাধের এসেন্স, সাধের নাম 'বয়কট্‌',
শুঁক্‌লে পরে স্বদেশপ্রেমে করে সে ছট্‌ফট্‌—
ঝাড়ে লেক্‌চার চট্‌পট্‌, বীর হ'য়ে যায় চট্‌ ;
৪জনে। ফিরি দেশের তরে ফিরি ক'রে,
অনুরাগ খুব গণ্‌গণে।
সনা। এরা মর্‌বে কবে কে জানে,
কি আছে যমের মনে ॥

২। অংশ বিশেষ—

কাঙ্গালী বাঙালীর মেয়ে, কাজ কি বিবিয়ানা বাই।
বুকে-পিটে সেঁটে ধরে, জ্যাকেট্‌-বডির মুখে ছাই ॥
এখন চল্‌ছে কস্‌তা পেড়ে শাড়ী,
শাঁখার আদর বাড়ী বাড়ী,
ভেঙ্গে কাঁচের বাসন কাঁচের চুড়ি, ঘুচেছে কাঁচের বালাই ॥

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) : রবীন্দ্র-সমসাময়িক কবিদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের স্বকীয়তার প্রভাবকে অস্বীকার করার উপায় নেই। নাট্যকার হিসাবে প্রাধান্যলাভ করলেও, বিশ শতকের সূচনায় তাঁর কবিতা ও হাসির গানগুলি অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল কখনোই নিছক হাস্য-রস সৃষ্টি করেন নি। তাঁর হাস্য-রস সৃষ্টি উদ্দেশ্যমূলক এবং তীক্ষ্ণ-চিন্তাশীলতার মধ্যেই এ রসের ভাণ্ডার। স্বদেশের অবস্থা ও স্বজাতির আচার-আচরণকে কেন্দ্র করেই তাঁর চিন্তাশীলতা গড়ে উঠেছে। তাই তাঁর কবিতা পড়ার সময় হাসতে গিয়ে ভাবতে হয় ; আর স্বজাতিকে হাসিয়ে ভাবিয়ে তোলাই কবির উদ্দেশ্য। হাসির অন্তর্নিহিত বক্তব্যকে ফুটিয়ে তোলার জন্যে কবি গদ্যের বলিষ্ঠতাকে কবিতায় আমদানী করেছেন। তাঁর 'আলেখ্য' (১৩১৪) কাব্য-গ্রন্থ থেকে কিছুটা নিদর্শন দেওয়া হল—

চতুর্দশ চিত্র

(নেতা)

কথায় কথায় যাচ্ছে শুধু কথা বেড়ে,
গানে গানে ছেয়ে পড়ল দেশটা।
কিন্তু বোঝা যাচ্ছে নাক নেড়ে চেড়ে
কি রকম যে দাঁড়ায় এখন শেষটা।
সভায় সভায়, মাঠে হাটে, গোলেমালে,
বক্তৃতাতে আকাশ পাতাল ফাট্‌ছে ;
যাদের সময় কাট্‌ত নাক কোনকালে
তাদের এখন খাসা সময় কাট্‌ছে।
নেতায় নেতায় ক্রমেই দেশটা ভ'রে গেল,
সবাই নেতা সবাই উপদেষ্টা,—
চেঁচিয়ে ত সবার গলা ধ'রে গেল,
অন্য কিছুর দেখাও যায় না শেষটা।
লিখে লিখে সম্পাদকে কবিগণে
ভীষণ তেজে অনুপ্রাসে কাঁদ্‌ছে ;
সবাই বল্‌ছে কি কাজ এখন 'পিটিশনে',
সবাই কিন্তু পায়ে ধ'রেই সাধছে।
কেউ বা খাসা নিজের থলে ভ'রে নিলে
দেশের নামে দিয়ে সবায় ধাপ্পা,
কেউ বা খাসা দু'পয়সা বেশ ক'রে নিলে
বিদেশীয়ে দিয়ে 'দেশী' ছাপ্পা।

দ্বিজেন্দ্রলালের 'হাসির গান' প্রকাশিত হয় ১৩০৭ সালে এবং 'আর্যগাথা'র দেশাত্মবোধক গানগুলি আরো পূর্ববর্তী (১৮৮২ এবং ১৮৯৩)। সুতরাং আমাদের নির্দিষ্ট সময়-সীমার মধ্যে সেগুলি পড়ে না।

অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯) : দ্বিজেন্দ্রলালের মতো অমৃতলাল বসুরও কয়েকটি বিদ্রূপাত্মক হাসির গান ও কবিতা সে-সময় বাঙালীকে মুগ্ধ করেছিল। পরিমাণের দিক থেকে তাঁর এ ধরনের রচনা কম হলেও গুণের

দিক থেকে প্রথম পর্যায়ের। গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল এবং অমৃতলাল তিন জনেই একযোগে স্বাদেশিকতার নামে ভণ্ডামিকে বিদ্রূপের মধ্যে দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করেন, আর তিন জনেরই আঘাতের জোর প্রায় এক রকম। তবে দ্বিজেন্দ্রলালের আঘাত একটু তীক্ষ্ণ বলে মনে হয়।

১৩১৩ সালে বসুমতী অফিস থেকে যে চার খণ্ড 'অমৃত-গ্রন্থাবলী' প্রকাশিত হয় অমৃতলালের এই ধরনের গান ও কবিতাগুলি সেগুলিতে স্থান পেয়েছিল। এমন কি ১৩১২ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার ভারতীতে তাঁর 'প্রোক্লামেশন্' নামে যে অপূর্ব কবিতাটি ছাপা হয় গ্রন্থাবলীর ১ম খণ্ডের শেষে সেটিও মুদ্রিত হয়েছিল।

১ম খণ্ডে সন্নিবেশিত 'বন্দেমাতরম্'-এর অন্তর্গত গানগুলি সিরিয়াস্ এবং এগুলিতে দেশের বাস্তব পরিস্থিতি প্রাধান্য পেয়েছে। ৪র্থ খণ্ডের অন্তর্গত 'সঙের ছড়া'র কবিতাগুলি বিদ্রূপাত্মক এবং দ্বিজেন্দ্রলালের মতই বুদ্ধিপ্রধান। এখানে একটি কবিতা বা ছড়া থেকে সামান্য অংশ উদ্ধৃত হল।

ইংরেজী শিক্ষা বাঙালীর যে কি কল্যাণ সাধন করেছে সে-কথা কবি এই কবিতায় স্বীকার না করলেও বাঙালী তা কোন্দিন অস্বীকার করবে না। কিন্তু এই শিক্ষার ফলেই সেদিন দেশের একদল মানুষ চেতনা হারিয়েছিল। কবি তাদের বিদ্রূপ করতে গিয়ে ইংরেজী শিক্ষা-ব্যবস্থাকেই বিদ্রূপ করেছেন।

একশ' বছর সমান টানে
মাতাল ছিলেম মদ্য পানে
বিলিতি বোতলে পোরা
গোরার চোলাই করা সে সুরা, নাম তার এডুকেশন্।
সঙ্গে সঙ্গে ছিল চাট্
পেণ্ট্ কোট টাই সার্ট
উঠিয়ে দিয়ে পূজা-পাঠ
ইংরিজি ঠাট, ইংরিজি নাট, ইংরিজি ফ্যাসান্।

* * *

সে মদের নেশার ঝোঁকে
ধরা সরা দেখতেম চোখে
ভাবতেম যত ছোট লোকে

মন্ত্রে বোকে পড়ে ভ্যাম্ রামায়ণ ;
সংস্কৃত পড়তেন ম্যাক্সমুলার
নইলে কে এমন ফুল্ আর
(যখন) ইংরেজ আমাদের রুলার
তখন ভারনাকিউলার্ তো ভাদ্র-বৌয়ের মতন ।

* * *

(হায়) দু'দণ্ডের মদানন্দ
ঝাল্ ঝাল্ চাটে পেঁজের গন্ধ
কেন আমাদের করলে অন্ধ
(এখন) ঘরের দরজা সকল বন্ধ
সন্ধ করে মন্দ বলে বন্দনা যার করি ।

তাই নেশান্তে ফিরে-আসা আত্ম-জ্ঞানের স্বগতোক্তি—
(আর) বসবো না গো রাজার বাড়ী পাত পেতে ।
ভোজের ঐ এঁটো খেতে গজিয়ে গেল—
কাঁটা গাছ নিজের খেতে ॥
('খোয়াড়ী')

রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০): "১৩১২ সালের ভাদ্র মাসে বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ-ঘোষণার কয়েক দিন পরে কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ ধরিয়া কতকগুলি যুবক নগ্নপদে 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' গান গাহিয়া যাইতেছিল। এখনও মনে আছে, গান শুনিয়া আমার রোমাঞ্চ উপস্থিত হইয়াছিল।"[৮] স্বদেশীযুগের এই বিখ্যাত গানটির মত এর রচয়িতা তাঁর আরো অনেক আবেগময় গানের স্পর্শে সেদিন সমস্ত বাঙালী জাতিটিকেই রোমাঞ্চিত করে তুলেছিলেন।

রজনীকান্ত সেন কবি নয়, গীতিকার। গানের সঙ্গে তাঁর মনের আর জীবনের একটা অচ্ছেদ্য যোগ ছিল। তাঁর 'বাণী' গ্রন্থের ভূমিকায় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এই কথাই বলেছেন—"কাহারও বাণী গদ্যে, কাহারও পদ্যে, কাহারও বা সংগীতে অভিব্যক্ত। রজনীকান্তের কান্তপদাবলী কেবল সংগীত।"

৮ 'কান্তকবি রজনীকান্ত', নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, পৃ—৭৬।

সংগীত-সৃষ্টিতে রজনীকান্তের ওপর রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছিল ; বিশেষ করে বিদ্রূপাত্মক গানগুলি দ্বিজেন্দ্রলালের প্রায় অনুকরণ হয়ে উঠেছে। তাঁর প্রকাশিত গানের বইগুলির মধ্যে দুটির কথা এখানে উল্লেখ করা হল—'বাণী' (১৩০৯) এবং 'কল্যাণী' (১৩১৬)।

'বাণী'-গ্রন্থের তিনটি ভাগ—'আলাপে', 'বিলাপে' এবং 'প্রলাপে'। 'আলাপে'-র মধ্যে—'সেথা আমি কি গাহিব গান', 'শ্যামল শস্য-ভরা' এবং 'স্নেহ বিহ্বল করুণা ছলছল্' গান তিনটি আছে। এখানে 'প্রলাপে'র অন্তর্গত 'জাতীয়-উন্নতি' নামক বিদ্রূপাত্মক গানটির কিছু অংশ উদ্ধৃত হল,

হয় নি কি ধারণা, বুঝিতে পার না,
ক্রমে উঠে দেশ উচ্চে!
যেহেতু, যেগুলো রুচিত না আগে,
এখন সেগুলো রুচ্ছে।

*　　　*　　　*

যেহেতু আমরা 'হ্যাটে' ঢাকি টিকি,
সদা জামা রাখি শরীরে ;
(আর) 'শ্যাণ্ট্ পো' বলি 'শান্তিপুর'কে
'হ্যারি' ব'লে ডাকি 'হরি'রে ;

*　　　*　　　*

(আর) যেহেতু আমরা নেশা করি,
কিন্তু প্রাইভেট্ ক্যারেক্টার্ দে'খ না ;
কংগ্রেসে যা বলি তাই মনে রেখো,
আর কিছু মনে রেখো না।

'কল্যাণী' (১৩১৬) থেকে এই ধরণের আর একটি হাসির গানের নিদর্শন,

তোরা, যা কিছু একটা হ'।
Ray, কি Sinha, কি Doss, কি Shanne,
কি Dutt, কি Dwarkin ; Shaw.
সাফ ক'রে মাথা whisky চা' পানে,
ধু'য়ে কালো অঙ্গ glycerine সাবানে,

ছুটে যা বিলেত, Italy, Japan-এ,
(and) inspire your Country-men with awe!

*　　*　　*

আর এক উপায়ে হতে পারে যশ,
একটা নূতন হবে, অর্থাৎ 'দশমরস',
বিলিতি যা' কিছু সবই nonsense, bosh,
(যা রে) লিখে or lecture-এ ক'।"

('উঠে পড়ে লাগ্')

আমাদের আলোচ্য পর্বে রজনীকান্তের আরো কয়েকটি গানের বই প্রকাশিত হয়। কিন্তু সেগুলিতে ভক্তিমূলক অধ্যাত্মচিন্তার নিদর্শনই বেশি।

গোবিন্দচন্দ্র রায় (১৮৩৮-১৯১৭): পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলার অধিবাসী হলেও কবি গোবিন্দচন্দ্র রায় বাংলার মাটি ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। বরিশালে যখন তিনি জরীপ বিভাগের মাত্র ১৫৲ টাকা বেতনের কেরানী তখন তাঁর ওপরওয়ালা কয়েকজন রাজকর্মচারীর অসৎ স্বভাবের বিরুদ্ধে তৎকালীন ঢাকা প্রকাশ পত্রিকায় তাঁর একটি লেখা বেরোয়। ফলে তিনি ফৌজদারী মামলার সম্মুখীন হয়ে পড়েন। আত্মরক্ষার জন্যে তিনি সপরিবারে ১৮৬৮ সালে কাশী চলে যান। সেখানে চার বছর হোমিওপ্যাথি শিক্ষা করে আগ্রায় গিয়ে ১৮৭১ সাল থেকে হোমিওপ্যাথিক্ ডাক্তার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন, এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু।[৯]

গোবিন্দচন্দ্র ছিলেন সুগায়ক এবং আজীবন সংগীত-সাধক। তাঁর যে দুটি কবিতা 'গীতিকবিতা' ১ম ভাগে (১২৮৮?) ছাপা হয়েছিল 'বাঙালীর গান' (১৩১২) গ্রন্থে সে দুটির অংশ-বিশেষ পুনর্মুদ্রিত হয় এবং খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কবিতা দুটি হল 'ভারতবিলাপ' ও 'যমুনালহরী'। বিশেষ করে 'ভারত-বিলাপ' রচনাকালের প্রায় চব্বিশ বছর পরে বাঙালীর হৃদয়-গাথা হয়ে উঠেছিল। এই কবিতাটিরই কটি পংক্তি ১৩১৪ সালের প্রবাসীর মলাটে ছাপা হত, এ কথা প্রবাসী প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। সেই বিখ্যাত পংক্তি কটি বাদ দিয়ে 'ভারত-বিলাপ'-এর কিছু অংশ উদ্ধৃত হল,

---

৯ দ্রষ্টব্য—'সাহিত্য-সাধক চরিতমালা'-ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩য় খণ্ড।

নিজ শোণিত শোষি, পরে পুষিলে
তুষিতে কুল শীল স্বধর্ম দিলে।
পর বেশ নিলে, পর দেশ গেলে
তবু ঠাঁই মিলে নাহি দাস বলে।

*   *   *

শিখিলে যত জ্ঞান, নিশীথে জেগে
উপযুক্ত হলো পরসেবা লেগে।
হলো চাকরি সার, যথায় তথায়
অপমান সদায় কথায় কথায়।

*   *   *

পরে ব্রহ্ম বধে, তৃণ নাহি নড়ে
তব ভ্রান্তি হলে ভূমিকম্প ধরে।
উলটে পৃথিবী, পরগা পরশে
সুখশান্তি লভে তব কায় রসে।

*   *   *

বন বর্বর ও স্ববশত্র খুঁজে
তবু ভারত সে সব নাহি বুঝে।

'যমুনালহরী'তে কবি যমুনার কল-কল্লোলে অতীত ভারত-গাথা শুনেছেন ; কবিতাটি কবির মুগ্ধ ব্যথিত হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত আক্ষেপ।

বিজয়চন্দ্র মজুমদার (১৮৬১-১৯৪২) : বিদ্রূপাত্মক কবিতা রচনায় কিছুটা স্বকীয়তা দেখিয়েছিলেন বিজয়চন্দ্র মজুমদার। ছন্দ, শব্দ-বিন্যাস এবং ভাবপ্রকাশের বৈশিষ্ট্য তাঁর এই ধরনের কবিতাগুলির লক্ষণীয় বিষয়। দ্বিজেন্দ্রলাল-অমৃতলালের প্রভাবকে তিনিও অস্বীকার করতে পারেন নি। তবু সে প্রভাব কাটিয়ে উঠে নিজস্ব একটা প্রকাশভঙ্গি গড়ে তুলতে তিনি যে সচেষ্ট ছিলেন কবিতাগুলির মধ্যে তার প্রমাণ পাওয়া কঠিন নয়। অন্য ধরনের কবিতা লেখার ব্যাপারেও তাঁর লেখনী যথেষ্ট শক্তির পরিচয় দিয়েছে। পত্র-পত্রিকা প্রসঙ্গে তাঁর এ ধরনের কবিতার কিছু পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

বিজয়চন্দ্রের প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে থেকে এখানে শুধু 'যজ্ঞভস্ম'

(১৩১১) এবং 'ফুলশর' (১৩১১) বই দুটির উল্লেখ করা হল। এই বই দুটিতেও তাঁর দেশপ্রেমমূলক কবিতা বিশেষ নেই। 'যজ্ঞভস্মে'র কয়েকটি কবিতাতে, যেমন— 'উদ্বোধন', 'খণ্ডগিরি উদয়গিরি' প্রভৃতি— অল্প-স্বল্প স্বদেশপ্রেমের নিদর্শন মেলে। তবে 'ফুলশর'-গ্রন্থের দুটি বিদ্রূপাত্মক কবিতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য— 'বাঙলার পলিটিক্‌স্' এবং 'বঙ্গমঙ্গল (খণ্ডকাব্য)'। দ্বিতীয়টি বঙ্গদর্শনে (ফাল্গুন, ১৩১০) ছাপা হয়েছিল। তাই এখানে শুধু প্রথমটি থেকে সামান্য অংশ উদ্ধৃত হল। কবিতাটিতে আরাম-প্রিয় ভণ্ড রাজনীতিজ্ঞদের স্বরূপোদ্‌ঘাটন করা হয়েছে—

আরাম চেয়ারে শুয়ে ভেবে কূল পাইনে—
কিম্বিধ শাসন-নীতি হবে ফিলিপাইনে!

এইভাবে আরাম চেয়ারে শুয়ে দুনিয়ার রাজনীতি-সমুদ্র মন্থন করার পর প্রশ্ন জাগে—

কেবল জিজ্ঞাসা করি,
যদি লই এডিটরি,
এত বিদ্যা লয়ে আমি কত পাব মাইনে?

কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত (জন্ম, ১৮৮৪): নব্যভারত-প্রসঙ্গে কবি কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্তের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সে সময়ে লেখা কার্তিকচন্দ্রের প্রায় প্রতিটি কবিতাই চরমপন্থী মনোভাবের পরিচায়ক। তাঁর এই ধরনের কবিতার দুটি সংকলন তখন প্রকাশিত হয়— 'আমার দেশ' (১৯০৬) এবং 'পূজা' (১৯০৭)। গ্রন্থদুটির একটিও এখন আর পাওয়া যায় না; তবে স্বয়ং কবির কাছ থেকে এদুটি সম্বন্ধে কিছু তথ্য আমি জানতে পারি। 'আমার দেশ' গ্রন্থটি কুন্তলীন প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। আশ্চর্যের কথা এটির প্রকাশক বসন্তকুমার দাস কাজ করতেন পুলিশে। কোকিলেশ্বর শাস্ত্রী বইটির ভূমিকা লিখে দেন। সে সময়ের অনেকগুলি পত্রিকাতেই এটির প্রশংসামূলক সমালোচনা ছাপা হয়। ৯ই ফাল্গুন, ১৩১৪ সালের সন্ধ্যা পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়,—

এই আটটি কবিতা আটটি কোহিনুর।…বইখানি দেশের তাঁতি ও চাষীদের নামে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে।…বলা বাহুল্য বাংলা দেশের এত হোমড়া-চোমড়া লেখকদের মনে দেশের চাষা ও তাঁতীদের নামে তাঁহাদের

কোন গ্রন্থ উৎসর্গ করিবার কল্পনা কখনও উদয় হয় নাই— বর্তমান লেখকই এ সম্বন্ধে (আমাদের বিবেচনায়) প্রথম পথ-প্রদর্শক।[১০]

বইটিতে সংকলিত 'মাতৃপূজা' নামক একটি কবিতার সামান্য অংশ উদ্ধৃত হল—

বিশ্বময়ী মায়ের পূজা—মায়ে দিবেন বর
এ পূজায় চাই মুণ্ড ডালি, আয় রে নারী-নর!
নেত্র আপন দিয়া পায় দাশরথি পূজল মায়,
আমরা তো ভাই তিরিশ কোটি তারি বংশধর
রক্তজলে বিশ্বময়ীর চরণ রক্ত কর্।[১১]

'পূজা' গ্রন্থটি কুমারটুলিতে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের প্রেসে ছাপা হয়। প্রকাশক—জ্ঞানেন্দ্রমোহন বসু। বিষয়, ভাব ও প্রকাশভঙ্গির দিক থেকে 'আমার দেশে'র কবিতাগুলির সঙ্গে এই গ্রন্থের কবিতাগুলির যথেষ্ট মিল আছে।

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী (১৮৭২-১৯৪৯)ঃ কবি-প্রতিভার বিচারে প্রমথনাথ রায়চৌধুরী বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে খুব উন্নত আসনের দাবি করতে পারেন না। তবে রবীন্দ্র-কনিষ্ঠ এবং রবীন্দ্র-অনুগামী অন্যান্য সার্থক কবিদের তিনি একজন। তাঁর কাব্য-শক্তি সহজাত এবং অনুশীলনও দীর্ঘকাল-প্রসারী। স্বদেশের সঙ্গে কবির যোগসূত্র যে কতটা নিবিড় ছিল বহু কবিতায় তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে। এখানে ১৩১২ সালে প্রকাশিত তাঁর দুখানি কাব্য-গ্রন্থের উল্লেখ করছি—'দেশভক্তি'[১২] এবং 'কবিতা'। বিশেষ করে প্রথম গ্রন্থটির মধ্যে কবির স্বদেশ-প্রেমের আবেগ এক বিশিষ্ট কাব্যরূপ লাভ করেছে। ব্যবহারিক জীবনের তুচ্ছ ঘটনাকে অবলম্বন করে কবি তাঁর অন্তরের আবেগকে সহজ-সংবেদ্য করে তুলেছেন। 'দেশভক্তি'র এই ধরনের কবিতা—'ভিখারীর দান', 'মেয়েতে মা-রূপ', 'মা-পাগলা ছেলে' ইত্যাদি। একটি কবিতার অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত হল। শিশু পুত্রের অবুঝ মনেও স্বদেশ-ভক্তির সাড়া পেয়ে কবি তার সম্বন্ধে বঙ্গজননীকে জানাচ্ছেন—

১০ কবির ব্যক্তিগত ফাইলে সন্ধ্যা পত্রিকার কাটিং।

১১ কবির সৌজন্যে তাঁর ব্যক্তিগত ফাইল থেকে সংগৃহীত।

১২ ১৯০৫ সালেই এই কাব্য-গ্রন্থটির দুটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

পুত্রের মা, পিতার মা,
কে তুই নব-বঙ্গে
এক সঙ্গে আজ বাপ-ছেলেকে
ভাসালি তরঙ্গে!
দুধের বাছা আমার ক্ষুদে!
হা, জননী মোর,
তারও কাছে রাখিস্ আশা,
এতই দৈন্য তোর?
অবুঝের এ মাতৃ-পূজা;
তাহাই যদি চাস্
শ্যামা মায়ের রাঙ্গা পায়ের
হোক সে ছোট্ট দাস!
('মা-পাগলা ছেলে')

এ ছাড়া ঐতিহাসিক কাহিনী-মূলক কবিতাও কিছু আছে, যথা— 'মরণ না বাঁচন', 'সব লাল হো যাগা'; 'বাপ-কো বেটা' ইত্যাদি। রুষ-জাপানের যুদ্ধে জাপানী জাতীয়তাবোধের সমর্থনেও একটি কবিতা আছে।

'কবিতা' গ্রন্থের তিনটি কবিতা দেশাত্মবোধক—'পুত্র ও মাতা', 'ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদ' এবং 'জয়-সংগীত'। 'পুত্র ও মাতা' কবিতাটির দুটি ভাগ—'পুত্রের উক্তি' ও 'মাতার উক্তি'। পুত্র নিজের স্বার্থপর ভণ্ডামিকে দেশভক্তি বলে চালায়; নিজেও সে সম্বন্ধে সচেতন। এ পুত্রের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের 'নন্দলালের' অনেকটা মিল আছে। কিন্তু কবিতা হিসাবে 'নন্দলাল' অনেক উচ্চাঙ্গের। পুত্র বলছে—

সম্প্রতি শুনিনু মাতঃ, পাব কিনা জানি না ত,
আদালতে কর্মখালি আছে,
বন্ধ করি 'সিডিশান্' দিতে হবে 'পিটিশান্'
গিয়ে জজ্ সাহেবের কাছে,
কামাইতে হবে দাড়ি চস্মা দিতে হবে ছাড়ি,
উহা নাকি কংগ্রেসি ধরণ!

দায়গ্রস্ত ভাবে নাই, যে সব স্বদেশী ভাই
উঠাইলা তাহারে তখন,
সাহেবের কাছে গিয়ে কর্ত্তে হবে নাম নিয়ে
তাহাদেরি শ্রাদ্ধ অতঃপর !
কিন্তু এই ভেবে তুমি ক্ষমা দিও, মাতৃভূমি,
তব লাগি কেঁদেছি বিস্তর !
(আরো কিছু চাও এর পর ?)

পুত্রের এই উক্তিতে মা বলছেন, তাকে দেবার মতো তাঁর কিছু তো নেই, তবু তিনি এখনো অন্তরে ক্ষীণ আশার শিখাকে জ্বালিয়ে রেখেছেন।

এই সময়কার এই দুটি কাব্য-গ্রন্থ ছাড়া প্রমথনাথের অনেকগুলি দেশাত্মবোধের গান ও কবিতা তখন বিভিন্ন মাসিকপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। পত্র-পত্রিকার প্রসঙ্গে কিছু কিছু আলোচনা করা হয়েছে।

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী (১৮৫৮-১৯৪২) : মহিলা কবিদের মধ্যে কাব্য-সৃষ্টিতে যাঁরা স্বকীয়তার স্বাক্ষর রেখে গেছেন গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী তাঁদের মধ্যে অন্যতম। অনুভূতির সঙ্গে প্রকাশভঙ্গির একটা সহজ সখ্য তাঁর কাব্যে লক্ষ্য করা যায়। জাতীয়তাবোধের কবিতাও তিনি অনেকগুলি রচনা করেছিলেন। আমরা এখানে তাঁর একটি মাত্র কাব্যগ্রন্থেরই উল্লেখ করব—'স্বদেশিনী' (১৩১২)। বইটি "ভারতের স্বদেশভক্ত নরনারীর করে" উৎসর্গীকৃত। এতে ১৮টি কবিতা আছে, প্রত্যেকটিই স্বদেশপ্রেমের ; যেমন, 'আহ্বান-গীতি', 'অঙ্গচ্ছেদ', 'মাতৃস্তোত্র', ইত্যাদি। 'আহ্বান-গীতি'র এক জায়গায় কবি লিখছেন—

অন্ধের মতন দ্বারে বসে বসে
কতই কাঁদিস্ কাঁদুনী !
কে দিবে তোদের ঈপ্সিত রতন
করে তুলে বল্ তা শুনি।
ঝটিকার মত আয়—উচ্ছৃংখল—
উদ্দাম বেগে ছুটিয়া—
ঘর ভরা মোর সাধের ভাণ্ডার
চোরে ঐ নিল লুটিয়া।

স্বদেশিনী

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

প্রণীত

প্রকাশক

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

২০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

১৩১৩

ঠিক এমনতর বলিষ্ঠতা সে সময় মহিলা-কবিদের লেখায় সহজ-লক্ষ্য নয়। 'বঙ্গভঙ্গে কৃষকের গান' নামে অপর একটি কবিতায় কবির বাস্তবদৃষ্টি ও দেশের মানুষের দুরবস্থাগত বেদনাবোধ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—

ওরে দুপুর রোদে ফাটিয়ে মাথা
সার হয়েছে ছেঁড়া কাঁথা
মরে অনাহারে বৃদ্ধ মাতা—
বল্‌বো কত শুনবি কি আর ;
ও ভাই ঘরের লক্ষ্মী পরকে দিয়ে
ঘুরে বেড়াই দুয়ার দুয়ার।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২)ঃ 'নিত্য প্রাতে উচ্চারিব পণ—বাঁচাব দেশের শিল্প—দেশের জীবন।' স্বদেশী যুগের সূচনায় বাংলা কাব্য-ক্ষেত্রে এই শপথ-বলিষ্ঠ মানসতা নিয়ে যে কবির আত্মপ্রকাশ ঘটল তিনি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। স্বদেশী আন্দোলনের প্রত্যক্ষ প্রভাব তখনকার প্রায় সমস্ত বাঙালী কবিকেই অল্পবিস্তর অভিভূত করেছিল, কিন্তু সমাজ ও রাজনীতির চেতনালোকে আন্দোলনের তত্ত্বাদর্শকে এমনভাবে কাব্যরূপ দান করতে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ সক্ষম হন নি। এর কারণ, বস্তুজগতের সম্মিলিত জ্ঞানবুদ্ধিই তাঁর কাব্যের উৎস-মুখ। "সদাজাগ্রত দেশচেতনায় ও সমাজচেতনায় তাঁহার কাব্য-সম্পদ্‌ প্রায় সর্বত্র অনুস্যূত।"[১৩]

স্বদেশী-আন্দোলন-পর্বে প্রকাশিত সত্যেন্দ্রনাথের প্রথম কাব্য-গ্রন্থ 'সন্ধিক্ষণ' (১৯০৫)। বাংলায় জাতীয় একতা স্থাপনের সাধনায় যাঁরা ব্যাপৃত কবি এই বইটি তাঁদের উৎসর্গ করেছেন—

যাঁহারা আদর্শ আজি বঙ্গে একতার
তাঁহাদেরি তরে এই ক্ষুদ্র উপহার।[১৪]

বিজাতীয় মোহের অন্ধকার দূর করে স্বদেশী আন্দোলন বাঙালীর মনোদিগন্তে স্বদেশ-চেতনার স্বর্ণরশ্মি ছড়িয়ে দিয়েছে ; তাই স্বদেশীযুগের সন্ধিক্ষণ বাংলার ইতিহাসে রচনা করেছে স্বর্ণযুগ। যাঁরা এই আন্দোলনের মধ্যে শুধু একটা

১৩ 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'—ডাঃ সুকুমার সেন, ৪র্থ খণ্ড, পৃ ৮৯।

১৪ 'সন্ধিক্ষণ'-এর প্রথম পৃষ্ঠায় মুদ্রিত।

হুজুগের লক্ষণই ফুটে উঠতে দেখেছেন তাঁরা সংকীর্ণ-দৃষ্টি। কবি তাঁদের বিরূপ সমালোচনায় স্বদেশ-সাধকদের বিভ্রান্ত না হয়ে আত্মতেজে ভর করে অগ্রসর হতে প্রেরণা দিয়েছেন—

স্থবেশ রাখাল-বেশ সকল ভুলিয়া,
ধন্য হও স্বদেশের কাজে ;
প্রতিজ্ঞা রাখিয়া স্থির স্থাণুর মতন
মান্য হও জগতের মাঝে।
আত্মতেজে করি' ভর—
কর্মে হও অগ্রসর !
মূর্খে শুধু বলে এ 'হুজুগ' ;
বঙ্গ-ইতিহাসে আজ এল স্বর্ণ-যুগ !

শ্রদ্ধাস্পদ ডাঃ স্থকুমার সেন যথার্থই মন্তব্য করেছেন—"সন্ধিক্ষণে স্বদেশী আন্দোলনের যুগোদ্‌বোধন ও কর্মপ্রশস্তি।"[১৫]

'সন্ধিক্ষণে'র পর কবির 'বেণু ও বীণা' কাব্যগ্রন্থটি (১৯০৬) বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। 'সন্ধিক্ষণ' কবিতাটিও এতে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। এই বইটিতে প্রকাশিত কবিতাগুলির রচনাকাল ১৮৯৩ হতে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ। স্থতরাং কয়েকটি কবিতা প্রাক্-আন্দোলন যুগের, যেমন 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' কবিতাটি। তাই স্বদেশী আন্দোলনের প্রস্তুতি-পর্বেরও কিছু পরিচয় এতে পাওয়া যায়। এখানে এই বইটি থেকে 'বঙ্গ-জননী' কবিতাটির কিছুটা অংশ উদ্ধৃত করছি। কবি বঙ্গ-জননীকে দেখেছেন জগদ্ধাত্রীরূপে—বাঘের পিঠে বিরস-মুখে বসে আছেন ; কিন্তু দেশব্যাপী অন্যায়-অত্যাচার আর জড়ধর্মী সহনশীলতার মধ্যে কি তিনি শুধুই ম্রিয়মাণ হয়ে থাকবেন ? কবি তাই তাঁর কাছে আকুল আবেদন জানাচ্ছেন—

ত্রিশূল তুলে নে মা আবার রূপের জ্যোতি পরকাশি,
ভয়-ভাবনা ভাসিয়ে দিয়ে হাস্ মা আবার তেম্‌নি হাসি !
চরণতলে সপ্তকোটি সন্তানে তোর মাগে রে—
বাঘেরে তোর জাগিয়ে দে মা, রাগিয়ে দে মা নাগেরে ;

১৫ 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'—ডাঃ স্থকুমার সেন, ৪র্থ খণ্ড, পৃ ৯৭।

সোনার কাঠি, রূপার কাঠি,—ছুঁইয়ে আবার দাও গো তুমি,
গৌরবিনী মূর্তি ধর—শ্যামাঙ্গিনী—বঙ্গভূমি !

এই অংশটিতে বেশ একটা জোরালো মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে যার সঙ্গে সমসাময়িক বৈপ্লবিক চেতনার মিল খুঁজে পাওয়া শক্ত নয়। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ আসলে সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করেন নি ; তবু এ ধরনের উত্তেজনাময় লেখা যে দু'এক ছত্র তাঁর হাত থেকে বেরিয়েছে তার কারণ "রাজনৈতিক চাঞ্চল্যের কলরোল, কর্মঝঞ্ঝা, কটুকাটব্য, যুদ্ধমুখিতা তাঁকে নানা ভাবে স্পর্শ করেছে। কিন্তু তাঁর মজ্জায় ছিল শান্ত নিরীক্ষার বৈশিষ্ট্য।"[১৬]

অর্থাৎ তাঁর মজ্জায় ছিল 'শান্তিরস'—রবীন্দ্রনাথ যে সম্বন্ধে বলেছেন 'নৈবেদ্যে'র 'অপ্রমত্ত' কবিতায়। তাই রবীন্দ্রনাথের মতো তিনিও স্বাজাত্যবোধের সংকীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ হন নি—সর্বমানবিক প্রীতি-বন্ধনের ওপরেই তাঁর দেশপ্রেমকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। 'কুহু ও কেকা'র (১৯১২) অনেকগুলি কবিতাতেই কবির মনোবীণার এই সুরটি ধরা পড়েছে। ধর্মানুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের একটি প্রচেষ্টা বাংলা দেশে এক সময় গড়ে ওঠে—সেটি সত্যনারায়ণের পূজা। মুসলমানদের কাছে ইনিই হলেন সত্য-পীর। সত্যনারায়ণের পাঁচালীতে আছে—

সত্য-পীর বলি সবে শিরে দিবে হাত।
নারায়ণ বলিয়া করিবে প্রণিপাত ॥[১৭]

সত্যেন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন নিছক রাজনৈতিক প্রয়োজনে যে মিলন তা ক্ষণভঙ্গুর ; মানুষের অন্তরকে না মেলাতে পারলে সাম্প্রদায়িকতা দূর হতে পারে না ; তাই পাঁচালীর কবির কথাই তিনি নতুনভাবে প্রকাশ করলেন—

গুগ্‌গুল্ আর গুলাবের বাস
মিলাও ধূপের ধূমে !
সত্য-পীরের প্রচার প্রথমে
মোদেরি বঙ্গভূমে।

---

১৬ 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা ও কাব্যরূপ'—হরপ্রসাদ মিত্র, পৃ ৭০।

১৭ শঙ্কর-আচার্যের সত্যপীরের পাঁচালী।

পূর্ণিমা রাত্তি ! পূর্ণ করিয়া
দাও গো হৃদয় প্রাণ ;
সত্যপীরের হুকুমে মিলেছে
হিন্দু-মুসলমান !
পীর পুরাতন,—নূর নারায়ণ,—
সত্য সে সনাতন ;
হিন্দু-মুসলমানের মিলনে
তিনি প্রসন্ন হন্ ! ('ফুল-শিনি')

এই গ্রন্থের 'শূদ্র', 'মেথর' ইত্যাদি কবিতায় সমাজে অবহেলিত নির্যাতিত মানুষের জন্যে কবির সংস্কার-মুক্ত সমবেদনা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে ; তাঁর কবি-মনের চেয়ে জ্ঞানী-মনের প্রকাশই এগুলিতে প্রধান।

অন্যান্য কয়েকজন কবি ঃ এখানে আরো কয়েকজন কবির কথা উল্লেখ করছি আজ যাঁদের পরিচয় সাধারণ বাঙালী পাঠক সম্পূর্ণ ভুলে গেছে। অথচ এক সময়ে এঁদের কবি-খ্যাতি ছিল এবং স্বদেশী আন্দোলনের সময় এঁরাও কিছু ভালো কবিতা লিখেছিলেন।

রমণীমোহন ঘোষ (?—১৯২৮) ঃ এঁর দুটি কাব্যগ্রন্থ এই সময়ে প্রকাশিত হয়—'মঞ্জরী' (১৩১৪) এবং 'ঊর্মিকা' (১৩২০)। 'মঞ্জরী' রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গীকৃত। এই গ্রন্থের 'সংকল্প', 'বন্দনা', 'স্নেহময়ী', ইত্যাদি কবিতাগুলিতে কবির স্বাদেশিকতা প্রকাশ পেয়েছে। 'ঊর্মিকা'র মধ্যেও এই ধরনের কয়েকটি কবিতা আছে ; যথা—'স্বদেশ', 'বঙ্গভূমি', 'বঙ্গমঙ্গল' প্রভৃতি। ভাবভঙ্গি বৈশিষ্ট্যহীন।

রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় ঃ ১৩১৪ সালে এঁর 'সাধনা' নামে একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এঁর লেখাও বৈশিষ্ট্যহীন। তবে প্রকাশভঙ্গি সরল ও আন্তরিকতা স্বতঃস্ফূর্ত। দেশবাসীর প্রতি কবির যেন একটা পিতৃসুলভ মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে ; ভর্ৎসনা করে বলছেন—

উচ্ছ্বাস

সৈয়দ আবু মোহাম্মদ ইস্মাইল
হোসেন সিরাজী প্রণীত।

কলিকাতা,

২১০/৫ নং কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট, নব্যভারত-প্রেসে,
শ্রীভূতনাথ পালিত দ্বারা মুদ্রিত
ও প্রকাশিত।
১৩১৪।

মূল্য ।০ আনা।

ওরে মনুষ্যত্বহীন কুলাঙ্গার দল,—
খাইয়া প্রচণ্ড লাথি,
এখনো দু' হাত পাতি
ভক্তিভরে করিবি কি পদামৃত পান?
দেখ না মায়ের কোলে আছে কিনা স্থান!

গঙ্গাচরণ দাশগুপ্ত: ইনি কলকাতা ডেভিড্ হেয়ার ট্রেনিং কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। সে সময়ে ভারতীতে এঁর কিছু দেশাত্মবোধের কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল; এঁর দুটি কাব্যগ্রন্থ আছে। আমাদের আলোচ্য বিষয়ে একটির উল্লেখ করা যেতে পারে—'পরাগ'। ১৩২১ সালে ঢাকার এলবার্ট লাইব্রেরী এটি প্রকাশ করেন। কবিতাগুলি রচিত হয় আট বছর আগে এবং সেগুলি ভারতী, সাহিত্য, বঙ্গদর্শন, প্রবাসী ও সুপ্রভাতে ছাপা হয়েছিল। কাব্যগ্রন্থটির কোন কোন কবিতায় স্বদেশপ্রেমের পরিচয় মেলে; যেমন—'উদাসীর গান' কবিতাটি।

জীবেন্দ্রকুমার দত্ত (১৮৮৩—?)**:** ইনি চট্টগ্রামের কবি বলেই পরিচিত হয়েছিলেন। এঁর তিনখানি কাব্যগ্রন্থ আছে। একটির নাম এখানে উল্লেখ করা হল—'অঞ্জলি' (১৩১৪)। এই বইটি সম্বন্ধে সে সময়ে প্রবাসীতে যে সমালোচনা বেরিয়েছিল এখানে তা উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না: "শুভক্ষণে দেশময় স্বদেশপ্রীতি জাগিয়া উঠিয়াছে। এই প্রীতির উচ্ছ্বাসে গ্রন্থকার যে কবিতাগুলি লিখিয়াছেন, তাহা সুপাঠ্য ও সুরচিত।"

সৈয়দ আবু মোহাম্মদ ইস্মাইল হোসেন সিরাজী: এই সময়ে কয়েকজন মুসলমান লেখকও স্বদেশীভাবের সমর্থনে ও হিন্দু-মুসলমানের মিলনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কবিতা লেখায় হাত দিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে সৈয়দ সিরাজীর নাম উল্লেখযোগ্য। ইনি ছিলেন সিরাজগঞ্জের অধিবাসী। তখনকার দুটি প্রথম পর্যায়ের মাসিকপত্রে এঁর লেখা মাঝে মাঝে প্রকাশিত হত। কবির দুটি মুদ্রিত কাব্যগ্রন্থের নাম করছি—'নব উদ্দীপনা' (১৩১৪) এবং 'উচ্ছ্বাস' (১৩১৪)। 'নব-উদ্দীপনা' নব্যভারতে প্রকাশিত হয়[১৮]; 'উচ্ছ্বাস' মুস্লিম জাতীয়তাবোধের কাব্য।

---

১৮ নব্যভারতের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

স্বদেশীগানের কয়েকটি সংকলন গ্রন্থ : স্বদেশীযুগে গীতিকারের সংখ্যাই বোধ হয় সবচেয়ে বেশি। আর এই সংখ্যাধিক্যের কারণও খুব স্বাভাবিক। হৃদয়ে-হৃদয়ে আবেগ-প্রেরণা সংক্রমণের সরল পথটি হল সংগীত। এই পথ-রচনায় সেদিন খ্যাত-অখ্যাত অনেকেই হাত লাগিয়েছিলেন। অবশ্য নির্মাণ-শিল্পে সাফল্যের স্বাক্ষর রেখে গেছেন কয়েকজন মাত্র।

আন্দোলনের সময় গীতিকার হিসাবে যাঁরা খুব নাম করেছিলেন তাঁদের কয়েকজনের প্রতিষ্ঠা বাংলা সাহিত্যে অক্ষয় হয়ে আছে। এঁদের কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। এঁরা ছাড়া আরো কয়েকজন দেশাত্মবোধের গান লিখে সেদিন স্বদেশী আবহাওয়াকে বেশ গরম করে রেখেছিলেন। এঁদের মধ্যে এই কজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যবিশারদ, কামিনীকুমার ভট্টাচার্য, অশ্বিনীকুমার দত্ত, মুকুন্দ দাস, গোবিন্দচন্দ্র দাস, মনোমোহন চক্রবর্তী, প্রমথনাথ দত্ত, বরদাচরণ মিত্র এবং রাজকৃষ্ণ রায়। এ ছাড়া ময়মনসিংহের সুহৃদ-সমিতির মোমিনের নামে অনেকগুলি গান পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে সুপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক যতীন্দ্রমোহন বাগচী ও মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ও দুএকটি উত্তেজনামূলক স্বদেশী-সংগীত রচনা করেছিলেন। 'করালী' ছদ্মনামেও একজনের গানের সন্ধান মেলে। মনে হয় ইনি ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ; কারণ 'করালী' নামে একটি অর্ধ-সাপ্তাহিক পত্রিকা ব্রহ্মবান্ধব কিছুদিন সম্পাদনা করেন। আর সে সময়ে ইংরেজ-বিদ্বেষজনিত মনোভাবের জন্যে তাঁর ভাষায় যে স্থূলতা আসে 'করালী'র গানের ভাষার সঙ্গে তার মিল আছে। পরে উদ্ধৃত উদাহরণ দেখলেই তা বোঝা যাবে।

স্বদেশী সংগীতের অনেকগুলি সংকলন তখন প্রকাশিত হয়েছিল। সেগুলির প্রায় সবই আজ দুষ্প্রাপ্য। এখানে ছটি গ্রন্থের কথা উল্লেখ করা হল—

১। 'স্বদেশী পল্লী-সংগীত'—রজনীকান্ত পণ্ডিত।
সুহৃদ যন্ত্রে মুদ্রিত, ময়মনসিংহ, ১৩১২।

২। 'স্বদেশ-সংগীত'—যোগেন্দ্রনাথ শর্মা, ১৩১২।

৩। 'বন্দেমাতরম্'—যোগীন্দ্রনাথ সরকার, ১৩১২।

৪। 'স্বদেশ-গাথা'—যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ১৩১৩।

৫। 'হুঙ্কার'—হীরালাল সেনগুপ্ত, ১৩১৫।

৬। 'বন্দনা'—নলিনীরঞ্জন সরকার, ১৩১৫।

এখানে তিনটি সংকলন-গ্রন্থ থেকে কিছু কিছু গানের নিদর্শন উদ্ধার করে দেওয়া হল—

'স্বদেশ-সংগীত' ঃ 'স্বদেশ সংগীতে'[১৯] কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের (১৮৬১-১৯০৭) গানের সংখ্যা সর্বাধিক। এতে তাঁর মোট ২৪টি গান, কিছু স্তোত্র-জাতীয় লেখা এবং একটি হিন্দী গান আছে। গানের মধ্যে দিয়ে দেশের যুবক সম্প্রদায়কে উত্তেজিত করে তোলার ব্যাপারে কালীপ্রসন্ন সেদিন কম কৃতিত্ব অর্জন করেন নি।[২০]

কালীপ্রসন্নের কয়েকটি গানের নিদর্শন—

আগমনী

দণ্ড দিতে চণ্ড মুণ্ডে এস চণ্ডি যুগান্তরে।
পাষণ্ড প্রচণ্ড বলে অঙ্গ খণ্ড খণ্ড করে॥
হুঙ্কারে আতঙ্কে মরি, শঙ্কা নাশ শুভঙ্করি।
এ ব্রহ্মাণ্ড লণ্ড-ভণ্ড—দৈত্যপদ-দণ্ড ভরে।
এ যুগে আবার মাগো দুর্গতি নাশিতে জাগো—
এসে নিজে রক্তবীজে নাশ সেই মূর্তি ধরে॥

(অংশ-বিশেষ)

১৯ বইটি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে উৎসর্গীকৃত। যোগেন্দ্রনাথ শর্মা কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের ছদ্মনাম। দ্রষ্টব্য—সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, ষষ্ঠ খণ্ড, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

২০ "He introduced a new element into the *Swadeshi* meetings which is now largely employed in our public demonstrations. They usually begin with some patriotic songs, appropriate to the occasion. Kavyavisarad had a fine musical talent. He himself could not sing, but he composed songs of exquisite beauty, which were sung at the *Swadeshi* meetings and never failed to produce a profound impression. He had a natural gift of musical composition and, though he

দুটি দুষ্প্রাপ্য গান—

(১)

জাগো জাগো বরিশাল।
তোমার সম্মুখে আজি পরীক্ষা বিশাল॥
প্রাণ দিয়া হুতাশনে
দেখাও জগৎজনে
বিশুদ্ধ কনক-কান্তি—সৌর করজাল॥

*　　*　　*

দেখিব তোমার শক্তি
দেশভক্তি অনুরক্তি
দেখিব গৌরব তব রবে কতকাল॥
বুঝিব দেশের তরে
কতটা রুধির ঝরে
মনুষ্যত্বে বরিশাল হবে কি কাঙাল ?
নিরখি আরক্ত নেত্র
প্রহরীর করে বেত্র
হারাবে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গে ইহ পরকাল ?
ভুলিও না কোন ভয়ে
থাকিও যাতনা স'য়ে
ঝুলুক্ বঙ্গের শিরে খর করবাল॥

*　　*　　*

had an imperfect knowledge of Hindi, his Hindi song (*Des ki e kaya halat*) was one of the most impressive of its kind. . . . Kavyavisarad was always attended by two musical experts, who opened and closed the proceedings of *Swadeshi* meetings with their songs. They were taught, paid and maintained by him; and, though by no means rich, he sought no extraneous assistance for their upkeep." *'A Nation in Making'*—Surendra Nath Banerjee, p. 202.

(২)

(বাউলের সুর—মুসলমানী বাংলা)

এখন মুসলমানের ইমান্ কোথা,
নাছারার বাহার
দেখি খোদাতালার রাহার পরে
দেল্ রাখে না কেহ আর ॥
ফোতো নবাব মস্ত ধিঙ্গি
খান্ বাহাদুর গাঁয়ের সিঙ্গী,
নামের লোভে কাম ছেড়ে সব—
দেনা করে দেয় বাহার ॥
আখেরের সব ভাব্না ভুলে,
জাতি ভাইকে ফেলছে তলে,
যারা বাদ্সা ছিল এলেম বিনে,
তারাই গোলাম আর গোভার!
কি লোভে সব ভায়ের গলায়
অন্ধ হয়ে ছুরি চালায়,
আখেরে খান্সামাগিরি
(এখন) বড় জোর ছব্রেজিষ্টার ॥
সদাই শুনি অন্নকষ্ট
গোলামগিরির সেলাম নষ্ট,
দু'বেলা দুই মুঠো ভাত (পেটভরে)
জুটছে দেশে ক'জনার ?
দু'দিন আগে কি ছিলে ভাই,
দেলের মাঝে ভাবো না তাই
খানা বিনা কেটেছে দিন
বাঙালায় কার বাপ্-দাদার ?
সে দিনের কি এই আখিরি—
কোথায় সে চাষ কারিগিরি,

কোথায় কদর কোথায় আদর—
এখন অন্ন জোটা ভার ॥
কোথা থেকে কারা এসে
লুটে নে যায় নিজের দেশে
বাহিরের চটকে লালছ—
আমাদের কই হাট-বাজার ?
করেছি হায় এয়ছা স্বভাব
নিজের দেশে যায় না অভাব
অযত্নে বিলালাম রত্ন—
বদ্‌লি মিল্‌লো ফক্কিকার ॥
সায়ের বলে জেগে দেখো—
নয়ন কেন মুদে রাখ
যে মাটিতে পয়দা হলে
সেই মাটি সার দুনিয়ার ॥ (সম্পূর্ণ)

ফুলার সাহেব পূর্ববঙ্গে মুসলমানদের অনেককেই দলে টেনেছিলেন এবং তারাও তখন মোহমুগ্ধ হয়ে জাতীয় স্বার্থের বিরোধিতা করেছিল। এটি সেই ঐতিহাসিক তথ্যের সংগীত-রূপ।

'স্তোত্র' থেকে একটি নিদর্শন—

জয় জগদীশ হরে, জয় জগদীশ হরে।
মীনরূপ ধরি হরি, অবনীতে অবতরি
প্রলয় পয়োধি জলে বেদ ব্রহ্ম উদ্ধারিলে,
বিষম বিদেশী স্রোতে কে আজি উদ্ধার করে ?
জয় জগদীশ হরে ॥

এছাড়া কালীপ্রসন্নের অনেক বিখ্যাত গান এই সংকলনটিতে আছে ; যথা—'ভাই সব দেখ চেয়ে', 'এস, দেশের অভাব ঘুচাও দেশে', '(আমার) স্বদেশবাসী, যতই দোষী বলুক পরে', 'সেই ত রয়েছ মা তুমি', 'নয়ন মুদিত মোহে', 'ছিন্ন অঙ্গ হ'ল বঙ্গ', ইত্যাদি।

এতে রাজকৃষ্ণ রায়ের (১৮৫২ ?-১৮৯৪) দুটি গান পাওয়া যাচ্ছে যে দুটি আন্দোলন-পর্বের অনেক আগে রচিত হলেও উল্লেখযোগ্য। নাটক, প্রবন্ধ

পৃ ২৫৯ ক

বন্দে মাতরম্

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সরকার-

সংকলিত।

সিটি বুক সোসাইটী

৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

১৩১২

মূল্য ।০ আনা।

ও কবিতা তিন জাতীয় লেখার নিদর্শনই এঁর আছে। কিন্তু দেশাত্মবোধের গানও যে তিনি কিছু লিখেছিলেন তার প্রমাণ স্বরূপ একটি গান এখানে উদ্ধৃত হল—

মন্ বসে না দেশের হিতে
বাগান ভোজে যাওরে ম'জে
গরিবগুলি পায় না খেতে।
গেজেটে নাম উঠবে বলে
টাকা ঢাল চাঁদার খাতে,
তেলা মাথায় তেল ঢেলে দাও
ক্ষুধিত বসে খালি পাতে।
হুজুর হুজুর ব'লে দাঁড়াও
হাজার সেলাম ঠুকে মাথে।
কাজের বেলায় কাণা হ'লে
দেশটা গেল অধঃপাতে॥

'বন্দেমাতরম্': যোগীন্দ্রনাথ সরকার-সংকলিত 'বন্দেমাতরম্'-এর ভূমিকা লিখে দেন সখারাম গণেশ দেউস্কর। এই সংকলনের গানগুলির পরিচয় দেওয়ার আগে সখারামের ভূমিকা থেকে কিছু উদ্ধৃত করছি—

এই পরাধীনতা ও পরতন্ত্রতার বিষময় ফলে দেশের লোকের আর পূর্বের ন্যায় সংকল্পে দৃঢ়তা নাই, সকলেই জড়পিণ্ডবৎ নিশ্চল ও নির্জীব অবস্থায় কালহরণ করিতেছে, দেশের জ্ঞানবান ব্যক্তিগণ দেশের ও সমাজের এই দুরবস্থা দর্শনে হৃদয়ে ব্যাকুলতা অনুভব করিতেছেন, নানা সংগীত ও কবিতার আকারে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাই বর্তমানকালে স্বদেশভক্তিমূলক সংগীতগুলির উৎপত্তির কারণ।···জাতীয়-সংগীত ভিন্ন জাতীয় চিত্তের অবসাদ দূরীভূত হয় না, জাতীয় ভাব যথোচিত বল-বেগ লাভ করে না। এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের আশায় বর্তমান সংগীত-গ্রন্থের প্রকাশক মহাশয় 'বন্দেমাতরম্' প্রচার করিতেছেন।

এই সংকলনে রবীন্দ্রনাথের ৩৩টি গান ও 'শিবাজী-উৎসব' কবিতাটি ছাড়া সরলাদেবী, প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন, বিজয়চন্দ্র

মজুমদার, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমোহন বসু, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকের রচনা আছে। রচনাগুলি সুপরিচিত, তাই উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। শুধু সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুটি রচনার সামান্য পরিচয় দেওয়া হল। সংগীত-গ্রন্থে স্থান পেলেও এ দুটি গান নয়—কবিতা।

সতীশচন্দ্রের 'আহ্বান-সংগীত' থেকে—

নগরে নগরে জাল্‌রে আগুন,
হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিজ্ঞা দারুণ ;
বিদেশী বাণিজ্যে কর্ পদাঘাত—
মায়ের দুর্দশা ঘুচারে, ভাই !
আপনি বিধাতা সেনাপতি আজ
ওই ডাকিছেন সাজ্‌রে সাজ্,
স্বদেশী-সংগ্রামে চাই আত্মদান
'বন্দেমাতরম্' গাও রে, ভাই।

করুণানিধান (১৮৭৭-১৯৫৫) পরবর্তীকালে যে ধরনের কবিতা লিখেছিলেন তাতে ভক্তিরস আর সাধারণ গৃহ-ধর্মী মানুষের মনের পরিচয়ই ফুটে উঠেছে। কিন্তু স্বদেশী যুগে এই মানুষটির হাত থেকেই বেরিয়েছিল—

লোহার নিগড় ছিঁড়ে
মত্ত মাতাল বাহিরিয়া পড়
লক্ষ লোকের ভিড়ে।
বর্শা শাণায়ে নিয়ে
অশ্বের খুরে আগুন ছুটাও
পাহাড়ের পাশ দিয়ে।
এস গো দুঃসাহসি,
ললাট হইতে উঠাও সবলে
দুর্ভাবনার মসী। ('আশীর্বাণী')

'বন্দনা' : নলিনীরঞ্জন সরকারের 'বন্দনা' এই সময়কার স্বদেশী গানের সংকলন-গ্রন্থগুলির মধ্যে সর্বাধিক মূল্যবান। এতে অনেক পরিচিত লেখকের

এমন অনেকগুলি গান আছে যেগুলির কথা বাঙালীর স্মৃতিপট থেকে আজ প্রায় মুছে গেছে, অথচ সে-সময়ে এই গানগুলিই ছিল শক্তি-মন্ত্র। 'স্বদেশ-সংগীতে' সংকলিত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের গানগুলি ছাড়া তাঁর অন্য কয়েকটি গানের সন্ধান এতে পাওয়া যায়। যেমন—

ঐ যে জগৎ জাগে—স্বদেশ অনুরাগে,
কে আর ব্যবচ্ছিন্ন বঙ্গ ভিন্ন, নিদ্রামগ্ন দিবাভাগে ?
ভাঙবে নাকি এ কাল-নিদ্রা, রইবে এ ভাব যুগে যুগে ?
পেয়ে পরের প্রসাদ, যায় কি বিষাদ,
এ অবসাদ কোন্ বিয়োগে ?

আর একটি—

শুন্‌রে ভাই দেশের দশা কি দুর্দশা
গেলরে দেশ রসাতলে।
হয়েছে দারুণ আকাল তাই কালাকাল
ফরিদ্‌পুর আর বরিশালে।

কালীপ্রসন্নের একটি বহু-পরিচিত গানও এখানে পাওয়া যাচ্ছে—

মা গো! যায় যেন জীবন চলে।
শুধু জগৎ মাঝে তোমার কাজে
'বন্দে মাতরম্' বলে!

কালীপ্রসন্ন হিন্দী গানও রচনা করেছিলেন। বাংলা সাহিত্য প্রসঙ্গে সেকথা নিষ্প্রয়োজন হলেও ঐতিহাসিক মূল্যের দিক থেকে সামান্য নিদর্শন উদ্ধৃত হল—

ভেইয়া দেশ্‌কা এ কেয়া হাল্।
খাক্ মিট্টি জৌহর হোতী সব, জৌহর হ্যায় জঞ্জাল্।
ঘর্ ছোড়্‌কে সব্ পর্‌কো সেবে, ভাইকো দেৎ ভাগাই।
সাগর পার সব্ ধন্ গয়া, আউর ঘরমে লছ্‌মী নাই।

*　　*　　*

দীন্ বিশারদ্ গণই বিপদ্, ভনো দুঃখকো গীত।
হো মতিমান্ দেশ্‌কে সন্তান্, করো স্বদেশহিত।

কামিনীকুমার ভট্টাচার্যের গান স্বদেশী যুগে বিশেষ করে পূর্ববঙ্গে খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এঁর গানগুলি সন্ত্রাসবাদের প্রচুর ইন্ধন জুগিয়েছে। এই গ্রন্থে এঁর তিনটি গান পাওয়া যাচ্ছে—'ওমা, ডাকিতে শিখিনে ব'লে', 'না করিলে পান মোদের শোণিত, হয় ওদের চিত্ত ক্ষুব্ধ', এবং 'জামালপুরে লাঞ্ছিত রমণীদের প্রতি'—গানটি। এই গানটির শেষ দুটি পংক্তি—

ঐ শোনো বাজে বিধাতার ভেরী, বাঁধ কটীতটে শাণিত ছুরী,
দানবদলনী সাজ গো জননী! বাঙালিনী বেশ ছাড় গো!

স্বদেশী যুগের আর একজন নাম-করা গীতিকার মুকুন্দ দাস (১২৮৫-১৩৪১)। জন্ম বিক্রমপুরে হলেও ইনি বরিশালের অধিবাসী ছিলেন। জাতীয় সংগঠন সফল করার অভিপ্রায় নিয়ে মুকুন্দ দাস 'আনন্দময়ী-আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করেন। ধর্মেও ইনি ছিলেন পুরো শাক্ত। এঁর পিতৃদত্ত নাম যজ্ঞেশ্বর দে বা 'যজ্ঞা'। পূর্ববঙ্গে যাত্রাভিনয়ে মুকুন্দদাসের খুব সুনাম ছিল। 'মাতৃপূজা' যাত্রাভিনয় লিখে ইনি আড়াই বছর হাজত বাস করেন। এখানে তাঁর একটি গানের অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত হল—

বাবু বুঝবে কি আর ম'লে?
কাঁধে তোর ভূত চেপেছে একদম দফা সারলে!

* * *

কুল নিয়েছে, মান নিয়েছে, ধন নিয়েছে কলে,
ডু ইউ নো ডিপুটি-বাবু, নাউ হেড্-ফিরিঙ্গীর বুটের তলে?

যতীন্দ্রমোহন বাগচীর (১৮৭৮-১৯৪৮) কবি-খ্যাতিও বাংলা সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। স্বদেশী যুগে লেখা এঁর একটি গানের নমুনা—

ওরে ক্ষ্যাপা, যদি প্রাণ দিতে চাস্,
এই বেলা তুই দিয়ে দেনা!
ওরে মানের তরে প্রাণটি দিবার
এমন সুযোগ আর হবে না।

রজনীকান্ত সেনের (১৮৬৫-১৯১০) একটি দুষ্প্রাপ্য অধুনালুপ্ত গান—

কেমন বিচার ক'চ্ছে গোরা !
হাঁটতে শিখিয়ে লাঠির গুঁতোয় ক'চ্ছে পা ভেঙে খোঁড়া !

*　　*　　*

দিল্লীর লাড্ডু খাইয়ে, সাম্‌নে ধরছে কচু পোড়া !
গরীব বানিয়ে দূর হ'তে ভাই, দেখায় টাকার তোড়া !
খাইয়ে দাইয়ে নাদুস্‌-নুদুস্‌ ক'রে বুকে মারে ছোরা ,
চক্ষু ফুটিয়ে আঁধারে বসায়, এমনি অভাগা মোরা !
কান্ত বলিছে ন্যায়-বিচারের পুরো অবতার ওরা ;
তোমরা মোটেই মান না, আমি তো বল্‌ছি রে আগাগোড়া !

সাহিত্যিক হিসাবে অশ্বিনীকুমার দত্তের কোন পরিচয় নেই—পরিচয় স্বদেশী যুগের সংগ্রামী হিসাবে। আর সংগ্রামের প্রেরণাতেই তিনি কয়েকটা গান লিখেছিলেন। একটি নিদর্শন—

শ্মশান ত ভালবাসিস্‌ মাগো ! তবে কেন ছেড়ে গেলি ?
এত বড় বিকট শ্মশান এ জগতে কোথায় পেলি ?
দেখ্‌ সে হেথা কি হয়েছে　　ত্রিশ কোটি শব পড়ে আছে,
কত ভূত-বেতাল নাচে, রঙ্গে ভঙ্গে করে কেলি !
ভূত-পিশাচ তাল-বেতাল নাচে আর বাজায় গাল
সঙ্গে ধায় ফেরুপাল, এটা ধরি ওটা ফেলি'।
আয় না হেথায় নাচ্‌বি শ্যামা ! শব হবে শিব পা ছুঁয়ে মা,
জগত জুড়ে বাজবে দামা, দেখবে জগত নয়ন মেলি ! (সম্পূর্ণ)

'করালী' ছদ্মনামে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের (১৮৬১-১৯১০) কথা আগে বলা হয়েছে ; এখানে তাঁর একটি গানের কিছুটা অংশ উদ্ধৃত হল—

আছিস্‌ কোন্‌ উল্লাসে ?
সদাই বিদেশী জোঁক রক্ত চোষে।

অস্থি চর্ম হ'ল রে সার,
রক্ত নাহি রক্ত-কোষে ;
এখন বাঁচতে চেলে ফেল্ সে জোঁক
বয়কট চূণা মুখে ঘ'সে।

ময়মনসিংহের সুহৃদ-সমিতির পক্ষ থেকে অনেক স্বদেশী গান রচিত ও প্রচারিত হত। গানগুলি স্থানীয় কথ্য ভাষায় রচিত এবং এগুলির দ্বারা বিশেষ করে অশিক্ষিত গ্রাম্য মুসলমানদের মধ্যে দেশভক্তি জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। সব গানের সুরই লোক-সংগীতের। একটি উদাহরণ—

গেলরে সোনার বাংলা রসাতলে পাপের ফেরে।
কি দিয়া কি কৈরা নিল দেখ্‌লি না রে হিসাব কৈরে।
দেশের জোলা তাঁতী কামার ফেইল্ পইড়া করে হাহাকার,
এ অত্যাচারে ;
এখন বিদেশ যদি না দেয় কাপড় বাকল্ পৈরে থাকবে রে পড়ে।
দেশের মঙ্গল চাহ যদি, ভাই হও রে ভাইয়ের সাথী সকল কাজে
দেশী জিনিষ ব্যবহার কর, তবে বাংলা যাবে রে তইরে॥ (সম্পূর্ণ)

এ ছাড়া সে সময়ের বিখ্যাত দুটি গান—'পেটের খিদায় জইলে গো মইলাম' ও 'কি বা হইল গো নানি' গান দুটিও এই সংকলনে আছে।[২১]

ক্ষুদিরাম, কানাইলাল প্রভৃতি শহিদদের অসাধারণ বীরত্ব, সাহসিকতা আর কর্তব্যনিষ্ঠার প্রশস্তিমূলক কয়েকটি গানও এই সময়ে রচিত হয় যেগুলির দুএকটি মাঝে মাঝে এখনো শোনা যায়।

২১ অনেকগুলি দুষ্প্রাপ্য স্বদেশী গান পরিশিষ্টে সংকলিত হয়েছে।

নাটক

স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবে বাংলা নাটকের ইতিহাসেও এক নতুন যুগ রচিত হয়েছে। এ যুগের প্রধান লক্ষণ বিষয়মুখিতার (objectivity) দিকে পদক্ষেপ। যদিও এ পদক্ষেপ দৃঢ়-নিশ্চয় নয়, তবু নাট্যকারের মানসতায় যে একটা পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, কল্পলোকের আবরণ ভেদ করে বস্তুলোকের দিকে এগিয়ে যাবার যে একটা প্রেরণা তিনি লাভ করেছেন তা স্পষ্টই বোঝা যায়।

স্বদেশী যুগের আগেও অনেক নাটকে স্বদেশ-চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষ করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটকের কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। কিন্তু জাতিগতভাবে সমস্ত দেশবাসীর অন্তরের পরাধীনতার বেদনা, আর সে বেদনাকে জয় করে জাতীয় স্বাধীনতা লাভের ঐকান্তিক কামনা বাংলা নাটকে প্রথম রূপ পেল স্বদেশী আন্দোলনের সময়। তার সার্থক রূপকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ। এই প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে আর যাঁদের নাম উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন—অমৃতলাল বসু, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, অমরেন্দ্র নাথ দত্ত এবং কুমুদনাথ চট্টোপাধ্যায়। স্বদেশী আন্দোলন সরাসরি নাটকের বিষয় হয়ে উঠেছে তিনজন নাট্যকারের তিনটি মাত্র নাটকে; বাকী নাটকগুলির উপাদান ঐতিহাসিক। বিশেষ করে গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল এবং ক্ষীরোদপ্রসাদ স্বদেশী আন্দোলনের প্রেরণায় নতুন দেশাত্মবোধক নাটক লিখতে গিয়ে অতীতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। সে অতীত তাঁদের নাটকে কথা বলেছে। হয়তো সবক্ষেত্রে সত্য কথা বলে নি, হয়তো কোথাও কোথাও নাট্যকারের কল্পনা বা রোমান্সপ্রিয় মনোভাব ইতিহাসের সত্য-রূপকে কিছুটা আচ্ছন্ন করে ফেলেছে; তবু এই নাটকগুলি সার্থক সৃষ্টি, আর সাময়িক প্রয়োজনবোধের বিচারে এক কথায় বলা যায় অমূল্য।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২): স্বদেশী আন্দোলনের আগেও গিরিশচন্দ্রের দু একটি নাটকে ঐতিহাসিক তথ্যানুসরণের কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়, কিন্তু প্রকৃত ঐতিহাসিক নাটক রচনার কোন চেষ্টা তিনি করেন নি; কারণ তাঁর মানসিক প্রবণতা তখন ছিল পুরাণ-চর্চার দিকে। নৈতিক আদর্শনিষ্ঠা আর

আধ্যাত্মিকতা তাঁর মনকে অধিকার করেছিল। দেশাত্মবোধের প্রভাবে এই অধিকার-মুক্তির প্রথম আভাস পাওয়া গেল 'সৎনাম' (১৩১১) নাটকে। কিন্তু এই নাটকটি রচনার ব্যাপারে নাট্যকার ইতিহাস থেকে খুবই অল্প সাহায্য গ্রহণ করেছেন। পরের বছর, অর্থাৎ ১৩১২ সালে, গিরিশচন্দ্র লিখলেন 'সিরাজদ্দৌলা'। স্বদেশ-চেতনার সঙ্গে প্রকৃত ইতিহাস-নিষ্ঠার সার্থক সমন্বয় এই নাটকটিতেই প্রথম লক্ষ্য করা গেল। বিদেশী ঐতিহাসিকদের অপচেষ্টায় বাংলার ইতিহাসের সত্য যখন মিথ্যার জালে বন্দী তখন কয়েকজন বাঙালী মনীষী সেই সত্যের উদ্ধারকার্যে ব্রতী হন ; এঁদের মধ্যে প্রধান হলেন অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, বিহারীলাল সরকার এবং নিখিলনাথ রায়। গিরিশচন্দ্র তাঁর ঐতিহাসিক নাটক রচনার ব্যাপারে এঁদের সকলের কাছেই ঋণ স্বীকার করেছেন। তা ছাড়া বিদেশী ঐতিহাসিকদের লেখার সঙ্গেও তাঁর যথেষ্ট পরিচয় ছিল। 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকটি লিখতে "এসিয়াটিক্ সোসাইটিতে সিরাজদ্দৌলা সংক্রান্ত যত প্রকার ইংরাজী পুস্তক আছে" সমস্তই তিনি দেখেছিলেন, এ কথা এই নাটকটির ভূমিকাতে তিনি উল্লেখ করেছেন। ঐতিহাসিক নাটক রচনার ক্ষেত্রে এমন ইতিহাস-সচেতনতার পরিচয় এই প্রথম। কিন্তু তখনকার নাট্যকারদের মধ্যে এই সচেতনতা স্বদেশী আন্দোলনেরই প্রত্যক্ষ ফল।

গিরিশচন্দ্রের তিনখানি ঐতিহাসিক নাটকের কথা এখানে উল্লেখ করছি— 'সিরাজদ্দৌলা' (১৩১২), 'মীরকাসিম' (১৩১৩) এবং 'ছত্রপতি শিবাজী' (১৩১৪)। "ইতিমধ্যে বাংলাদেশে স্বদেশী আন্দোলন ভালো করিয়া জমিয়া উঠিয়াছে। সৎনামে দেশপ্রেমের যে ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন ছিল এখন অনুকূল আবহাওয়ায় তাহা পরিস্ফুট হইল।"[১] গিরিশচন্দ্রের এই তিনখানি নাটকের মধ্যে সেই পরিস্ফুটন সার্থক হয়েছে। এই নাটকগুলির সঙ্গে তাঁর আগের নাটকগুলির গভীর ভাবগত পার্থক্যটি লক্ষ্য করে শ্রদ্ধেয় ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য যথার্থই মন্তব্য করেছেন, "ইহাদিগকে একই নাট্যকারের রচনা বলিয়া সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে।"[২] স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবেই বাংলা নাটকের ধারায় এই বিস্ময়কর পরিবর্তন সূচিত হল।

---

১ 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ডাঃ সুকুমার সেন, ২য় খণ্ড, পৃ-৩১৪।

২ 'বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস', ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃ-২৪৫।

২৪শে ভাদ্র, ১৩১২ মিনার্ভা থিয়েটারে 'সিরাজদ্দৌলা' প্রথম অভিনীত হয়। পরের বছর লোকমান্য তিলক, খাপর্দে প্রভৃতি নেতারা কলকাতায় এলে এই নাটকের অভিনয় দেখার জন্যে তাঁদের অনুরোধ জানান হয়। বাংলার রঙ্গমঞ্চ স্বদেশ-প্রীতি প্রচারের যে কঠিন দায়িত্ব সেদিন গ্রহণ করেছিল তা দেখে তাঁরা বিস্মিত হন।[৩]

নাটকটিতে সিরাজ আর করিমচাচার উক্তিতে মাঝে মাঝে স্বদেশী-আন্দোলন-জাত জাতীয় মনোভাবের পরিষ্কার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। ১ম অঙ্কের ১০ম গর্ভাঙ্কে সিরাজ বলছে,

> সিরাজ। যার হৃদয়ে ধারণা, যে স্বদেশী অপেক্ষা বিদেশী আপনার হয়, তার সে ধারণা যে সম্পূর্ণ ভ্রম, এই উমিচাঁদ আর কৃষ্ণদাসের প্রতি বিদেশীর ব্যবহার তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। চোখের উপর এই দৃষ্টান্ত দর্শন ক'রে যার ভ্রম দূর না হবে, যে হিন্দু বা মুসলমান স্বার্থচালিত হ'য়ে স্বদেশের প্রতি ঈর্ষায় বিদেশীর আশ্রয় গ্রহণ করবে, সে কুলাঙ্গার! মাতৃভূমির কলঙ্ক! তার জীবন ঘৃণিত! এই দৃষ্টান্তে যদি বঙ্গবাসীর মনে প্রতীতি জন্মায়, যে শত দোষে দোষী হ'লেও স্বদেশী আপনার, বিদেশী চিরদিনই পর, তাহ'লে আমাদের যুদ্ধশ্রম ও রণব্যয় সফল।

এই ধরনের অংশগুলি থেকে সহজেই অনুমান করা যায়, গিরিশচন্দ্র স্বদেশী আন্দোলনের দ্বারা কি পরিমাণ প্রভাবিত হয়েছিলেন।

'মীরকাসিম' নাটকেও গিরিশচন্দ্র ঐতিহাসিক সত্যকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। Col. Malleson প্রণীত *The Decisive Battles of India* গ্রন্থ থেকে তিনি এই নাটকের ভূমিকায় অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে তাঁর নাটকের ঘটনাবলী অতিরঞ্জিত নয়, বরং "নানা প্রতিবন্ধক বশতঃ স্বরূপচিত্র প্রদর্শনের ত্রুটি হইয়াছে।" মীরকাসিমের চরিত্রের বলিষ্ঠতা সিরাজের চেয়ে অনেক বেশি; স্বদেশী যুগের জাতীয়তাবোধকে ফুটিয়ে তোলার কাজে নাট্যকারও এই বলিষ্ঠতার সুযোগ নিয়েছেন। মীরকাসিমের একটি উক্তি উদ্ধৃত করলেই এর প্রমাণ পাওয়া যাবে। ২য় অঙ্কের ১ম গর্ভাঙ্কে মীরকাসিম বলছে,

৩ দ্রষ্টব্য—'ভারতের জাতীয় কংগ্রেস', হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ২য় খণ্ড, পৃ-৬৪।

কাসিম। ···না, আমি বিলাসী নই, আমি স্বর্ণপ্রসূ বঙ্গভূমির নিমিত্ত কাতর। পারি, বাংলার উদ্ধার সাধন করবো, মুমূর্ষু মোগল-গৌরব পুনর্জীবিত করবো, বিদেশী দাম্ভিক মাতৃশোণিতশোষক ইংরাজকে বিতাড়িত করবো। এই নিমিত্ত নবাবী গ্রহণ ক'রে চিন্তা-হ্রদে ঝম্প প্রদান করেছি।

উদাসিনী তারার চরিত্রে তৎকালীন চরমপন্থী নেতাদের মনোভাব বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ইংরেজের কাছে পরাজিত আশাহত মীরকাসিমকে সে অভয় দিয়ে বলছে,

মীরকাসিম, তুমি স্বদেশবৎসল! বঙ্গমাতা অতি কঠিনা জননী! তাঁর শোণিত-পিপাসা প্রবল, সামান্য শোণিতে তাঁর তৃপ্তি নাই! স্বদেশভক্ত, স্বদেশবৎসল, স্বদেশীপ্রিয়, স্বার্থশূন্য-হৃদয়ের শোণিত-পানে পিপাসা!—সে পিপাসা তৃপ্ত না হ'লে, বঙ্গভূমি প্রসন্না হবেন না। যুদ্ধে অগ্রসর হও, বক্ষের শোণিত দান করো,—তোমার ন্যায় স্বদেশবৎসল সকলে একত্রে মিলে শোণিত দান কর। (৪র্থ অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক)

তারার চরিত্রের সাময়িক সার্থকতা থাকলেও এর অবাস্তবতাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। এই চরিত্রটির জন্যেই নাটকটির ঐতিহাসিক মূল্য কিছুটা কমে গেছে।

সত্যচরণ শাস্ত্রীর 'ছত্রপতি শিবাজী' গ্রন্থটি থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে গিরিশচন্দ্র এই নামেই একটি নাটক রচনা করেন। জাতীয় জাগরণের ক্ষেত্রে এই ঐতিহাসিক চরিত্রটির কাছ থেকে দেশবাসী কম প্রেরণা লাভ করে নি। যে উদ্দেশ্যে 'শিবাজী উৎসব' প্রচলিত হয় সেই উদ্দেশ্যেই রচিত হয় 'ছত্রপতি শিবাজী'।

অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯): দেশের সমসাময়িক অবস্থা, ঘটনা বা রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে লেখা অমৃতলাল বসুর অনেকগুলি রচনা আছে। এখানে তাঁর দুটি গ্রন্থের উল্লেখ করছি—'নবজীবন' (১৩০৮) এবং 'সাবাস বাঙালী' (১৩১২)।

প্রথমটি সম্বন্ধে লেখক বলেছেন এটি হল "মাতৃপূজা ও রাজভক্তির উচ্ছ্বাসপূর্ণ একাঙ্ক নাট্যলীলা।" কিন্তু গঠন বা আঙ্গিকের বিচারে এটি মোটেই নাটক হয়ে ওঠে নি; কাহিনীগত ঐকসূত্র তো সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। প্রথমদিকে দুটি চরিত্রের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে কংগ্রেসের কাজের বিচার করা হয়েছে। তারপর দ্বিতীয়

দৃশ্যে সমাজের নানা স্তরের মানুষের সঙ্গে লক্ষ্মীর সাক্ষাৎকার ; কেরানী, কুলবধূ, উকীল, ডাক্তার, সভাপতি সকলেই এই দৃশ্যে জমা হয়ে এক এক করে নিজেদের নীচতা ও স্বার্থপরতার পরিচয় ফুটিয়ে তুলেছে। তৃতীয় দৃশ্য একেবারে হিমালয় পর্বতে। সিংহাসনে বসে আছেন ভারতমাতা আর সম্মুখে ভারত-সন্তানগণ নিদ্রিত। সারা দেশে একজনও প্রকৃত স্বদেশ-প্রেমিকের সন্ধান না পেয়ে লক্ষ্মী কান্নায় বুক ভাসিয়ে হিমালয়ে ভারত-মাতার কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁর কান্নায় বিচলিত হয়ে ভারত-মাতা নিদ্রিত সন্তানদের জাগাতে চেষ্টা করলেন। দুএকজনের নিদ্রাভঙ্গ হল। পঞ্চম ভারত-সন্তান জেগে উঠে বললে—

৫ম ভা-স। কি মা তুমি কাঁদবে না?—অবশ্য কাঁদবে—অশ্রুজলে জলস্থল টলমল ক'রে দেবে! এই বিপুল বিশ্ব রোদনানলে ভস্ম করে ফেলবে! আমরা তোমার ধীর বীর স্থির অশ্রুনীরে-অধীর সন্তান থাকতে তোমার কান্নার ভাবনা? কে পারে? জীবন থাকতে হৃদয় থাকতে প্রাণ থাকতে আত্মা থাকতে জননী-স্বরূপিনী জন্মভূমির যাতনা কে সহ্য করতে পারে? I promise and announce it to this wide-world, that when I get a little leisure after my day's work, evening's entertainments, night's sleep, and wife's admonition—that sweet sacred and certain curtain lecture, I will spend the last drop of my blood left by the musical mosquito for my Mother Country; but permit me now for a while to be wrapped in the embrace of Mother Morpheus.

এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই ষষ্ঠ ভারত-সন্তান উঠে বক্তৃতা জুড়ে দিলে—

৬ষ্ঠ ভা-স। ধিক্ ধিক্! বল্‌তে বল্‌তে ঘুমিয়ে পড়লি—সোডা-ওয়াটার-কুলাধম! জাগো—জাগো ভ্রাতৃগণ। 'ভীষ্ম-দ্রোণ-ভীমার্জুন নাহি কি স্মরণ?' 'একতান মন-প্রাণ'—গ্যারিবল্ডি—ওয়ালেস্—ব্রুস্—অসভ্য জাপান—ভাল কথা, সেজ বৌ কোথা গেলে? একটা পান দাও না; সং এলে আমায় ডেকো, আমি এখন একটু শুই।" (পৃ—২৯-৩০)

এইভাবে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মধ্যে দিয়ে দেশবাসীর চারিত্রিক অধঃপতনের রূপটিকে লেখক ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। শেষের দিকে দুএকজন সুসন্তান আবির্ভূত

হয়ে ভারত-মাতাকে অভয় দিয়েছে ; সেখানে 'সাধু-হৃদয় লর্ড কার্জনের'-ও প্রশস্তি আছে। বলা বাহুল্য রচনাটির মধ্যে প্রহসনের লক্ষণই বেশি এবং স্বদেশী আন্দোলনের কয়েক বছর পূর্বের রচনা বলে স্বদেশীযুগের ভাবাদর্শের সামান্য রেখাপাত-মাত্র এতে লক্ষ্য করা যায়।

স্বদেশী আন্দোলনের ভিত্তিতে রচিত অমৃতলালের নাটক 'সাবাস বাঙালী' (১৩১২)। এটি সম্পূর্ণ স্বদেশী-গ্রহণ ও বিদেশী-বর্জনের ব্যাপার নিয়ে লেখা। দেশের সমসাময়িক রাজনৈতিক অবস্থার চিত্রটি এতে সুন্দর ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। আন্দোলনের প্রতিক্রিয়াও দুএকটি চরিত্রের মধ্যে সহজ ভাবেই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সামান্য পরিচয় গ্রহণ করা যাক। দর্জির দোকানের ম্যানেজার জেঙ্কিন্স্ সাহেব ফিরিঙ্গী। স্বদেশী আন্দোলনের স্রোতের মধ্যে পড়ে সে ভাবে—

> জেঙ্কি। (স্বগত)···হোয়াট্ অ্যাম্ আই টু ডু? হামার মার মাটি ছিল ডেশী,—সাদী কর্‌লো নেমক্ মহলের সাহেব জেঙ্কিন্স্ কো, বাস্ হাম্ একেবারে ব্রিটিস্ বরণ ফিরিঙ্গী হোলো। আবি হামার মামার ব্লড্ বোলে টোমার হিন্দুষ্টানকা ভালাই করো, নেটীভ্ লোক কো ভাই বোলো। ফিন্ ড্যাডের ব্লড্ বি চুপ থাকে না ; ও বোলে নেটীভ্‌কো হেট্ করো, বুট মারো। ···সব ভাল আছে ; তব্‌ভী কেমোনটি হোচ্চে! হামি বাঙালীকে বেইজ্জত করতে পারি না। বাঙলা হামার ঘর, বাঙালা মে হামার পয়দা! (পৃ—২১)

যে ফিরিঙ্গী নিজেকে সাধারণত প্রভুর জাত বলেই মনে করত অমৃতলাল তার মধ্যেও অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে তাকে 'স্বদেশী' করে তুলেছেন। বিষয়বস্তুর গুরুত্বের জন্যে লেখকের স্বভাবসিদ্ধ বিদ্রূপ-প্রবণতা এতে ফুটে উঠতে পারে নি ; শুধু কয়েকটি গানে কিছু হাস্যরসের খোরাক আছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) : দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্য-প্রতিভাকে স্বদেশী আন্দোলন কতখানি প্রভাবিত করেছিল তার প্রথম সার্থক পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর 'প্রতাপসিংহ' নাটকে (১৩১২)। টডের 'রাজস্থানের কাহিনী' অবলম্বন করে দ্বিজেন্দ্রলাল এটি রচনা করেন। দেশপ্রেমের উদ্দীপনা এই নাটকে বেশ সংযমের সঙ্গেই প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতাপসিংহের ভাই শক্তসিংহের একটি উক্তি থেকে এই সংযত প্রকাশভঙ্গির সামান্য পরিচয় গ্রহণ করা যাক—

শক্ত। বীরের আদর্শ, স্বদেশের রক্ষক, রাজপুতকুলের গৌরব, প্রতাপকে ঘাতকের হস্তে মরতে দিতে পারি না। তুমি কতবড় এতদিন তা বুঝি নি। একদিন ভেবেছিলাম তোমার চেয়ে আমি শ্রেষ্ঠ। তাই পরীক্ষা করবার জন্যে সেদিন দ্বন্দ্বযুদ্ধ করি, মনে আছে? কিন্তু আজ এই যুদ্ধে বুঝেছি যে তুমি মহৎ, আমি ক্ষুদ্র; তুমি বীর আর আমি কাপুরুষ। নীচ প্রতিশোধ নিতে গিয়ে জন্মভূমির সর্বনাশ করেছি।

টডের গ্রন্থটিকেই অবলম্বন করে রচিত দ্বিজেন্দ্রলালের পরবর্তী নাটক 'দুর্গাদাস' (১৩১৩)। রাজসিংহ এবং দুর্গাদাস ঔরংজীবকে রাজস্থান থেকে বিতাড়িত করেন; আর দুর্গাদাস নাকি ঔরংজীবের সঙ্গে প্রত্যেক যুদ্ধেই জয়ী হন। এই ঐতিহাসিক তথ্যের সত্যতা নিরূপণ করার অবকাশ এখানে নেই; তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে দুর্জয় শক্তি ও সাহসের ওপর ভর করে দেশের প্রবল শত্রুকে পরাস্ত করার যে আনন্দ-মহিমা 'দুর্গাদাস' তারই প্রশস্তি। নাটকটি রচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রলাল এটির ভূমিকায় স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন—

আজ পর্যন্ত হিন্দু-পাঠক নাটক-নভেলে ('রাজসিংহ' ভিন্ন) কেবল বিজাতীয়ের কাছে স্বজাতীয়ের পরাজয়-বার্তাই পড়িয়া আসিয়াছেন। এতদিন এই একঘেয়ে পরাজয়ের পর, এই দুর্গাদাসের বিজয়-দুন্দুভি তাঁহাদের কর্ণে সংগীত বর্ষণ করিবে না কি?

এই মূল উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রাখতে গিয়ে নাট্যকার গ্রন্থটির মধ্যে কোন কাহিনীগত ঐক্য গড়ে তুলতে পারেন নি; এ ছাড়া নাটক হিসাবে এটির আরও কয়েকটি ত্রুটিও আবিষ্কার করা শক্ত নয়। কিন্তু আদর্শ স্বদেশ-প্রেমের রূপায়ণে 'প্রতাপসিংহ'-এর চেয়েও 'দুর্গাদাস'-এর সার্থকতা বেশি বলে মনে হয়।

দ্বিজেন্দ্রলালের এই জাতীয় তৃতীয় নাটক 'মেবার পতন' (১৩১৫)। আগের দুটি নাটকের সঙ্গে এটির ভাবাদর্শের একটা পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। দেশপ্রেমের কথা এতে থাকলেও তাকে নাট্যকার তেমন প্রাধান্য দেন নি যতটা দিয়েছিলেন আগের নাটক দুটিতে। প্রেম এখানে দেশ, সম্প্রদায় আর জাতীয় সংকীর্ণতাকে ছাড়িয়ে গিয়ে সর্বমানবিক মিলনবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দেশের পরাধীনতা নাট্যকারের কাছে এখানে ততটা বেদনা-দায়ক নয় যতটা জাতীয় মনুষ্যত্বহীনতা, আত্মদ্রোহিতা। তাই নাটকটির মূল সুরই হল—"গিয়েছে দেশ দুঃখ নাই—আবার তোরা মানুষ হ'।"

স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের কি ধরনের সম্বন্ধ ছিল এখানে সে সম্বন্ধে দু একটি কথা বলে নেওয়ার প্রয়োজন আছে। বঙ্গভঙ্গকে উপলক্ষ্য করে বাঙ্গালীর স্বাদেশিকতা যে আন্দোলনের রূপ নিল তার আদর্শগত দিকটার সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের তেমন কোন বিরোধ ছিল না; তবে বাঙালী সেদিন চরম বিস্ময় আর বিরক্তির সঙ্গে লক্ষ্য করেছিল তাঁর বঙ্গভঙ্গের প্রতি আন্তরিক সমর্থনকে। একদিকে সমগ্র দেশ, আর একদিকে দ্বিজেন্দ্রলাল। তিনি মনে করতেন, বঙ্গবিভাগের ফলে আসামী আর বিহারীদের সঙ্গে বাঙালীর শিক্ষা-সংস্কৃতিগত যে মিলন সাধিত হবে তাতে বাংলার মঙ্গল, বাঙালীর শক্তিবৃদ্ধি।[8] বঙ্গভঙ্গ সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রলালের এই মতবাদকে স্মরণ রেখেই তাঁর এই সময়কার রচনাবলীর বিচার করা সমীচীন।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৩-১৯২৭): বাংলা নাটকের ইতিহাসে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের একটি বিশেষ স্থান আছে। যে কজন দক্ষ শিল্পীর হাতে বাংলা নাটকের উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে ক্ষীরোদপ্রসাদ নিঃসন্দেহেই তাঁদের মধ্যে অন্যতম। অন্যান্য নাট্যকারদের মতো স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবকে তিনিও স্বীকার করেছিলেন। তাঁর এই স্বীকৃতির প্রথম পরিচয় মেলে 'প্রতাপ-আদিত্য' নাটকে (১৩১৩)। ঐতিহাসিক চরিত্রকে নাটকে রূপায়িত করে দেশবাসীর অন্তরে শক্তি ও সাহস সঞ্চার করার প্রচেষ্টা সেদিন অনেক নাট্যকারের মধ্যেই দেখা গিয়েছিল। ইতিহাসের বিচারে আজকের দিনে এই নাটকটির মধ্যে হয়তো সামান্য ভুলভ্রান্তির সন্ধান মিলতে পারে, কিন্তু স্বদেশীযুগে নাটকটির প্রয়োজন ও প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না। ভূমিকায় মন্মথমোহন বসু লিখেছিলেন—

> 'প্রতাপ-আদিত্য' নাটকখানি এক হিসাবে আমাদের জাতীয় জীবনের ইতিহাস। বাঙালীর শক্তি জগতে দুর্লভ, আবার বাঙালীর দৌর্বল্যও চিরপ্রসিদ্ধ। বাঙালী না পারে এমন কোন কর্মই নাই, অথচ বাঙালীর প্রবর্তিত কোন মহাকার্যেরই শেষরক্ষা হয় না।···বাঙালী চেষ্টা করিলে কি করিতে পারে, আবার যে দোষে তাহার বহুকালের চেষ্টার ফল ব্যর্থ হইয়া যায়, তাহা নাটককার যথাসম্ভব চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন।

[8] দ্রষ্টব্য—দ্বিজেন্দ্রলাল, দেবকুমার রায়চৌধুরী, পৃ—৩৯৩-৯৬।

স্বদেশী আন্দোলনের প্রাবল্যের মধ্যে লেখা ক্ষীরোদপ্রসাদের বিশেষ উল্লেখযোগ্য নাটক 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' (১৩১৩)। নাটকটির মধ্যে ঐতিহাসিক তথ্যগত দিকটির সঙ্গে নাট্যরূপের চমৎকার সমন্বয় হয়েছে। মুখবন্ধে নাট্যকার উল্লেখ করেছেন, তিনটি গ্রন্থ থেকে তিনি এই নাটক রচনায় প্রচুর সাহায্য পেয়েছেন—বিহারীলাল সরকারের 'ইংরাজের জয়', নিখিলনাথ রায়ের 'মুরশিদাবাদ কাহিনী' ও অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র 'মীরকাশিম'।

নাটকের প্রথমেই দেখা যায় ইংরেজের অত্যাচার আর শঠতায় মীরজাফরের চৈতন্যোদয় ঘটেছে ; এবং পূর্বকৃত পাপের অনুশোচনা তার মর্মকে বিদ্ধ করেছে। সেনাপতি তকী খাঁকে তাই সে স্পষ্টই বলেছে—

> মীর।…কিন্তু সর্বস্ব দিয়েও যে আজ পর্যন্ত বজ্জাতদের দেনা শুধতে পারলুম না। তারা আমায় বলে চোর। আমি সমস্ত টাকা অন্দরে পুরে রেখে তাদের ফাঁকি দিচ্ছি। বুঝতে পারছ আমার অবস্থা ? তোমার সামনে সমসের কি বললে শুনলে না। আমি ক্লাইভের গাধা। ও যদি সত্যি না বলতো, তখনি আমি ওর শির নিতুম। (পৃ ৫)

১ম অঙ্কের ২য় দৃশ্যে মোহনলালের উক্তিতেও স্বদেশের জন্যে বীরের অন্তরের বেদনাবোধ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। কন্যা মতিবিবিকে মোহনলাল বলছে—

> মোহন। যেভাবে ফৌজ নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলুম, আর আধঘণ্টা যদি এইভাবে এগিয়ে যেতে পারতুম, তাহলে বুঝি পলাশীর যুদ্ধ আর একরকম ইতিহাসে চিত্রিত হ'ত। মীরজাফরের আদেশ আর কিছুক্ষণ কানে না তুললে ইংরেজকে জাহাজে ক'রে দেশে ফিরে যেতে হ'ত। মুরশিদাবাদের মসনদে ক্লাইভের গাধাকে আর বসতে হ'ত না। বড়ই ভুল ক'রে ফেললুম মা, বড়ই ভুল ক'রে ফেললুম।…প্রাণের বন্ধু মীরমদন যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়ে তার সুমুখের শত্রু পল্টন ছারখার ক'রে প্রাণ দিলে, আমি তার মৃত্যুরও প্রতিশোধ নিলুম না ! (পৃ ১৬-১৭)

স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে বাঙালী নতুন করে ইংরেজ-চরিত্রের পরিচয় পেয়েছিল। ভারত শাসনের মূলে ইংরেজের যে স্বার্থপরতা—বাঙালী আগে যা বুঝেও বোঝে নি, স্বদেশী আন্দোলন সে সত্য তার অন্তরে গেঁথে দিলে। তাই নাটকের শেষের দিকে কাউন্সিল সদস্য হল্‌ওয়েলের সদম্ভ স্বীকারোক্তি শোনা গেল,—

Our only concern, in this damp-dreary-jungly hell, is money···রূপিয়াকা ওয়াস্তে আয়া, রূপিয়া লেকে চলা যাগা।

(পৃ ১০৫)

স্বদেশী আন্দোলন-প্রসূত নতুন জাতীয়তাবোধের ভিত্তিতে যে কটি সার্থক নাটক রচিত হয়েছিল 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' সেগুলির মধ্যে অন্যতম। এ ছাড়া রাজা নন্দকুমারের চরিত্র অবলম্বনে রচিত ক্ষীরোদপ্রসাদের আর একটি দেশাত্মবোধক নাটক 'নন্দকুমার'-এর (১৩১৪) নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে।

বঙ্গভঙ্গের ঘটনা নিয়ে এই সময় আরো দুটি নাটক রচিত হয়—অমরেন্দ্রনাথ দত্তের 'বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ বা Partition of Bengal' (১৩১২) এবং কুমুদনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ যজ্ঞ' (১৩১৭)। নট ও নাট্যকার হিসাবে অমরেন্দ্রনাথের একটা নিজস্ব পরিচয় থাকলেও 'বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ'-এ রচনাগত অনেক ত্রুটি আছে। তা ছাড়া স্বদেশী যুগের বলিষ্ঠ স্বাদেশিকতার পরিচয় নাটকটির মধ্যে কোথাও নেই ; বরং ইংরেজের কাছে প্রার্থনার সুরটিই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

প্রবন্ধ

স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের ধারাটি তেমন বিস্তৃতি লাভ করে নি। কারণ কোন আন্দোলনের সময় দেশের মধ্যে আবেগ আর উত্তেজনার যে দমকা বাতাস বইতে থাকে তার মধ্যে চিন্তানিষ্ঠ সাহিত্যসৃষ্টির অবকাশ থাকে অল্পই। আন্দোলন-পর্বে বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যে যাঁর দানের কথা আমাদের প্রথমেই মনে পড়ে তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আর সে দান অকৃপণ, মুক্ত-লেখনী। এই সময়ে যে কারণে বেশি প্রবন্ধ রচিত হয় নি, দেখা যায় তাকে তিনি উপেক্ষা করেছেন। দেশের সাময়িক উত্তেজিত অবস্থার মধ্যে থেকেও তিনি স্থিতধী; তাই এই আন্দোলনের সময় তিনিই একমাত্র প্রবন্ধকার যাঁর দ্বারা যুক্তিশীল ও চিন্তানিষ্ঠ সর্বাধিক প্রবন্ধরচনা সম্ভব হয়েছে। অন্যান্য প্রবন্ধকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সখারাম গণেশ দেউস্কর, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, ও নিখিলনাথ রায়। এঁদের প্রবন্ধ-গ্রন্থগুলির কয়েকটি দেশাত্মবোধক প্রবন্ধের রচনাকাল ১৩০৮ সালের পূর্বে হলেও, গ্রন্থগুলি স্বদেশী আন্দোলন-পর্বেই প্রকাশিত বলে আমাদের আলোচনার অন্তর্গত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১): ১৩১২ সাল থেকে ১৩১৫ সালের মধ্যে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের সাতখানি প্রবন্ধ-গ্রন্থে তাঁর এই সময়ে লেখা বহু রাজনৈতিক ও দেশাত্মবোধক রচনা সংকলিত হয়। এই গ্রন্থগুলি হল 'আত্মশক্তি' (১৩১২), 'ভারতবর্ষ' (১৩১২), 'স্বদেশ' (১৩১৫), 'সমাজ' (১৩১৫) 'শিক্ষা' (১৩১৫) 'রাজা প্রজা' (১৩১৫) এবং 'সমূহ' (১৩১৫)।[১]

'আত্মশক্তি'-গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি ১৩০৮ থেকে ১৩১২ সালের মধ্যে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের কতকগুলি প্রবন্ধ কিছুকাল পরে সংক্ষিপ্তরূপে 'সমূহ', 'শিক্ষা' ও 'স্বদেশ' গ্রন্থের অন্তর্গত করা হয়।

১ 'বিচিত্র প্রবন্ধ' (১৩১৪) গ্রন্থে মুদ্রিত 'মা ভৈঃ' প্রবন্ধটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

'আত্মশক্তি'-র অল্পকাল পরেই 'ভারতবর্ষ' প্রকাশিত হয়। এই বইটিরও অনেক প্রবন্ধ পরে রবীন্দ্রনাথের গদ্যগ্রন্থাবলীর বিভিন্ন গ্রন্থে মুদ্রিত হয়। নতুন করে সংকলনের সময় প্রবন্ধগুলির কিছু কিছু পরিবর্তনও সাধিত হয়েছিল। 'ভারতবর্ষ' গ্রন্থের সমস্ত প্রবন্ধই বঙ্গদর্শনে পূর্বপ্রকাশিত।

আগেই বলা হয়েছে 'আত্মশক্তি'-র অনেকগুলি প্রবন্ধ 'স্বদেশ' গ্রন্থে সংকলিত হয়। 'সমাজভেদ' এবং 'ধর্মবোধের দৃষ্টান্ত'-ও বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়।

আচার-আচরণগত এবং ব্যবহারিক সমস্যা-মূলক কয়েকটি রচনার একটি সংকলন 'সমাজ' নামে প্রকাশিত হয়। কিন্তু ১৩১৫ সালের মধ্যে লেখা এই বিষয়ে তাঁর সমস্ত রচনা এতে স্থান পায় নি। সেগুলি পরবর্তীকালে রবীন্দ্র-রচনাবলীর দ্বাদশ খণ্ডে 'সমাজ' গ্রন্থের পরিশিষ্টে সংকলিত হয়েছে। 'সমাজ' গ্রন্থের অন্তর্গত উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগুলি ভারতী, ভাণ্ডার, বঙ্গদর্শন ও প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাবিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধের একটি সংকলন, 'শিক্ষা' নামে প্রকাশিত হয়। কিন্তু এতেও তাঁর শিক্ষাবিষয়ক সমস্ত প্রবন্ধ স্থান পায় নি; সেগুলিও পরবর্তীকালে রবীন্দ্র-রচনাবলীর দ্বাদশ-খণ্ডে 'শিক্ষা'-র পরিশিষ্টের অন্তর্গত করা হয়েছে। আমাদের আলোচ্য সময়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধগুলি বঙ্গদর্শন ও ভাণ্ডারে প্রকাশিত হয়।

এই সময়ে লেখা রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রবন্ধ সংকলিত হয় 'রাজা প্রজা' ও 'সমূহ' গ্রন্থে। অবশ্য এগুলির দুএকটি 'আত্মশক্তি' এবং 'ভারতবর্ষ' গ্রন্থে পূর্বপ্রকাশিত। যে কারণেই হোক রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি সমসাময়িক প্রবন্ধ এই সংকলন-গ্রন্থদুটিতে সন্নিবেশিত হয় নি; সেগুলি রবীন্দ্র-রচনাবলীর ১০ম খণ্ডের পরিশিষ্টে মুদ্রিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের এই গ্রন্থগুলির প্রায় সমস্ত রচনাই পত্রপত্রিকা-প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে, তাই এখানে পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৮-১৯২৫): বিচিত্র প্রতিভার বহুমুখী স্ফূর্তিতে জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের তিনজনের ব্যক্তিত্ব বাংলার তথা ভারতের বিস্ময়। দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ এই প্রতিভার ত্রিমূর্তি, যদিও রবীন্দ্র-প্রতিভার স্বরূপই সবচেয়ে ভাস্বর।

নাট্যকার হিসাবেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পরিচয়কে আমরা বড় করে দেখি। স্বদেশী যুগের বহুকাল আগে থেকেই নাটকের মধ্যে দিয়ে দেশবাসীর অন্তরে স্বদেশ-প্রেম জাগিয়ে তুলতে তিনি চেষ্টা করেছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর 'পুরু বিক্রম' (১৮৭৪), 'সরোজিনী' (১৮৭৫) এবং 'অশ্রুমতী'-র (১৮৭৯) কথা স্মরণ করা যেতে পারে। কিন্তু নাট্যকারের আড়ালে তাঁর প্রবন্ধকারের যে পরিচয়টি লুকিয়ে রয়েছে সেটিও তুচ্ছ নয়। অনুবাদ ছাড়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মৌলিক প্রবন্ধও কিছু কিছু আছে যেগুলিতে তাঁর রচনা ও চিন্তাশক্তির স্বকীয়তা সুস্পষ্ট। 'প্রবন্ধ-মঞ্জরী' (১৩১২) গ্রন্থে তাঁর ৬২টি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। এগুলির কয়েকটি স্বাদেশিকতামূলক।

যে সময়ে রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ, সমাজ-সংস্কার প্রভৃতি নানা বিষয়ে বাঙালীর কর্মচাঞ্চল্য প্রকাশ পাচ্ছিল সে সময়ে মূল বস্তুটির দিকে তার বিশেষ খেয়াল ছিল না; সেটি তার শরীর। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেই দিকে বাঙালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন,

> শারীরিক দুর্বলতা ও ভীরুতাই বাঙালী জাতির কলঙ্ক।…অতএব এই অভাবটি যতদিন না মোচন হইবে ততদিন বাঙালীজাতির কোন আশা নাই। এই অভাবমোচন না হইলে সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া বিজ্ঞান-চর্চাই হউক, বাণিজ্য-শিল্পের অনুশীলনই হউক, বা রাজনৈতিক উৎসাহ-উদ্যমের পরিচয় দিয়া সভায় বক্তৃতারই ধুমধাম হউক, বাঙালীর প্রকৃত অভাব কিছুতেই ঘুচিবে না, তাহারা কখনই প্রবল জাতিদিগের মধ্যে গণ্য হইবে না, তাহারা কখনই রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের উপযুক্ত হইবে না।
>
> ('ভারতবর্ষীয়দিগের রাজনৈতিক স্বাধীনতা'—পৃ ৬৬)

এই দিকে লক্ষ্য দিয়েই সরলা দেবী দেশের কী উপকার সাধন করেছিলেন সে-কথা বাঙালী কখনো বিস্মৃত হবে না।

'জাতীয়তা ও বিজাতীয়তার উপদ্রব' প্রবন্ধে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রেম এবং হিতৈষণার মধ্যে একটা পার্থক্য করেছেন। তিনি লিখেছেন শিশুর প্রতি মাতার প্রেম অন্ধ; সে প্রেম আপন শিশুর স্বভাবের মধ্যে কোন মন্দ ভাবকেই দেখতে পায় না; কিন্তু শিশুর প্রতি পিতার হিতৈষণা দূরদর্শিতা-মূলক। সেখানে বিচার আছে, ভর্ৎসনা আছে, প্রেম আছে, উন্নতির দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ আছে। দেশের প্রতি আমাদের প্রেম যদি মাতৃ-সুলভ অন্ধ প্রেম হয় তবে

তার দ্বারা স্বজাতির উন্নতি অসম্ভব। পিতৃ-সুলভ হিতৈষণাই আমাদের স্বদেশ-প্রেমের আদর্শ হওয়া উচিত।

তখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধের যে সমালোচনা হয় তার উত্তর হিসাবে তিনি লেখেন 'জাতীয়তার নিবেদনে অনতিজাতীয়তার বক্তব্য'। এ ছাড়া 'ভারতের দারিদ্র্য ও সাক্ষাৎ বাণিজ্য' এবং 'আবেদন—না, আত্মচেষ্টা' প্রবন্ধ দুটিও উল্লেখযোগ্য।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬)ঃ প্রবন্ধ রচনায় দ্বিজেন্দ্রনাথের লেখনীর মৌলিকতাও অনস্বীকার্য। কিন্তু স্বদেশীযুগে তাঁর দেশাত্মবোধক রচনা বিশেষ নেই। এখানে শুধু তাঁর একটিমাত্র দুষ্প্রাপ্য রচনার কথা উল্লেখ করছি। স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ারের মধ্যে দিয়ে তখন সন্ত্রাসবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে; ইংরেজের দমন-নীতিকে দমন করে দেশকে বিজাতীয় অত্যাচারের নাগপাশমুক্ত করার জন্যে গুপ্ত-সমিতির সভ্যরা চারিদিকে সশস্ত্র সক্রিয়তা গড়ে তুলেছেন। এই সময়ে দ্বিজেন্দ্রনাথের একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা আত্মপ্রকাশ করে, নাম—'দেখিয়া শিখিব কি ঠেকিয়া শিখিব?' (১৯০৮)। পুস্তিকাটি কুন্তলীন প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩২ এবং পৃষ্ঠার আকারও খুব ছোট—পকেট-বুক ধরনের। এটিতে লেখক স্বাধীনতা ও স্বরাজের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছেন কথোপকথনের ধরনে। রচনার মধ্যে একটি সাবলীল গতিভঙ্গি লক্ষ্য করা যায়। সামান্য নিদর্শন গ্রহণ করা যাক্,

> স্বাধীনতাও যা, স্বারাজ্যও তা, একই; তার সাক্ষী—স্বাধীন = স্ব + অধীন, অর্থাৎ আপনি আপনার অধীন; স্বরাজ = স্ব + রাজ, অর্থাৎ আপনি আপনার রাজা; দুয়ের ভাবার্থই অবিকল সমান। যাঁহারা স্বাধীনতা এবং স্বারাজ্যের কাঙ্গালী, তাঁহাদের দুইটি বিষয় সর্বদা স্মরণে জাগ্রত রাখা কর্তব্য।
>
> প্রথম স্মর্তব্য
>
> ঈশ্বরের অধীনতা স্বাধীনতার সোপান, সৌরাজ্য (অর্থাৎ মঙ্গলরাজ্য) স্বারাজ্যের সোপান; ধর্ম-বন্ধন মুক্তির সোপান।
>
> দ্বিতীয় স্মর্তব্য
>
> স্বেচ্ছাচার স্বাধীনতার বিপরীত পথ; নৈরাজ্য (অর্থাৎ অরাজকতা) স্বারাজ্যের বিপরীত পথ; উচ্ছৃঙ্খলতা মুক্তির বিপরীত পথ। (পৃ ১৪)

স্বারাজ্য কিছু আর আমাদের পোষা কুকুর নহে যে, তাহাকে আমরা ডাক দিবামাত্র তৎক্ষণাৎ সে দৌড়াইয়া আসিয়া আমাদের পদলেহন করিতে থাকিবে! (পৃ ১৫)

দ্বিজেন্দ্রনাথ সমসাময়িক সন্ত্রাসবাদকে একেবারেই সমর্থন করতে পারেন নি; তাছাড়া তিনি মনে করতেন দেশের লোক তখনো স্বরাজ বা স্বাধীনতা লাভের যোগ্যতা অর্জন করে নি। আভ্যন্তরীণ গঠনমূলক প্রস্তুতিকে সার্থক করে তুলতে না পারলে স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা নিরর্থক। এই কথাই তিনি গ্রন্থের শেষে বলতে চেয়েছেন বিধি এবং অবিধির নির্দেশের মধ্যে। এখানে অবিধির অংশটি উদ্ধৃত করা হল,

কাহাকেই-বা আমি বলিতেছি বিধি, আর কাহাকেই-বা আমি বলিতেছি অবিধি, তাহা যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে প্রণিধান কর :—

অবিধি

(১) গাছে না উঠিতেই এক কাঁধির প্রত্যাশা!

(২) স্বারাজ্যের যোগ্যতা-লাভে জলাঞ্জলি দিয়া স্বারাজ্যের অধম নাট্যাভিনয়।

(৩) জন্মভূমি যেমন মাতা, ধর্ম তেমনি পিতা, এ কথাটি ভুলিয়া বসিয়া থামিয়া উচ্ছৃঙ্খলতার দৌরাত্ম্যে পিতাকে দেশছাড়া করিয়া—মাতাকে 'সুজলা, শ্যামলা' প্রভৃতি ঝুড়ি ঝুড়ি বাক্যালংকার পরিধান করাইয়া কাটা ঘায়ে লবণের ছিটা প্রদান। (পৃ ২৯)

বিষয়-বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে না হলেও রচনা-বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথের এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাটি অভিনবত্বের দাবি করতে পারে।

সখারাম গণেশ দেউস্কর (১৮৬৯-১৯১২): স্বদেশী যুগের আর একজন নাম-করা প্রবন্ধকার হলেন সখারাম গণেশ দেউস্কর। ইনি ছিলেন মারাঠি, কিন্তু বাংলার মাটি তাঁকে খাঁটি বাঙালী করে তুলেছিল। বৈদ্যনাথ ধামের কাছে একটি গ্রামে তাঁর জন্ম হলেও তাঁদের আদি নিবাস বোম্বাই-এর অন্তর্গত রত্নগিরি জেলার দেউস্ গ্রামে। এই গ্রামেরই অদূরে ছিল শিবাজীর 'আলবান্' দুর্গ। দেওঘরে যখন তিনি স্কুলের ছাত্র সে সময় সুপ্রসিদ্ধ যোগীন্দ্রনাথ বসু ছিলেন সেই স্কুলের প্রধান শিক্ষক। ছাত্রাবস্থা থেকেই যোগীন্দ্রনাথের স্নেহ-প্রেরণাতে

সখারামের বাংলা সাহিত্যে অনুরক্তি গড়ে ওঠে। শৈশব থেকেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা সুরু করলেও সখারাম অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গেই মাতৃভাষাতেও পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তাঁর বিশেষ প্রবণতা ছিল ইতিহাসের দিকে। স্বদেশী যুগের এই একনিষ্ঠ সাধকটির পরিচয় আজ অনেকেই ভুলে গেছেন। তাই এখানে তাঁর এই সামান্য পরিচয়ের প্রয়োজন হল।

নানা প্রতিকূলতার মধ্যে পড়ে সখারাম ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় এসে হিতবাদী পত্রিকার অফিসে কাজ নেন। তখন এ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ। এই পত্রিকায় প্রুফ-রিডারের পদ থেকে ক্রমে তিনি সম্পাদকের পদে উন্নীত হন এবং পরিচালনার কাজে অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দেন।

এই সময়ে প্রকাশিত সখারামের গদ্য-গ্রন্থগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, 'দেশের কথা' (১৩১১)[২], 'শিবাজীর দীক্ষা' (১৩১১), 'শিবাজী' (১৩১৩) এবং 'বঙ্গীয় হিন্দুজাতি কি ধ্বংসোন্মুখ ?' (১৩১৭)।

'দেশের কথা'-র ৪র্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপনে পাওয়া যায়, "যাঁহারা জাতীয় মহাসমিতির কার্যকলাপে অনাদর প্রকাশ পুরঃসর রাজপুরুষদিগের আনুকূল্য নিরপেক্ষ হইয়া দেশী শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি-সাধনে অগ্রসর, তাঁহাদিগের এই পুস্তকখানি পাঠ করা উচিত।"

প্রকৃতই, ইতিহাসের নিরপেক্ষ মাপকাঠিতে আর যুক্তির স্বচ্ছ আলোকে ইংরেজ-রাজত্বে ভারতবাসীর লাভ-ক্ষতির এমনতর খতিয়ান সেদিন সারা বাংলায় এক অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। দুবছর আগে রমেশচন্দ্র দত্তের *'The Economic History of India'* (লণ্ডন, ১৯০২) প্রকাশিত হলে শিক্ষিত বাঙালীর চিন্তা-জগতে যে নতুন দিগ্‌দর্শন ঘটে, সখারামের 'দেশের কথা' তাকেই আরো স্পষ্ট করে তোলে। অবশ্য সখারাম ইংরেজের শঠতা,

২ বইটি এ সময়ে যে কী অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করে নিচের তথ্য থেকে তা সহজেই বোঝা যাবে—

১ম সংস্করণ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩১১ ; ১,০০০ খণ্ড।
২য় „ —আশ্বিন, ১৩১২ ; ২,০০০ „
৩য় „ —মাঘ, ১৩১২ ; ৫,০০০ „
৪র্থ „ —আশ্বিন ১৩১৪ ; ২,০০০ „

—৪র্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপন থেকে গৃহীত।

স্বার্থপরতা আর কুকীর্তির কথাই বলে গেছেন। ১৩১১ সালের শ্রাবণ সংখ্যার বঙ্গদর্শনে রবীন্দ্রনাথ এই বইটির সমালোচনা প্রকাশ করেন। তাঁর আদর্শনিষ্ঠা স্বদেশ-প্রেমের সংকীর্ণতাকে সমর্থন করতে পারে নি। তিনি যাকে প্যাট্রিয়টিজ্‌ম্ বলেছেন, অর্থাৎ অহং-যুক্ত দেশভক্তি, 'দেশের কথা'-য় তার পরিচয় থাকলেও গ্রন্থটির ঐতিহাসিক মূল্যকে অস্বীকার করা চলে না। স্বাদেশিকতার ক্ষেত্রে এই মূল্য-বিচারও প্রয়োজনীয়।

'শিবাজীর দীক্ষা' এবং 'শিবাজী' দুটি অল্প পৃষ্ঠার চরিতকথা। সখারাম বাংলা দেশে শিবাজী উৎসবের প্রবর্তক। দেশবাসীর মনে শক্তি সঞ্চারের উদ্দেশ্যেই এই অনুষ্ঠানের প্রবর্তনা। শিবাজীর বলিষ্ঠ জাতীয়তাবোধে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করে তোলার জন্যে সখারাম এই দুটি পুস্তিকা রচনা করেন এবং দুটি পুস্তিকাই ১৩১১ এবং ১৩১৩ সালের শিবাজী-উৎসবে উৎসব-সমিতি কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরিত হয়েছিল। এই উপলক্ষ্যেই রচিত রবীন্দ্রনাথের 'শিবাজী-উৎসব' কবিতাটিও 'শিবাজীর দীক্ষা' পুস্তিকায় সংযোজিত হয়।

'বঙ্গীয় হিন্দু জাতি কি ধ্বংসোন্মুখ'—গ্রন্থটি সখারামের আর একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। এই বইটি লেখার একটু পূর্ব-কথা আছে এই প্রসঙ্গে তা স্মরণ করা যেতে পারে।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জামাতা তদানীন্তন অবসর-প্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট্ কর্ণেল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সে সময়ে 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় কয়েকটা প্রবন্ধ লেখেন। কিছুদিন পরে এই প্রবন্ধগুলি তিনি A Dying Race নাম দিয়ে পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেন; সেই সঙ্গে এই প্রবন্ধগুলির আসল বক্তব্য বাংলায় লিখে "হিন্দু সমাজ (নিবেদন-পত্র)" নাম দিয়ে ছাপানো হয় এবং সেগুলির ২৫ হাজার কপি বিনামূল্যে বিতরণ করেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বক্তব্য ছিল—"বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের আসন্নকাল উপস্থিত।" তাঁর মতে বাংলাদেশে ক্রমে মুসলমানের সংখ্যা যে পরিমাণে বাড়ছে আর হিন্দুর সংখ্যা কমছে তাতে এর মাটি থেকে বাঙালী হিন্দুর অস্তিত্ব লোপ পেতে আর দেরি নেই। তাঁর এই বক্তব্যের প্রথম প্রতিবাদ আসে কলকাতা হাইকোর্টের তদানীন্তন উকিল কিশোরীলাল সরকার, এম. এ., বি. এল্ মহাশয়ের কাছ থেকে। তিনি অমৃত-বাজার পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন—"A Dying Race—How Dying?" নাম দিয়ে। তাঁর উত্থাপিত প্রশ্নগুলির কোন উত্তর না দিয়ে

উপেন্দ্রনাথ তাঁর ইংরেজী লেখার হুবহু বাংলা অনুবাদ করে "ধ্বংসোন্মুখ জাতি" নাম দিয়ে প্রকাশ করেন আর তার সঙ্গে আর একটি নিবেদন পত্রের ২৫ হাজার কপি বিনামূল্যে বিতরিত হয়। সখারাম মন্তব্য করছেন, "এইরূপ অধ্যবসায়-সহকারে বাঙালী হিন্দুর মুমূর্ষু দশার কথা প্রচারিত হওয়ায় বাঙালী সমাজে কিঞ্চিৎ চাঞ্চল্যের আবির্ভাব হইয়াছে।" এই ব্যাপারে প্রকৃত অবস্থা বিশ্লেষণ করার উদ্দেশ্যেই সখারাম লেখেন—'বঙ্গীয় হিন্দু জাতি কি ধ্বংসোন্মুখ ?' এতে তিনি উপেন্দ্রনাথের সমস্ত মতকে তথ্য ও যুক্তির দ্বারা খণ্ডন করে প্রমাণ করেন যে বাঙালী হিন্দুর ধ্বংসপথে অগ্রগতির কোন পরিচয়ই পাওয়া যায় না।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় (১৮৬১-১৯১০) : স্বদেশী আন্দোলনের সময় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের ইংরেজ-বিদ্বেষ আকস্মিক উল্কা-জ্বালার মতো। এ বিদ্বেষ তাঁর প্রকৃতিতে খুব অস্বাভাবিক বলে মনে হবে না, যদি ভেবে দেখা যায় তাঁর বিচিত্র প্রকৃতি কতখানি পরিবর্তনধর্মী ছিল। বিদ্যা, বুদ্ধি, ধর্ম, নিষ্ঠা, নির্ভীকতা, আবেগ, উন্মাদনা, উত্তেজনা—এ সবের সমবায়ে গঠিত তাঁর প্রকৃতি একটা মেক্যানিক্যাল মিক্সচার। আমাদের সৌভাগ্য যে এগুলি সংমিশ্রিত হয়ে তাঁর প্রকৃতিকে একটা কেমিকেল কম্পাউণ্ডের আকার দেয় নি ; আমরা অনায়াসেই সে প্রকৃতি থেকে উন্মাদনা-উত্তেজনা, বিদ্যা-বুদ্ধি আর নিষ্ঠা-নির্ভীকতার ভাগকে পৃথক করে নিতে পারি।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় প্রকাশিত তাঁর প্রায় সমস্ত লেখাই এখন অপ্রাপ্য। এখানে তাঁর একটি মাত্র প্রবন্ধ-পুস্তকের উল্লেখ করছি—'সমাজ' (১৩০৯ ?)। এই গ্রন্থে প্রকাশিত 'হিন্দুজাতির অধঃপতন' এবং 'তিন শত্রু' প্রবন্ধ দুটি বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। পরে এই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি 'সমাজ-তত্ত্ব' নামে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আবার গ্রন্থাকারে মুদ্রিত করেন (১৩১৭)। এ সম্বন্ধে বঙ্গদর্শন প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯) : বাংলাদেশের আর একজন অক্লিষ্টকর্মা স্বদেশসেবী হলেন শিবনাথ শাস্ত্রী। তাঁর সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, "বস্তুতঃ স্বদেশ-প্রেমই ছিল

শিবনাথের জীবনের মূলমন্ত্র।"[১] ১৮৭৬ সালে 'ভারত-সভা' বা 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোশিয়েশন'-এর অন্যতম স্রষ্টা শিবনাথ ; এবং এই প্রতিষ্ঠানই হল বাংলা দেশের বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। পরের বছর তিনি যে 'ইনার্ সার্কল্' গঠন করেন বাংলা দেশে জাতীয়তাবোধের উদ্বোধনে তা কম সাহায্য করে নি। এর সভ্যরা যে প্রতিজ্ঞাগুলি গ্রহণ করেছিলেন সেগুলি শিবনাথের রচনা ; এ সম্বন্ধে পূর্ব-প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় লেখা শিবনাথের বিশেষ কোন রচনা পাওয়া যায় না। সাহিত্য-ক্ষেত্রে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারেন নি বটে, কিন্তু প্রবন্ধ-রচনায় তাঁর বেশ দক্ষতা ছিল। তাঁর 'প্রবন্ধাবলি' প্রকাশিত হয় ১৩১১ সালে। এই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি ১৩০৬ থেকে ১৩১১ সালের মধ্যে লেখা এবং প্রদীপ, ভারতী, প্রবাসী প্রভৃতি পত্রিকায় পূর্বপ্রকাশিত। এর মধ্যে কয়েকটি প্রবন্ধ দেশাত্মবোধক, যথা—'নবযুগের নব প্রশ্ন', 'সামাজিক শক্তির ঘাত-প্রতিঘাত'—(১ম ও ২য় প্রস্তাব), 'জাতীয়-উদ্দীপনা ও জাতীয় সাহিত্য' (১ম ও ২য় প্রস্তাব) এবং 'বিভিন্ন সামাজিক আদর্শের সংঘর্ষ' (১ম, ২য় ও ৩য় প্রস্তাব)।

সমাজ-তত্ত্বের ভিত্তিতে নতুন শ্রমিক-চেতনাকে বাংলাদেশে শিবনাথ শাস্ত্রীই প্রথম সার্থকভাবে উপলব্ধি করেন। তাঁর তীব্র সমাজ-সচেতন মন য়ুরোপের তৎকালীন মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে নতুন সমাজ-শক্তির উন্মেষকে সাগ্রহে লক্ষ্য করেছিল ; এই শক্তির অনিবার্য বিকাশের সম্ভাবনাকেও তিনি পূর্ণ স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। একদল মুষ্টিমেয় ধনী মানুষ যে দেশের বিরাট এক জনসমষ্টিকে চিরকাল ঠকিয়ে যাবে আর তারা সেই প্রবঞ্চনাকে চিরকাল বিনা প্রতিবাদে পরিপাক করে যাবে মনুষ্য-সমাজে এমনতর কোন অনন্য বিধান নেই। এই সত্যটিকে শিবনাথ যথার্থভাবে ধরতে পেরেছিলেন বলেই তিনি লিখেছেন,

> বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে ইউরোপের জাতিগণের মধ্যে, কলকারখানার মালিক ধনিগণ ও শ্রমজীবীদিগের মধ্যে ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা উৎপন্ন হয়।··· এই বিবাদ-বিসম্বাদ হইতে নবশক্তি জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। শ্রমজীবীগণ দেখিয়াছে যে, সমবেতভাবে কার্য না করিলে, তাহারা মালিকদিগের সমক্ষে দাঁড়াইতে পারিবে না। এই জন্য বহুল পরিমাণে ধর্মঘট করিবার প্রথা

১ 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'—সপ্তম খণ্ড।

প্রবর্তিত হইয়াছে। শ্রমজীবীরা একত্র হইয়া 'ট্রেড্ ইউনিয়ান্' নামে এক সভা স্থাপন করিয়া সকলে তাহার অন্তর্গত হইয়াছে। এই সকল সভার উদ্দেশ্য শ্রমজীবীদিগের স্বার্থ রক্ষা করা।...ব্যক্তিগত শক্তিকে এইরূপে সামাজিক শক্তিরূপে পরিণত করা বর্তমান সময়ের একটা প্রধান আলোচ্য বিষয়। ('সামাজিক শক্তির ঘাত-প্রতিঘাত'—১ম প্রস্তাব, পৃ ৮৫-৮৬।)

এই প্রবন্ধেরই দ্বিতীয় প্রস্তাবে লেখক বলছেন, জনসমাজে বহুকাল-সঞ্চিত এবং বহুজন-অনুষ্ঠিত কোন পাপ বা দুর্নীতিকে দূর করতে হলে সামাজিক শক্তির এই সংহতির বিশেষ প্রয়োজন; আর সে পাপ, সে দুর্নীতি পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে ভারত-ক্ষেত্রে। তাই—

যদি কোথাও দেশের দুর্গতি দূর করিবার জন্য শত সহস্র দেশ-হিতৈষী ব্যক্তির সমবায় ও অবিশ্রাম চেষ্টার প্রয়োজন থাকে, তাহা এই ভারতক্ষেত্রে; কিন্তু আমরা আপনাকে ভুলিতে পারি না, অকপটে মহা-সংকল্পে আত্মসমর্পণ করিতে পারি না বলিয়াই অপর হৃদয়কে উদ্দীপ্ত করিতে পারি না। সেই জন্যই এক হৃদয়ের অগ্নি দশ হৃদয়ে ছড়াইয়া পড়ে না। (পৃ ৯৩)

কিন্তু এই সংহতিকে গড়ে তোলার একমাত্র ক্ষেত্র যে রাজনীতি এ কথা তিনি বলেন নি। তাঁর মতে সামাজিক ভিত্তিতে দেশকে প্রস্তুত করে তোলা সব আগে প্রয়োজন; আর এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির দুটি বড় উপায় জাতীয় সাহিত্য ও জাতীয় শিল্প। তাই তিনি প্রশ্ন তুলেছেন—

বিদেশীয় রাজাদের লৌহদ্বারে আঘাত করা ব্যতীত কি আমাদের আর কিছু করিবার নাই? যেখানে তাঁহাদের সঙ্গে সংঘর্ষণ নাই, জাতীয়-জীবনের এমন ক্ষেত্র কি পড়িয়া নাই? ('জাতীয়-উদ্দীপনা ও জাতীয় সাহিত্য'—২য় প্রস্তাব। পৃ ১১১।)

দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী (১৮৫৪-১৯২০): নব্যভারত-সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরীও বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে সুনাম অর্জন করেছিলেন। ১৩১৩ সালে প্রকাশিত 'প্রসূন' গ্রন্থটিতে তাঁর অনেকগুলি প্রবন্ধ সংকলিত হয়। এই প্রবন্ধগুলির রচনাকাল ১৩১০ থেকে ১৩১৩ সাল। এতে জাতীয়-চিন্তামূলক যে কটি প্রবন্ধ আছে সেগুলির দুএকটি আগে নব্যভারতে প্রকাশিত হয়েছিল। বিবিধ প্রবন্ধের এই সংকলনটির মধ্যে এই ধরনের প্রবন্ধ হল—'জাগরণ', 'স্বদেশপ্রেম',

'স্বদেশ-সেবা', 'সেবা', 'হিতৈষীদল—টাকা ও যশমানের কুহকে', 'দীপ্ত শিয়ার দহন', 'আত্মবলি ও আত্মবিলি', 'উপেক্ষা ও পিপাসা' প্রভৃতি। নব্যভারত-প্রসঙ্গে তাঁর রচনাগুলি নিয়ে আলোচনার সময় তাঁর যে চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় আমরা পেয়েছি এই প্রবন্ধগুলিতেও তারই প্রকাশ। সুতরাং এখানে আর তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লেখার অবকাশ নেই। শুধু 'স্বদেশ-সেবা' প্রবন্ধটি থেকে সামান্য অংশ উদ্ধৃত হল; ইংরেজের আদেশ অমান্য করার জন্যে লেখক স্বদেশবাসীকে নির্দেশ দিতে গিয়ে বলছেন,

> বর্তমান সময়ে অবিভক্ত বঙ্গে কে প্রকৃত স্বদেশ-সেবক এবং কে ভণ্ড স্বদেশ-সেবক, তাহার বিচার চলিতেছে। রাজার কঠোর আদেশ—যে স্বদেশী আন্দোলন করিবে, বা বন্দেমাতরম্ বলিবে সেই দণ্ড পাইবে। এই আদেশের ইঙ্গিতে অনেক ভণ্ড স্বদেশ-সেবীই থতমত খাইয়া নীরব হইয়া আম্‌তা-আম্‌তা-ব্রত সাধন করিতেছেন; কিন্তু প্রকৃত স্বদেশ-সেবকদল কি ভয়ে ব্রত পরিত্যাগ করিবে? সেরূপ স্বদেশ-সেবক কি এদেশে আছেন, যিনি স্বদেশ-প্রেমের তন্ময়তায় রাজাদেশ ভুলিয়া যাইতে পারেন? যদি কেহ থাকেন, তবে তিনি এ রাজ্যে বা পররাজ্যে সর্বোচ্চ সম্মান পাইবেনই পাইবেন।
>
> (পৃ ৩৬)

ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী: ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর অনেকগুলি লেখা সে সময়ের পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে রয়েছে। এগুলির কোন সংকলন প্রকাশিত হয় নি। তাঁর দুটি মুদ্রিত প্রবন্ধগ্রন্থের মধ্যে এখানে একটির নাম উল্লেখযোগ্য—'সংস্কার ও সংরক্ষণ' (১৩১৭)। এই গ্রন্থটির কোন কোন লেখায় তাঁর যে স্বদেশ-চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায় তা নিয়ে এখানে নতুন করে আলোচনার প্রয়োজন নেই; কারণ পত্র-পত্রিকা-প্রসঙ্গে তা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে।

নিখিলনাথ রায় (১৮৬৫-১৯৩২): স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে বাংলায় কয়েকখানি গদ্য-গ্রন্থ বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানকে গড়ে উঠতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। এগুলির মধ্যে দুটি প্রধান গ্রন্থ হল—'দেশের কথা' এবং 'সোনার বাংলা'। 'দেশের কথা'-র সম্বন্ধে পূর্বে বলা হয়েছে; 'সোনার বাংলা'-র রচয়িতা নিখিলনাথ রায়। বিস্তৃত ঐতিহাসিক তথ্যের পটভূমিতে স্বদেশের অবস্থার বিচার-বিশ্লেষণ এবং ইংরেজ-অত্যাচারের তীব্র সমালোচনা বাংলা ভাষায় প্রথম সার্থকরূপ লাভ করে

সখারাম ও নিখিলনাথের হাতে। সখারামের 'দেশের কথা' প্রকাশিত হবার দুবছর পরেই নিখিলনাথের 'সোনার বাংলা'-র আত্মপ্রকাশ (১৯০৬)।

কলকাতার ছোট আদালতে এবং হাইকোর্টেও নিখিলনাথ কিছুদিন ওকালতি করেন। তারপর ওকালতি ছেড়ে কাশীমবাজারের মহারাজার একটি জমিদারীর নায়েবী গ্রহণ করেন। শেষ জীবনে এ চাকরীও তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন।

সখারামের মতো নিখিলনাথেরও ইতিহাসের দিকে স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র ত্রৈমাসিক 'ঐতিহাসিক চিত্র' বন্ধ হয়ে যাওয়ার পাঁচ বছর পরে নিখিলনাথ এটিকে মাসিক-পত্র হিসাবে আবার প্রকাশ করেন এবং সাত বছর এটির সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়া 'শাশ্বতী' ও 'পল্লীবাণী' নামেও দুটি মাসিক পত্র তিনি কিছুকাল সম্পাদনা করেছিলেন।

চারটি চরণের একটি ছোট উৎসর্গ-কবিতা 'সোনার বাংলা'-র প্রথমেই মুদ্রিত হয়েছে—

সোনার বাংলার এই শ্মশান আগারে,
উড়াইয়া চিতা-ভস্ম ক্ষুদ্র শক্তি ভরে,
জ্বালে আশা-দীপ যারা নিবিড় আঁধারে,
সমর্পিণু গ্রন্থ সেই ছাত্রগণ-করে।

গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নিখিলনাথ ভূমিকায় লিখছেন—

> স্বদেশী আন্দোলনে সকলের হৃদয়েই অল্পবিস্তর তুফান উঠিয়াছে। সেই বিরাট আন্দোলন গ্রন্থকারেরও মর্মস্পর্শ করায় সোনার বাংলার অবতারণা। আমাদের সোনার বাংলা পূর্বেই বা কেমন ছিল, আর কিরূপেই বা ইহাতে ধ্বংসের স্রোত প্রবাহিত হয় এবং সেই স্রোতো-রোধের জন্য উপায় চিন্তা, ইহা লইয়া চারিটি প্রবন্ধ লিখিত হয়। তাহাদের প্রথমটি 'বঙ্গদর্শনে' ও অপর তিনটি 'উপাসনায়' প্রকাশিত হইয়াছিল।

এই চারটি প্রবন্ধ হল—'সোনার বাংলা', 'সোনার বাংলা ছারখারের সূচনা', 'সোনার বাংলা ছারখার' এবং 'সোনার বাংলা জাগিবে কি ?'

আজকের বিচারে নিখিলনাথের ঐতিহাসিক তথ্য-বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ অভ্রান্ত না হলেও তাঁর বিষয়মুখ দৃষ্টিভঙ্গির তীক্ষ্ণতা প্রশংসনীয়। আর শুধু অভ্রান্ত ঐতিহাসিক সত্যকে প্রতিষ্ঠা করাও তো তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। জনচিত্তে

ইংরেজের অত্যাচারকে প্রতিরোধের দুর্দমনীয় ক্ষমতাকে তিনি জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। আর সেদিক থেকে তাঁর 'সোনার বাংলা' সার্থকও হয়েছিল। শেষ প্রবন্ধের এক স্থানে নিখিলনাথ লিখছেন,

> এই মহাসুযোগ যদি আমরা পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে আমাদের অস্তিত্ব এ বসুন্ধরা-পৃষ্ঠে আর অধিক দিন থাকিবে না. বাঙালী জাতির ধ্বংস শীঘ্রই সংঘটিত হইবে। ইহাতেও যদি আমাদের চৈতন্য না হয়, এই সংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া—পিপাসায় ক্ষাম-কণ্ঠ হইয়া—রক্তমোক্ষণে কঙ্কালসার হইয়া—শ্মশানের চিতাভস্ম অঙ্গে মাখিয়া—যদি আমরা ঘুমাইয়া পড়ি, তাহা হইলে আমাদের সে ঘুম, আর কোনকালেই ভাঙ্গিবে না। তাই বলিতেছি যে, একবার বন্দেমাতরমের পাঞ্চজন্য শুনিয়া সকলে উঠিয়া দাঁড়াও। (পৃ ১৩৬)
>
> সহস্র লাঠি, সহস্র সঙ্গীন বাহির হউক, বন্দুকের শব্দে সমস্ত বাংলা প্রতিধ্বনিত হউক, কিন্তু আমাদিগকে আর পিছাইলে চলিবে না। লাঠি, সঙ্গীন, বন্দুকের আঘাত সহ্য করিয়াও আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। (পৃ ১৪৪)

এই সঙ্গে বাঁচবার উপায় সম্বন্ধে আত্মচেষ্টা, অর্থাৎ পল্লী-সংস্কার, শিল্পোন্নয়ন প্রভৃতির ওপরেও লেখক জোর দিয়েছেন।

গল্প ও উপন্যাস

গল্প ও উপন্যাসের ক্ষেত্রে স্বদেশী আন্দোলন তেমন প্রবেশাধিকার পায় নি। কোন কোন সাময়িক-পত্রে দুএকজন লেখকের রচনায় আন্দোলনের সামান্য প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

যাঁদের কিছু কিছু গল্প গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁদের কয়েকজনের সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করা হল।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩২) ঃ প্রভাতকুমারের একটি গল্পগ্রন্থের উল্লেখ করছি,—'দেশী ও বিলাতী' (১৩১৬)। এই গ্রন্থের গল্পগুলির মধ্যে দুটি গল্প ছাপা হয় ভারতীতে এবং অবশিষ্টগুলি প্রবাসীতে। গল্পগুলির মধ্যে তিনটিতে স্বদেশী আন্দোলনের প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে। এগুলিকে আন্দোলন-মূলক গল্পই বলা যেতে পারে। গল্প তিনটি হল—'উকীলের বুদ্ধি', 'খালাস' এবং 'হাতে হাতে ফল'। প্রবাসী-প্রসঙ্গে এগুলির উল্লেখ করা হয়েছে।

অন্যান্য গল্পগুলির কোন কোনটিতে ঘটনা-প্রসঙ্গে সহসা স্বদেশীর কথা উত্থাপিত হয়েছে। লেখকের মনে স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাব যে কতটা জোরালো ছিল তা বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয় না। এমন কি তাঁর গল্পে হাস্য-রসিকতার মধ্যেও স্বদেশীর কথা এসে পড়েছে। এখানে প্রবাসী-প্রসঙ্গে অনালোচিত একটি গল্প থেকে এই ধরনের সামান্য পরিচয় উদ্ধৃত হল। গল্পটির নাম 'আধুনিক সন্ন্যাসী'।

> তখন সেইমাত্র সূর্যোদয় হইয়াছে। গিয়া দেখিলাম, কুটীরের সম্মুখে অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছে—তাহার সম্মুখে বসিয়া সাধুবাবা ধ্যানস্থ।
>
> কিয়ৎক্ষণ বসিয়া থাকার পর সাধুবাবা নয়ন উন্মীলন করিলেন। আমি প্রণাম করিলাম।
>
> তিনি বলিলেন,—'আজ তোমার পরীক্ষা ?'
>
> 'আজ্ঞে হাঁ।'

'তোমায় আজ কিছু বলিব বলিয়াছিলাম। তাহা অতি সামান্য কথা, অথচ প্রয়োজনীয় কথাও বটে। দেখ,—আর্যধর্মে পুরাকাল হইতে ফুল দিয়া দেবতার পূজা করিবার কেন ব্যবস্থা আছে বলিতে পার?'

আমি বলিলাম,—'ফুল সুগন্ধপূর্ণ জিনিষ,—দেবতার প্রীতির জন্য ফুল দিয়া পূজা করা হয়।'

সাধুবাবা বলিলেন,—'ভুল। দেবতা নির্বিকার। ফুলের গন্ধে তাঁহার প্রীতি হইবে কি করিয়া? না, ফুল দেবতার জন্য নহে,—পূজকের প্রীতির জন্য। ফুলের গন্ধে পূজকের মনে আনন্দের ভাব হইবে বলিয়া। আনন্দপূর্ণ মনে কোনও কার্য করিলে তাহা যেমন সফল হয়, সেরূপ আর কিছুতে হয় না। তুমি বাসায় ফিরিবার সময় এক শিশি সুগন্ধি দ্রব্য কিনিয়া লইয়া যাইও। তাহা যদি দেশী পাও ত বিলাতী কিনিও না, কারণ দেশীয় শিল্পের উৎসাহ-বর্ধন করা আমাদের কর্তব্য। সেই সুগন্ধি রুমালে, চাদরে একটু মাখিয়া পরীক্ষালয়ে যাইবে। মন ভাল থাকিলে ভাল লিখিতে পারিবে।' (পৃ ৪৯-৫০)

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৬৬-১৯৩১)ঃ সাহিত্য পত্রিকা প্রসঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁরও তৎকালীন দুএকটি গল্পে স্বদেশী আন্দোলনের সামান্য প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সুরেন্দ্রনাথের ছোট-গল্পের দুটি সংকলনই ১৩২১ সালের পরে প্রকাশিত হয়।

ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ ইন্দুপ্রকাশের সাহিত্যিক পরিচয় সর্বজনবিদিত না হলেও এখানে তাঁর একটি গ্রন্থের উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন। 'সপ্তপর্ণী' নামে তাঁর এই গল্পগ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৩১৬ সালে। এটিতে যে কটি গল্প আছে সব কটিরই মূল বিষয়বস্তু স্বদেশী আন্দোলন।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯)ঃ প্রবন্ধকার হিসাবেই রামেন্দ্রসুন্দর প্রসিদ্ধ। তবু এখানে তাঁর একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকার উল্লেখ করছি যেটি ঠিক গল্প নয়, অথচ যার মধ্যে গল্পের কিছু বৈশিষ্ট্য এবং আমেজ আছে।

১৩১২ সালের ৩০শে আশ্বিন সারা বাংলায় বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষ্যে যে রাখি-বন্ধন

ও অরন্ধনের ব্যবস্থা হয়েছিল তার মধ্যে দ্বিতীয় প্রস্তাবটি রামেন্দ্রসুন্দরের। এই সঙ্গে তিনি আরও একটি অনুষ্ঠানের প্রস্তাব করেন,—বঙ্গলক্ষ্মীর ঘট প্রতিষ্ঠা ও ব্রত উদ্‌যাপন। সব মেয়েলী ব্রতের সঙ্গেই ব্রতকথা আছে। বাংলাদেশের মেয়েদের এই নতুন ব্রতের জন্যে রামেন্দ্রসুন্দর লিখলেন—'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' (১৩১২)। অন্যান্য ব্রতকথা যেমন গল্প-মূলক, তেমনি এটিও। তাই এখানেই রচনাটির উল্লেখ করলাম। এটি প্রথমে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয় (পৌষ, ১৩১২)। তারপরে লালকালিতে পুঁথির আকারে মুদ্রিত হয়। বঙ্গদর্শনে এই রচনাটির পাদটীকা থেকে পাওয়া যায়—"গত ৩০শে আশ্বিন রাখি-সংক্রান্তির দিন কোন পল্লীগ্রামে অর্ধ সহস্রাধিক পল্লীনারীর সম্মিলনে অনুষ্ঠানসহকারে বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা পঠিত হইয়াছিল।" পুস্তিকাটি এখন দুষ্প্রাপ্য; তাই এখানে কিছুটা অংশ উদ্ধৃত করে দিলাম—

> ১৩১২ সাল, আশ্বিন মাসের তিরিশে, সেইদিন নায়েবের হুকুমে বাংলা দুভাগ হবে; দুভাগ দেখে বাংলার লক্ষ্মী বাংলা ছেড়ে যাবেন। পাঁচকোটি বাঙালী আছাড় খেয়ে ভুমে গড়াগড়ি দিয়ে ডাক্‌তে লাগল—মা, তুমি বাংলার লক্ষ্মী, তুমি বাংলা ছেড়ে যেয়ো না; আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর;···আমরা এখন থেকে মানুষের মত হব; আর পুতুলখেলা কর্‌ব না; কাঞ্চন দিয়ে কাচ কিন্‌ব না; পরের দুয়ারে ভিক্ষা কর্‌ব না; মা তুমি আমাদের ঘরে থাক। বাংলার লক্ষ্মী বাঙালীকে দয়া করলেন। কালীঘাটের মা কালীতে তিনি আবির্ভাব করলেন। মা কালী নববেশে মন্দিরে দেখা দিলেন। সেদিনে আশ্বিনের অমাবস্যা, ঘোর দুর্যোগ। ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি, হুহু করে হাওয়া। পঞ্চাশ হাজার বাঙালী মা কালীর কাছে ধন্না দিয়ে পড়্‌ল। বল্‌লে মা আমাদের রক্ষা কর। বাংলার লক্ষ্মী যেন বাংলা ছেড়ে না যান। আমরা আর অবোধের মত ঘরের লক্ষ্মীকে পায়ে ঠেল্‌ব না। কাঞ্চন দিয়ে কাচ নেবো না। ঘরের জিনিষ থাকতে পরের জিনিষ নেবো না। মায়ের মন্দির হ'তে মা ব'লে উঠলেন—জয় হোক্, জয় হোক্, ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাকবেন; তোমরা প্রতিজ্ঞা ভুলো না, ঘরের থাকতে পরের নিও না; ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই হয়ো না; তোমাদের 'এক দেশ এক ভগবান, এক জাতি এক প্রাণ' হোক; লক্ষ্মী তোমাদের অচলা হবেন।···

বন্দে মাতরম্

বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা

(19)

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

পৃ ২৯০ ক
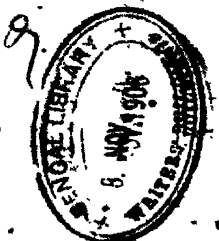
বাংলার মেয়েরা ঐ দিন বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রত নিলে। হাতে হাতে হলুদে সুতোর রাখী বাঁধলে। ঘট পেতে বঙ্গলক্ষ্মীর কথা শুনলে। বিদেশী বর্জনের প্রতিজ্ঞা করলে। যে এই বঙ্গলক্ষ্মীর কথা শোনে, তার ঘরে লক্ষ্মী অচলা হন।

ব্রতকথাটি সম্পূর্ণ চলিত ভাষায় লেখা। পল্লীবাসিনীদের হৃদয়গ্রাহী করার জন্যে আটপৌরে গ্রামীণ লালিত্য ভাষায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। দর্শন-বিজ্ঞানের তত্ত্বানুসন্ধিৎসু মানুষটির এ ধরনের লেখার আর দ্বিতীয় উদাহরণ নেই। প্রসঙ্গত একটা কথা বলে নেওয়া দরকার। রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন গোঁড়া হিন্দু। তাই এই ব্রতকথা শুধু হিন্দু পল্লীনারীদের জন্যেই রচিত হয়েছিল।

উপন্যাসের ক্ষেত্রেও স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাব খুবই সীমিত। মাত্র দুএকটি ছাড়া এই আন্দোলনকে বিষয়বস্তু করে সম্পূর্ণ উপন্যাস আর রচিত হয় নি। তার কারণ মনে হয় প্রকৃত স্বদেশী আন্দোলনের রূপটি বেশি দিন আমাদের কাছে অপরিবর্তিত থাকে নি এবং তার প্রকৃতিও উপন্যাসের প্লট রচনার উপযোগী ছিল না। তাই দেখা যায়, এই সময়কার দুএকজন ঔপন্যাসিকের লেখায় স্বদেশী আন্দোলন বা আন্দোলনজাত ঘটনাবলীর কথা প্রসঙ্গত এসে পড়েছে; কিন্তু মুখ্যত এই আন্দোলনকে ভিত্তি করেই একটা গোটা উপন্যাস সৃষ্টির কাজে তাঁরা হাত দেন নি।

গঙ্গাচরণ নাগ ঃ তবে দুএকজন যে এই কাজে হাত দিয়েছিলেন তার একটি প্রমাণ সংগ্রহ করা গেছে। বরিশালের অধিবাসী গঙ্গাচরণ নাগ এই সময়ে একটি 'স্বদেশী উপন্যাস' লেখেন। উপন্যাসটির নাম 'রাখী-কঙ্কণ'। ১৩১৪ সালে বরিশাল থেকেই গ্রন্থকার কর্তৃক এটি প্রকাশিত হয়। অবশ্য উপন্যাসটি সম্পূর্ণ নয়, প্রথম খণ্ড মাত্র। প্রবাসীর 'মুদ্রারাক্ষস' এই গ্রন্থটির সমালোচনা করতে গিয়ে ১৩১৪ সালের কার্তিক সংখ্যায় লিখছেন, "বরিশালে প্রথম স্বদেশী-ব্রত গ্রহণ উপলক্ষ্যে দৃঢ়ব্রত যুবকযুবতীদিগকে স্বদেশদ্রোহী আত্মীয়-স্বজন দ্বারাও যে কিরূপে নিগৃহীত হইতে হইয়াছিল, তাহারই চিত্র ইহাতে অঙ্কিত হইয়াছে।...ইহার দ্বিতীয় খণ্ডটি দেখিবার জন্য উৎসুক রহিলাম"। দ্বিতীয় খণ্ডটি বোধ হয় আর প্রকাশিত হয় নি।

গঙ্গাচরণ তাঁর লেখায় সাহিত্যিক পরিপক্কতার তেমন কোন পরিচয় দিতে পারেন নি। দ্বিতীয় খণ্ডটি না দেখলেও বলা যায়, উপন্যাস হিসাবে 'রাখী-কঙ্কণ'-এর সার্থকতা অল্পই। তবে বিভিন্ন ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে লেখক উপন্যাসের মধ্যে যে একটা গতিবেগ আনতে সক্ষম হয়েছেন সে কথা অস্বীকার করা যায় না। লেখার গোড়ার দিকে 'আনন্দ মঠ'-এর প্রভাব সুস্পষ্ট।

উপন্যাসটি দুষ্প্রাপ্য বলে এখানে কিছু বিস্তৃত অংশ উদ্ধৃত করা হল; সমগ্র গ্রন্থটির মধ্যে ঔপন্যাসিক যা বলতে চেয়েছেন এই অংশ থেকে তা পরিষ্কার বোঝা যাবে।

১৩১২ সালের ৩০শে আশ্বিন পূর্বাহ্ণে বরিশালের এক ধনীনন্দন ভণ্ড দেশ-প্রেমিক যদুগোপাল তাঁর বৈঠকখানায় বসে সাদা সুতোয় হলুদ রং করছেন; এমন সময়ে তাঁদের কুলগুরু গণেশাচার্য এসে উপস্থিত। তাঁর সঙ্গে যদুগোপালের কথোপকথনের অংশ-বিশেষ—

যদু। তবে পরাধীন জাতি বলিয়া আমাদের দুঃখের কারণ কি?

গ, আ। দুঃখের কারণ—ইংরেজ জাতির স্বার্থ-স্বাতন্ত্র্য ও স্বার্থপরতা। তজ্জন্য আমরা দিনের দিন গার্হস্থ্য-স্বাধীনতাহারা হইতেছি। তাহাদের মার্জিত সুকৌশলে আমরা এমনই সহিষ্ণুতা প্রাপ্ত হইয়াছি যে, আমাদের পরম স্বার্থ আমরা রক্ষা করিতে পারিতেছি না।

তোমরা যাহাকে ক্লোরোফরম্ বল,—ডাক্তারগণ সেইরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা কোন জীবের অর্দ্ধাংশ কাটিয়া ফেলিলেও সে যেমন তাহা জানিতে পায় না, সেইরূপ এই যাদুকর-জাতি মন্ত্রবলে আমাদিগকে এমন সংজ্ঞাহীন করিয়া ফেলিয়াছে যে,—আমাদের অস্থি, মজ্জা, শোণিত পর্যন্ত পৃথক করিয়া যে বিদেশে লইয়া যাইতেছে, আমরা তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিতেছি না।

কিছুক্ষণ উভয়ে নীরব রহিলেন। তৎপরে যদুগোপালবাবু বলিলেন, 'অনেকেই বলেন, ইংরেজ-রাজত্বে আমরা সুখে আছি।'

গ, আ। সত্য—এ মহানাটকের প্রথম অঙ্কেই 'সুখ-সমৃদ্ধি'। যবনিকায় উহা এমনই মনোমুগ্ধকর রঙে—এমনই চিত্তাকর্ষকভাবে চিত্রিত হইয়াছে যে, দেশের প্রায় পনের আনা পরিমাণ লোকই তাহাতে মোহিত হইয়া পড়িয়াছেন। সুতরাং 'সুখে আছি' একথা সত্য। কিন্তু পরিণামদর্শী

রাখী-কঙ্কণ।

(স্বদেশী-উপন্যাস)

প্রথম খণ্ড।

শ্রীগঙ্গাচরণ নাগ প্রণীত।

বরিশাল হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা,
[illegible], উইলকিন্স মেশিন প্রেসে,
জে, এন, বসু দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৪।

মূল্য [illegible] আনা মাত্র।

চিন্তাশীল ব্যক্তি দিব্য-চক্ষে দেখিতেছেন যে, নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে 'মহা দুঃখ'। যবনিকায় ভারতবাসী নীল তরঙ্গায়িত মহাসমুদ্রে কেবল ভাসিয়া—ভাসিয়া—ভাসিয়া বেড়াইতেছে। তৃতীয় অঙ্কে 'ভীষণ দুর্ভিক্ষ'—যবনিকা ঘোর অন্ধকার—মধ্যে মধ্যে বিদ্যুতের রেখা। তদ্দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, কঙ্কালাবশিষ্ট বঙ্গবাসী পেটে হাত দিয়া রাশি রাশি পড়িয়া আছে। যাহারা অপেক্ষাকৃত সবলকায় তাহাদের মধ্যে আহার্য—মরা মূষিক—মরা শৃগাল লইয়া বিরোধ চলিতেছে। অন্যত্র বিরলে বসিয়া কেহ তীক্ষ্নদশনে শিশুসন্তানের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া মাংস উৎপাটন করিতেছে—আর খাইতেছে। একদল কঙ্কাল উহা দেখিতে পাইয়া লম্ফে ঝম্পে তদভিমুখে চলিতেছে।

চতুর্থ অঙ্কে 'মহামারী'—চিত্রপট মধ্যস্থ রাক্ষসীমূর্তি বড়ই ভীষণ-দর্শনা।...রাক্ষসী, কবলিত নরদেহ সকল বামপার্শ্বে উদ্গীরণ করিতেছে। উদ্গীরিত দেহ সমস্তই শবাকার।...

এখনও কিঞ্চিৎ সময় আছে। যদি সাবধান না হও, তবে এই বিশাল ভারতভূমি এক শতাব্দীর মধ্যেই যে একটি বিশাল শ্মশানে পরিণত হইবে, তৎপক্ষে সন্দেহমাত্র নাই। (পৃ ৫-৭)

কিন্তু গুরু শিষ্যকে জাতীয়-স্বাধীনতা লাভের জন্যে চেষ্টা করার কোন নির্দেশ দেন নি। তিনি বললেন, এই সর্বনাশের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে হলে সর্বাগ্রে যা লাভ করা প্রয়োজন তা হল গার্হস্থ্য-স্বাধীনতা এবং চিত্ত-স্বাধীনতা।

গ, আ।...গৃহধর্ম পালনার্থ আমাদের এ সকল সামগ্রীর দরকার, যথা—চাউল, ডাউল, তৈল, চিনি, লবণ, কাপড়, সূচ, সুতা, দিয়াশলাই, ঝাড়-লণ্ঠন, চশ্‌মা, দোয়াত, কলম, কালি, জামা, জুতা, সাবান, ইত্যাদি-ইত্যাদি-ইত্যাদি। এই সকল জিনিসের প্রায় বার আনা রকমই বিদেশ হইতে আমাদের দেশে আমদানী হয়। সুতরাং নিত্য-নৈমিত্তিক বস্তুর জন্য আমরা পরাধীন। এই পরাধীনতাই আমাদের সর্বনাশের একমাত্র কারণ হইয়া পড়িয়াছে। (পৃ ৮)

'রাখী-কঙ্কণ'-এর সাহিত্যিক মূল্য যে একেবারে নেই এ কথা বলা চলে না ; তবে তার চেয়ে বইটির ঐতিহাসিক মূল্যই বর্তমানে বেশি।

নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য : নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য বিদ্যাভূষণ বিশেষ করে গল্প রচনায় যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন।[১] সে সময়ের প্রবাহ, স্বদেশী, জাহ্নবী প্রভৃতি মাসিকপত্রে তাঁর অনেকগুলি গল্প প্রকাশিত হয়েছিল। নারায়ণ-চন্দ্রের লেখার সব চেয়ে বড় গুণ গতি-বেগ ; ঘটনা-সন্নিবেশ বা পারম্পর্য নিখুঁত না হলেও একটানা পড়ে যেতে অসুবিধা হয় না এবং ধৈর্যচ্যুতিও ঘটে না। দুএকটি উপন্যাসও ইনি লিখেছিলেন। এখানে একটির উল্লেখ করছি—'নববিধান' (১৩১৪)। স্বদেশীযুগে রচিত হলেও এটি ঠিক আন্দোলন-মূলক নয়। ইংরেজ-অত্যাচারের প্রতিবিধান করার ব্যাপারে দেশবাসীকে সচেতন করে তোলার উদ্দেশ্য নিয়েই এটি লেখা। কিন্তু লেখক এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চেয়েছেন পরোক্ষ ভাবে। প্রবাসীতে বইটির যে সমালোচনা প্রকাশিত হয় তা লক্ষ্য করলেই এ কথার যাথার্থ্য বোঝা যাবে—"পুস্তকখানি সুলিখিত উপন্যাস। দেশে রাজশক্তির অত্যাচারের বিরুদ্ধে ধর্মসহায় দুর্বল প্রজা কি করিতে পারে তাহা সুন্দরভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। দুই শত বৎসর আগে দোষে-গুণে বাঙালী জাতি কি ছিল, ইহা তাহারই সুন্দর চিত্র।"[২]

আলোচ্য প্রসঙ্গের উপসংহারে আর একটি বিখ্যাত উপন্যাস সম্বন্ধে দুএক কথা বলা প্রয়োজন। উপন্যাসটি হল—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গোরা' (১৩১৬)। ১৩১৪ সালের ভাদ্র মাস থেকে ১৩১৬ সালের চৈত্র পর্যন্ত প্রবাসীতে এই উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। দেশে তখন স্বদেশী আন্দোলনের ধারা অব্যাহত, তার সঙ্গে যোগ হয়েছে সন্ত্রাসবাদ। কিন্তু এ সবের কোন প্রত্যক্ষ ছায়া পড়ে নি 'গোরা' উপন্যাসে। কারণ রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মতবাদ তখন কিছুটা বদলে গেছে। ১৩১৩ থেকেই তাঁর মধ্যে এই পরিবর্তনের সূচনা। জাতীয়তাবোধের সঙ্গে মানবিকতার দ্বন্দ্ব আর হিন্দুত্বের ওপর জাতীয়তাবোধের প্রতিষ্ঠা, সে সময়ের এই দুটি প্রধান প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথকে নতুন করে ভাবিয়ে তুলেছিল ; সেই ভাবনার ফল 'গোরা'।

১ নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের গল্পগ্রন্থগুলির মধ্যে নাম করা যায়—'অনুরাগ', 'কথাকুঞ্জ', 'কর্মভোগ', ইত্যাদি।

২ সংক্ষিপ্ত সমালোচনা, প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৫।

উত্তর-প্রসঙ্গ

শেষ কথা

বঙ্গভঙ্গ যে স্বদেশী আন্দোলনের উপলক্ষ্য এবং বঙ্গভঙ্গ রদ হলেও যে এ আন্দোলন অব্যাহত থাকবে সেদিন এ কথা অনেক নেতার মুখেই শোনা গিয়েছিল। কারণ যে আত্মচেতনায় তাঁরা উদ্বুদ্ধ হন তার আলোকে এ সত্য তাঁদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে অন্তরের নিঃস্বতাকে উপেক্ষা করে কোন জাতিই শক্তিমান হয়ে উঠতে পারে না; তাই আত্মোন্নতির এই আন্দোলনকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার সংকল্প নিয়ে সেদিন অনেকেই এগিয়ে এসেছিলেন।

কিন্তু দেশের চারিদিকে সন্ত্রাসবাদ প্রবল হয়ে ওঠায় এ আন্দোলনের গতি যে কি ভাবে স্তিমিত হয়ে আসে এবং বঙ্গভঙ্গ রদ হলে নেতাদের মধ্যে আন্দোলন সম্পর্কে যে মতভেদ দেখা দেয় সে কথা আগে বলা হয়েছে। তবু কয়েকজন নেতা এই আন্দোলনকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে যে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন ১৯১৪ সাল থেকে তারও বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথেই ভারতের রাজনৈতিক পট-পরিবর্তন সুরু হয়। অসহযোগ আন্দোলন পর্যন্ত এই পরিবর্তনের ধারাটির সামান্য পরিচয় না দিলে স্বদেশী আন্দোলনের পরিসমাপ্তির রূপটি কিছুটা অস্পষ্ট থেকে যাবে। তা ছাড়া, স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে অসহযোগ আন্দোলনের প্রকৃতিগত মিলও অনেকখানি। তাই সাহিত্য-প্রসঙ্গের বাইরে হলেও এই দুটি আন্দোলনের ঐক্যসূত্রটি নির্ণয় করার চেষ্টা ঐতিহাসিক দিক থেকে অবান্তর হবে না।

সন্ত্রাসবাদীদের শাস্তি দান এবং বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কলাপ বন্ধ করার জন্যে ইংরেজ-সরকার সেদিন যে নৃশংস দমন-নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে তাতে বিচার-বিবেচনার প্রশ্ন ছিল না। দোষী ও নির্দোষ, স্বদেশী ও সন্ত্রাসবাদীর মধ্যে ইংরেজ-সরকার সেদিন ইচ্ছে করেই কোন পার্থক্য করে নি; কারণ স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষ উন্নত হয়ে উঠলে অসুবিধা যে তাদেরই এ কথা তারা ভালো ভাবেই বুঝতো। তাই স্বদেশী আন্দোলনকে দমিয়ে দেবার জন্যে সন্ত্রাসবাদের

গন্ধ মাখিয়ে তারা নানা মিথ্যা অজুহাত সৃষ্টি করে প্রায় সকল নেতাকেই কারারুদ্ধ করল। ১৯০৮ সালের ডিসেম্বর মাসে মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, অশ্বিনীকুমার দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, সুবোধচন্দ্র মল্লিক প্রভৃতি নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়। এই দমন-নীতির ফলে এবং সুষ্ঠু পরিচালনার অভাবে স্বদেশী আন্দোলনের গতি সাংঘাতিকভাবে বিঘ্নিত হল। সন্ত্রাসবাদীদের কাজেও সাময়িকভাবে কিছুটা ছেদ পড়ল। কিন্তু ১৯১১ সাল থেকে আবার চারিদিকে নানা বিপ্লবাত্মক ঘটনা ঘটতে থাকে। ১৯১২ সালের ২৩শে ডিসেম্বর দিল্লীতে বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জকে হত্যা করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এই সময়েই মৃত্যুদণ্ডের আদেশ এড়িয়ে রাসবিহারী বসু জাপানে পালিয়ে যান। ১৯১৪ সালের মধ্যে গুপ্ত সমিতিগুলির বহু শাখা-প্রশাখা ভারতময় ছড়িয়ে পড়ে এবং ভারতের মাটিতে কিভাবে বিপ্লব-প্রচেষ্টাকে সফল করে তোলা যায় তার উপায়-চিন্তা চলতে থাকে। সুযোগ এল ১৯১৪ সালে। ইংরেজ যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ায় বিপ্লবীদের কার্যসিদ্ধির পথ কিছুটা প্রশস্ত হল। ১৯১৪ থেকে ১৯১৬ সালের মধ্যে ভারতের নানা স্থানে বহু ডাকাতি, হত্যা এবং অন্যান্য বিপ্লবাত্মক ঘটনা ঘটে। হিন্দু-মুসলমান সম্মিলিত ভাবেই এই সব ঘটনায় অংশ গ্রহণ করে। ইংরেজের শত্রুর সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভারতীয় বিপ্লবীরা এই সময়ে ভারতের বাইরেও তাঁদের কয়েকটি কর্মকেন্দ্র গড়ে তোলেন। লালা হরদয়ালের চেষ্টায় আমেরিকায় 'গদর পার্টি' এবং তারকনাথ দাসের চেষ্টায় বার্লিনে 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল পার্টি' প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া অন্যান্য স্থানেও এঁদের কর্মকেন্দ্র ছিল।

জার্মানী থেকে অস্ত্র আনিয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে পুরোপুরি একটা সামরিক অভ্যুত্থান গড়ে তোলার জন্যে এই সময়ে বাংলা দেশেও গুপ্ত-প্রচেষ্টা চলতে থাকে। যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন), নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (এম্ এন্ রায়) প্রভৃতি বিপ্লবীদের চেষ্টা বালেশ্বরে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যায়।

এই সময়ে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যেরও একটা কারণ উপস্থিত হয়। বল্‌কান ও ট্রিপলির যুদ্ধের সময় তুরস্কের সঙ্গে ইংরেজ মোটেই ভালো ব্যবহার করে নি ; তাই ভারতীয় মুসলমানরাও এ ব্যাপারে ইংরেজের ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। ফলে কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করার একটা চেষ্টা দেখা দেয়। এই চেষ্টারই পরিণতি ১৯১৬ সালের 'কংগ্রেস-মুস্‌লিম-লীগ স্কিম্'। এই মিলনের ক্ষেত্রটি তৈরি হয় প্রধানত তিনজন বিখ্যাত মুসলমান নেতার চেষ্টায়—আবুল কালাম

আজাদ, সৌকৎ আলী এবং মহম্মদ আলী। এঁরা তিন জনেই ১৯১৫ সালে কারারুদ্ধ হন। এই সময়ে এনি বেসাণ্ট্ তাঁর 'হোমরুল লীগ' প্রতিষ্ঠা করে ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনকে একটা বিশেষ রূপ দান করতে চেষ্টা করেন এবং কংগ্রেসের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনেও (১৯১৬) আবার নরম ও চরমপন্থীদের মধ্যে মিলন সাধিত হয়, যদিও এ মিলন বেশি দিন স্থায়ী হয় নি।

১৯১৭ সালের ২০শে আগষ্ট তদানীন্তন ভারত-সচিব মণ্টেগু ভারতের শাসন-ব্যবস্থায় ভারতবাসীর গুরুত্বপূর্ণ অধিকার স্বীকার করে নিয়ে এক ঘোষণা প্রচার করেন। নরমপন্থীরা এতে সন্তুষ্ট আর চবমপন্থীবা অসন্তুষ্ট হলেন। ১৯১৭ সালে কংগ্রেসের অধিবেশন হল কলকাতায়। সদ্য-কারামুক্ত এনি বেসাণ্ট্ হলেন সভানেত্রী। এতে নরমপন্থীদের সম্মতি ছিল না। এই ধরনের কয়েকটি ব্যাপার নিয়ে নরম ও চরমপন্থীদের মধ্যে আবার বিচ্ছেদ ঘনীভূত হয়ে উঠল এবং পরের বছর বোম্বাইতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে এই বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হল। ১৯১৮ সালে দিল্লীতে কংগ্রেসেব সাধারণ অধিবেশন শুধু চরমপন্থীদের নিয়েই অনুষ্ঠিত হয় এবং এতে মণ্টেগুর শাসন-সংস্কারের প্রস্তাবকে "disappointing and unnecessary" বলে উল্লেখ করা হয়।

এই বছরেই যুদ্ধের অবসান ঘটল। যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষ ইংরেজকে যেভাবে সাহায্য করে তা কল্পনাতীত। "এই সময়ে পনের লক্ষ ভারতবাসী মিত্রশক্তির পক্ষে যুদ্ধ করে ও এক লক্ষের উপর মারা যায়। নগদে ও জিনিসপত্রে হাজার কোটি টাকার উপর আমরা ভারতবাসীবা তখন বৃটিশকে দিয়েছি। এ ছাড়া প্রাচ্যে শান্তিরক্ষার জন্য যত সব আয়োজন হয় তার ব্যয়ভারের এক মোটা অংশ ভারতসরকারকে বহন করতে হয়।"[১]

যুদ্ধের সময় থেকেই ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে গান্ধীজী একটা বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন। স্বদেশী আন্দোলনেব সময় গণ-সংযোগের যে চেষ্টা সুরুতেই শেষ হয়েছিল গান্ধীজী তার প্রযোজনীয়তাকে নতুন করে উপলব্ধি করেন। বিশেষ করে চাষী ও মজুরদের অভাব-অভিযোগ নিয়ে তিনি সুরু করেন সত্যাগ্রহ আন্দোলন, প্রতিষ্ঠা করেন 'লেবর এসোসিযেশন'।

---

১ 'মুক্তির সন্ধানে ভারত'—যোগেশচন্দ্র বাগল, পৃ ৩৩৫।

ভারতে বিপ্লবাত্মক কাজ তখন প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে ; কিন্তু এই সময়েই সন্ত্রাসবাদীদের দমন করার অজুহাতে 'রৌলট্ আইন' বিধিবদ্ধ হল। এই আইনের আসল উদ্দেশ্য ছিল ভারতে রাজনৈতিক আন্দোলনের গতিবেগকে দমিয়ে দেওয়া। এর প্রতিবাদেই গান্ধীজীর নির্দেশে সুরু হল সত্যাগ্রহ আন্দোলন ও হরতাল। এই উপলক্ষ্যেই অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালা বাগে অনুষ্ঠিত হয় ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড। ফলে সারা ভারত সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়ায় চঞ্চল হয়ে উঠে। এই বছরেই (১৯১৯) 'মণ্টেগু-চেম্স্ফোর্ড শাসন-সংস্কার' বিধিবদ্ধ হয়।

যুদ্ধের পর তুরস্কের সঙ্গে ইংরেজ যে চরম অসদ্ব্যবহার করে তাতে ভারতের মুসলমানরাও দারুণ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। সুরু হয় খিলাফৎ আন্দোলন। জালিয়ানওয়ালা বাগে হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে হাণ্টার কমিটির রিপোর্টও এই সময় প্রকাশিত হয়। কমিটির ইংরেজ সভ্যরা সরকারের দোষ-ত্রুটি ঢেকে একটা সাফাই গাইবার চেষ্টা করেন এবং সরকারও তা সমর্থন করেন। ফলে নেতাদের সামনে মহা সংকট উপস্থিত হয়। যুদ্ধের সময় অনেক আশা নিয়ে তাঁরা ইংরেজকে সাহায্য করার জন্যে দেশবাসীকে প্রেরণা দেন ; তাঁদের সে আশার মিনার শুধু যে চূর্ণ হয়ে গেল তাই নয়, এই সমস্ত ঘটনার মধ্যে দিয়ে বৃটিশ-ভারতে ভারতবাসী যে কত অসহায় তা সাধারণ মানুষও মর্মে মর্মে উপলব্ধি করল। এই অবস্থার প্রতিকারকল্পে গান্ধীজী সুরু করলেন অহিংস অসহযোগ আন্দোলন। আর এর সঙ্গে খিলাফৎ আন্দোলনও মিলিত হল।

অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয় ১৯২০ সালে। গান্ধীজী চেয়েছিলেন এই আন্দোলন হবে সম্পূর্ণ অহিংস। কিন্তু তা হয় নি। কয়েক জায়গায় আন্দোলনের মধ্যে হিংসার রূপ প্রকট হয়ে ওঠে। গান্ধীজী ব্যথিত চিত্তে তা লক্ষ্য করেন এবং ১৯২২ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী চৌরিচৌরার ঘটনার পর আইন অমান্য আন্দোলন আর চালাতে দেওয়া হল না। এই সময়ে গান্ধীজীও কারারুদ্ধ হন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি নেতাদের সঙ্গে গান্ধীজীর মতের কিছুটা গরমিল থাকলেও বাংলাদেশে অসহযোগ আন্দোলনকে চালিয়ে নিয়ে যেতে তাঁরা কম সাহায্য করেন নি। গান্ধীজীর গ্রেপ্তারের পর দেশবন্ধুর নেতৃত্বকে যথাযোগ্য সম্মান জানাতেও দেশবাসী ভোলে নি। এই সঙ্গে

যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, সুভাষচন্দ্র বসু প্রভৃতি নেতাদের কথাও মনে পড়ে।

অসহযোগ আন্দোলন কতটা সার্থক হয়েছিল এখানে সে প্রশ্নের মীমাংসার অবকাশ নেই। তবে স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে এই আন্দোলনের প্রকৃতিগত মিল কতটা এবং কোন্ দিন থেকেই বা এই আন্দোলন বৈশিষ্ট্যের দাবি করতে পারে সে বিষয়ে সামান্য আলোচনা এখানে অবান্তর হবে না।

একটা কথা প্রথমেই আমাদের মনে রাখা দরকার যে গান্ধীজীর নির্দেশে এই আন্দোলনের গতি রুদ্ধ হওয়ায় এর কোন স্বাভাবিক পরিণতি আমরা দেখতে পাইনি; আর পাইনি বলেই এর সার্থকতা বা অসার্থকতার প্রকৃত বিচারও সম্ভব নয়। প্রত্যেক আন্দোলনের মধ্যেই তার নিজস্ব একটা গতিধর্ম আছে। আন্দোলন চলার সময় নানা বাহ্যিক প্রতিকূল শক্তির চাপও তার ওপর এসে পড়ে। কিন্তু আন্দোলনের গতিকে আয়ত্তের মধ্যে রেখে নেতারা তাকে একটা বিশেষ পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় গান্ধীজীর নির্দেশে নেতাদের এ চেষ্টায় সহসা ছেদ পড়ে যায়। এর জন্যে সেদিন তাঁকে কম সমালোচনা সহ্য করতে হয়নি।

মূল নীতির দিক থেকে অসহযোগ এবং আইন অমান্য আন্দোলন কোন অভিনবত্বের দাবি করতে পারে না। স্বদেশী আন্দোলনের নীতি ও আদর্শকেই যে গান্ধীজী গ্রহণ করেছিলেন এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। স্বদেশী আন্দোলনের প্রকৃতিতে নন্-ভায়লেন্স বা অহিংসাকেই বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে যা সর্বাধিক প্রাধান্য পায়। চরমপন্থী নেতাদের বক্তৃতায় এবং লেখকদের লেখায় স্বদেশী যুগে সন্ত্রাসবাদের সমর্থন পাওয়া গেলেও এবং ক্ষেত্রবিশেষে শারীরিক শক্তি প্রয়োগের নির্দেশ থাকলেও স্বদেশী আন্দোলনের প্রকৃতি যে ছিল অহিংস এ কথার যাথার্থ্যের সমর্থন তখনকার অনেক ঘটনা ও রচনার মধ্যেই পাওয়া যায়। পুলিশের হাতে প্রচণ্ড প্রহার খেয়েও মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার পুত্র চিত্তরঞ্জন সম্পূর্ণ অবিচলিত থাকে এবং শেষ পর্যন্ত বন্দেমাতরম্ ধ্বনি উচ্চারণ করে যায়; এই ঘটনার মধ্যেই অহিংসার পরাকাষ্ঠা প্রকাশ পেয়েছে। তা ছাড়া, অসহযোগ আন্দোলনের সময় সরকারী খেতাব, চাকরী, স্কুল-কলেজ, বিলাতী জিনিস প্রভৃতি বর্জন করার যে নীতি কার্যকরী করে তোলার চেষ্টা হয় সে নীতিও আসলে স্বদেশী আন্দোলনের। "বস্তুত স্বদেশী

আন্দোলনটিকে যুদ্ধোত্তর যুগের অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম মহড়া বলা যেতে পারে।"[২]

তবে গণ-সংযোগ এবং ব্যাপকতার দিক থেকে অসহযোগ আন্দোলন বৈশিষ্ট্যের দাবি করতে পারে। বাংলার বাইরেও দুএকটি প্রদেশে স্বদেশী আন্দোলন চলেছিল বটে কিন্তু তা অসহযোগ আন্দোলনের মতো ভারতব্যাপী হয়ে উঠতে পারে নি। আর স্বদেশী আন্দোলনের আগে থেকেই বাংলা দেশে গণ-সংযোগের সামান্য চেষ্টা দেখা দিলেও একটা সুপরিকল্পিত নীতি ও কর্মসূচীর অভাবে তা সফল হয় নি। পল্লীর প্যাট্রিয়টিজ্‌ম্‌ জাগিয়ে তোলার জন্যে রবীন্দ্রনাথ দেশকর্মীদের কাছে আবেদন জানালেও[৩] তা ব্যর্থ হয়েছে। কর্মাদর্শ সম্বন্ধে নেতাদের মধ্যে প্রবল মতভেদই এই ব্যর্থতার কারণ।

তবু একথা সত্য যে স্বদেশী আন্দোলন ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রকে অনেকটা গড়ে তুলেছিল, আর সেই প্রস্তুত ক্ষেত্রের ওপরেই গান্ধীজীর আবির্ভাব। রবীন্দ্রনাথের পল্লীর প্যাট্রিয়টিজ্‌মের অন্তর্নিহিত গণ-সংযোগের আদর্শের গুরুত্ব গান্ধীজী পরিষ্কার ভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন। তাই চাষী ও শ্রমিকদের নিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলে তিনি তাদেরও আন্দোলনের মধ্যে ডেকে নিয়ে আসেন। জাতীয় সংগ্রামের ক্ষেত্রে এখানেই গান্ধীজীর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব এবং অসহযোগ আন্দোলনের অভিনবত্ব। সুতরাং এই আন্দোলনই ভারতের প্রথম গণ-আন্দোলন। এ ব্যাপারে জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ডের গুরুত্বও কম নয়। আর একটা কথা; এই আন্দোলনের সময় নেতাদের মধ্যে মতবিভেদ যতই থাক তাঁরা সকলেই গান্ধীজীর নেতৃত্বকে শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে নিয়েছিলেন। অর্থাৎ স্বদেশী আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে যে সর্বজনমান্য দেশনায়কের আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন, প্রকৃতভাবে সে আসন লাভ করেন গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলনের সময়।

সুতরাং এ কথা বললে ভুল হবে না যে, ১৯১৪ সালে স্বদেশী আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটলেও মূলত এই আন্দোলনের আদর্শই অসহযোগ আন্দোলনের

২ 'স্বাধীনতার সংগ্রামে বাংলা'—নরহরি কবিরাজ, পৃ-২২০

৩ ভাণ্ডার পত্রিকায় আলোচনা দ্রষ্টব্য।

মধ্যে দিয়ে বিকশিত হয়ে ওঠে। একদিকে স্বদেশী আন্দোলন অপর দিকে অসহযোগ আন্দোলন, মধ্যে মহাযুদ্ধের মত্ততা। সে মত্ততাকে অতিক্রম করে প্রথমটির মর্মগত সত্যরূপ দ্বিতীয়টির সঙ্গে গিয়ে মিলে গেছে। এই মিলন-সাধক হলেন গান্ধীজী।

পরিশিষ্ট

স্বদেশী আন্দোলনের সময় প্রকাশিত স্বদেশী গানের বইগুলি এখন দুষ্প্রাপ্য। গানগুলিও বিস্মরণের গভীরতার মধ্যে ডুবে গেছে। তাই এখানে বিভিন্ন সংকলন-গ্রন্থ থেকে বাছাই করে বারজন গীতিকারের উনত্রিশটি এবং ময়মনসিংহ সুহৃদ-সমিতি থেকে প্রচারিত তিনটি, মোট বত্রিশটি গান সন্নিবিষ্ট হল। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের গানের সংখ্যাই সর্বাধিক। 'কবিতা ও গান'-এর মধ্যে যে কজন গীতিকারের গান সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হয়েছে এখানে সেগুলি বাদ দেওয়া হল।

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ—

বাউলের সুর

১। ঐ যে জগত জাগে স্বদেশ-অনুরাগে।
কে আর, ব্যবচ্ছিন্ন বঙ্গভিন্ন নিদ্রামগ্ন দিবা ভাগে?
ভাঙবে নাকি এ কালনিদ্রা, রইবে এ ভাব যুগে যুগে?
পেয়ে পরের প্রসাদ, যায় কি বিষাদ,
এ অবসাদ কোন্ বিয়োগে?
থাক্‌তে অঙ্গ পঙ্গু বঙ্গ দাগা বুলায় পরের দাগে,
করে গৃহশূন্য পরের জন্য লক্ষ্মীর পুত্র ভিক্ষা মাগে!
স্নিগ্ধ কর্‌তে দগ্ধ উদর, গোলামী চায় সবার আগে,
সদা গোরার দু'পায় তৈল যোগায়, তাও বাঙালীর ভাল লাগে!
আর কি কারণ জীবন-ধারণ, প্রাণ ধরে ত কুকুর ছাগে,
যদি দেশের দশা এমনি থাকে, বিলম্ব কি তনু ত্যাগে?
দেশের শিল্পে জলাঞ্জলি, ভেকের ভোজ্য যোগায় নাগে!
চলে ব্যবসা অবাদ, নইলে বিবাদ, কতই দ্রব্য দেয় সোহাগে!
পরের পদে তোষামোদে মর্মব্যথা কর্মভোগে,
বল কোন্ দেশের আর দশা এমন জীবন ধারণ যুগে যুগে!
এ বিচিত্র কর্মক্ষেত্রে আমরা অন্ধ নেত্ররোগে!
ও ভাই! আশার পথে যেতে নারি, আর সকলে চল্‌ছে বেগে!

সমুন্নত সর্বজাতি, আমরা কেবল অধোভাগে,
এবার মন্ত্রসাধন করেছি পণ ছাড়্‌ব না তা প্রাণ বিয়োগে।
প্রাণে যখন আবেগ আসে, শত্রু ভাবে "হুজুগ চাগে,"
বিশারদ কয় সেইত সময়, কার্য সার সেই সুযোগে!

বাউলের সুর

২। মাগো! যায় যেন জীবন চলে।
শুধু জগৎ-মাঝে তোমার কাজে
"বন্দেমাতরম্‌" বলে!
(আমার) যায় যেন জীবন চলে।

(যখন) মুদে নয়ন, করবো শয়ন
শমনের সেই শেষ জালে—
তখন, সবই আমার হবে আঁধার
স্থান দিও মা ঐ কোলে!
(আমার) যায় যাবে জীবন চলে।

(আমার) মান অপমান সবই সমান,
দলুক না চরণতলে।
যদি, সইতে নারি মায়ের পীড়ন,
মানুষ হব কোন্‌কালে?
(আমার) যায় যাবে জীবন চলে।

লালটুপি কি কালকোর্ত্তা,
জুজুর ভয় কি আর চলে?
(আমি) মায়ের সেবায় রইব রত,
পাশব বলে দিক্‌ জেলে।
(আমার) যায় যাবে জীবন চলে।

আমায় বেত মেরে কি "মা" ভোলাবে?
আমি কি মার সেই ছেলে?
দেখে রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি,
কে পালাবে মা ফেলে?
(আমার) যায় যাবে জীবন চলে।

আমি, ধন্য হব মায়ের জন্য
লাঞ্ছনাদি সহিলে।
ওদের, বেত্রাঘাতে, কারাগারে,
ফাঁসীকাঠে ঝুলিলে।
(আমার) যায় যাবে জীবন চলে।

যে মার কোলে নাচি, শস্যে বাঁচি,
তৃষ্ণা জুড়াই যার জলে।
বল, লাঞ্ছনার ভয় কার কোথা রয়,
সে মায়ের নাম স্মরিলে ?
(আমার) যায় যাবে জীবন চলে।

বিশারদ কয়,—বিনা কষ্টে
সুখ হবেনা ভূতলে।
সে ত, অধম হয়ে সইতে রাজী
উত্তমে চাও মুখ তুলে
(আমার) যায় যাবে জীবন চলে।

বাহার—ধামার।

৩। দণ্ড দিতে চণ্ডমুণ্ডে এস চণ্ডি ! যুগান্তরে,
পাষণ্ড প্রচণ্ড বলে অঙ্গ খণ্ড খণ্ড করে।
হুঙ্কারে আতঙ্কে মরি, শঙ্কা নাশ শুভঙ্করি !
এ ব্রহ্মাণ্ড লণ্ডভণ্ড দৈত্যপদ-দম্ভ-ভরে !
এ যুগে আবার মা গো ! দুর্গতি নাশিতে জাগো।—
এসে নিজে রক্তবীজে নাশ সেই মূর্তি ধরে।
এস মা ! ত্রিতাপহরা ! স্তম্ভিত এ বসুন্ধরা,
শুম্ভ-নিশুম্ভের দম্ভে সর্বনেত্রে অশ্রু ঝরে।
দশ দিকে হর-প্রিয়া ! দশ ভুজ প্রসারিয়া—
ভূভার হরণ কর নাশিয়া মহিষাসুরে।
আবার সে রূপ ধরি অবনীতে অবতরি—
তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলে ডাক তেমনি ভীষণ স্বরে।
শুনে ভয়ঙ্কর শব্দ ত্রিভুবন হ'ক্ স্তব্ধ,
বিশারদ ওই পদ কাতর হৃদয়ে স্মরে।

বাউলের সুর

৪। শুন্‌রে ভাই দেশের দশা কি দুর্দ্দশা
গেল রে দেশ রসাতলে।
হয়েছে দারুণ আকাল নাই কালাকাল
ফরিদপুর আর বরিশালে॥
শিশুরা দারুণ ক্ষুধায় কেঁদে লুটায়
কি খাব কি খাব বলে।
হারায়ে বুদ্ধি শুদ্ধি ইমানদ্দি
কেটেছে তার কোলের ছেলে॥
ঘরেতে নাইক মুঠি দিবে দুটি
পরিজনের মুখে তুলে।
করেছে আত্মহত্যা হায় অগত্যা
কৈলাস এক কামারের ছেলে॥
উঠেছে ঘোর হাহাকার রক্ষা নাই আর
মরবে কত দলে দলে।
ওরে ভাই যার আছে প্রাণ দাও কিছু দান
দেশের এমন বিপদ কালে॥

বাউলের সুর

৫। ভাই সব দেখ চেয়ে, বাজার ছেয়ে
আসতেছে মাল বিদেশ হ'তে।
আমাদের বেচাকেনা, পাওনা দেনা
অভাব মোচন পরের হাতে॥
আমাদের পিতল কাঁসা, ছিল খাসা
কাজ চালাতেম কলার পাতে।
এখন এনামেলে, মাথা খে'লে
কলাই করার ব্যবসাতে॥
এখানে পরশ পাথর পায়না আদর
চটা উঠ্‌ছে পেয়ালাতে।
যত ঠুনকো পলকা, দরে হালকা
দ্বিগুণ মূল্য পালটে নিতে॥
ঘরে, নাইকো আহার বেশের বাহার
যাহার তাহার ঘাটে পথে।

হায়রে নিজের দেশে যাহনা অভাব
অশন বসন সব বিলাতে।
ছেড়ে, পরের ঠাকুর ঘরের কুকুর
ইচ্ছা করে মাথায় নিতে।
বিশারদ, ছাড়তে নারে কেঁদে মরে,
কার্য সারে কোন মতে।

কালাংড়া—কাওয়ালি

(অস্থায়ী)

৬। নয়ন মুদিত মোহে ঘুমঘোরে অচেতন।
সহসা কেমনে আজি, করি আঁখি উন্মীলন॥

(অন্তরা)

অলস অবশ অঙ্গ হবে না এ মোহ ভঙ্গ—
কে যেন স্বপনে শুনি, করিতেছে আবাহন।

(সঞ্চারী)

আঁধারে আবৃত বিশ্ব, অবনী না হয় দৃশ্য
"জাগ জাগ দেখ চেয়ে"—কে বলিছে অই—

(আভোগ)

কেন মা জনমভূমি অবোধে জাগালে তুমি
ছিন্নভিন্ন কুসন্তানে কেন কর সম্ভাষণ॥

(সঞ্চারী)

স্বপনে শুনিয়া স্বর শিহরিল কলেবর
শিরায় শোণিতধারা বহিল আবার—

(আভোগ)

ঘুমের এ ঘোর হ'তে জাগাইলে যদি সুতে
শক্তি দেহ সুপ্ত দেহে কর মৃত-সঞ্জীবন॥

ললিত—যৎ

৭। এই দ্বারদেশে এসেছে ভিখারী
কহ কৃপা করি কি দিবে তাহায়।
স্বদেশ-সেবক এ সব যাচক
বঞ্চিত কোরোনা করুণা-কণায়॥

ভ্রমে ভিক্ষা করি এ সব পথিক
সামান্ত কামনা— চাহে না অধিক
ধন রত্ন আশে আসে নি সকাশে
তুষ্ট হবে তব সুমিষ্ট কথায়।
শক্তি অনুসারে পুরাইও সাধ
নাহি জুটে যেন হরিষে বিষাদ
বড় আশা ক'রে আসিয়াছে দ্বারে
করিলে হতাশ যাইবে কোথায় ?
তব দেশবাসী এ যাচকগণ
নগরে নগরে করিবে ভ্রমণ
পুরালে বাসনা বিফল হবে না
হইও সুজন সুপণে সহায়॥
চারু কারুকার্য তব পরিজ্ঞাত
স্বদেশ-সম্ভূত শিল্প কৃষিজাত
সে সব সন্ধান করিলে প্রদান
করিব প্রচার তোমারি কৃপায়॥
প্রতিবেশী শিল্পী যদি কেহ থাকে
কহ কি উপায়ে পালিবে তাহাকে
কি ধন সে জন করে উপার্জন
কিসে পারিবে সে প্রতিযোগিতায়॥
এই ভিক্ষা চাই সদনে তোমার
স্বদেশের বস্তু কর ব্যবহার
বিদেশীয় কিছু কোরোনা গ্রহণ
যদি তুল্য তার দেশে পাওয়া যায়॥
বলে বিশারদ এই ভিক্ষা দাও
কোরোনা বিমুখ মুখ তুলে চাও
স্বদেশের ধন স্বদেশে রক্ষণ
না করিলে বল কি হবে উপায়॥

ভৈরব—একতালা

৮। সেই ত রয়েছ মা তুমি।
ফল-ফুলে সুশোভিতা শ্যামা জন্মভূমি॥

শিরোপরি গিরিবর
সেই শুভ্র কলেবর
পদতলে সেই সিন্ধু
আছে অনুগামী।
তেমনি বিহঙ্গকুল
কলরবে সমাকুল
তেমনি শুনিতে পাই
মধুপ-ঝঙ্কার ;
সেই ত সকলি আছে
তবে মা সবার পাছে
তোমার সন্তান কেন,
অধঃপথগামী॥
কোথা তব সে গৌরব
সে সম্পদ কোথা সব
সকলি হয়েছে আজি
নিশার স্বপন—
ফিরিয়া আবার কি মা
আসিবে গো সে মহিমা
গাইবে তোমার কবি
তোমারে প্রণমি॥
কি জানি কি পাপফলে
পড়ি পরপদতলে
শক্তিহীন তব সুত
ধূলাতে লুটায়—
বিশারদ সে বিষাদে—
হতাশ হৃদয়ে কাঁদে
তারে আজি কে দেখালে
এ দশা দশমী॥

আশোয়ারি—ধামার
(অস্থায়ী)

৯। ছিন্নঅঙ্গ হল বঙ্গ কেন ভাব অমঙ্গল,
রাজরঙ্গে আশাভঙ্গে কেন হব হীনবল

(অন্তরা)

কি ফল বিফলে কাঁদি,
হৃদয়ে হৃদয় বাঁধি
দাঁড়ালে এ ব্যবচ্ছেদে
কি ভেদ হইবে বল।

(সঞ্চারী)

খণ্ড খণ্ড করি রাখুক এ দেশ
হউক ভূধরে সিন্ধু সন্নিবেশ,
কীর্তিনাশা জলে কিম্বা রসাতলে
সমগ্র ভূখণ্ড করুক প্রবেশ,

(আভোগ)

মিলাইতে পারি যদি মনে মন
কে খুলিবে সেই মিলন-বন্ধন ?
পরকরুণার আশায় আশায়
জীবন যাপনে ফলিবে কি ফল ?

(সঞ্চারী—ফেরতা)

বলিব বদনে—জয় জন্মভূমি
শুনিব স্বপনে—জয় জন্মভূমি
আশায় ভাষায় ভক্তি করুণায়
অন্তরের স্তরে আগ্নেয় অক্ষরে
রাখিব লিখিয়া—জয় জন্মভূমি !

কীর্তনের সুর

১০। এক দেশে থাকি, এক মাকে ডাকি
এক সুখে সুখী ছিলাম সবে।
আজি অকস্মাৎ অশনি সম্পাত !
সমান বিবাদে কাদিতে হবে।
কে করে শ্রবণ, অরণ্যে রোদন ?
কে চাহে ডুবিতে তাপিত জীবন ?
ব্যথিত-বেদন সমান রবে॥

কিন্তু ব্যবচ্ছেদে করিব না খেদ
মিলালে হৃদয় কি হবে প্রভেদ ?
মনের মিলন কে ভাঙ্গে কবে ?
রাজবলে যদি নাম ভিন্ন হয়
সে ভেদে কি আর ভাঙ্গিবে হৃদয়,
মিলে ভাই ভাই রহিব ভবে।

যোগিয়া-ভৈরবী—একতালা

১১। আসিলে কি অন্নপূর্ণা অন্নহীন দেশে ?
মা তোমার একি রঙ্গ,
যাতায়াতে ছত্রভঙ্গ
দেখা দিলে দয়াময়ী ! কেন হেন বেশে ?
অন্তরে কি ভয় পেয়ে
আছি তব মুখ চেয়ে
কাতর হৃদয়ে কাঁদি কিসের উদ্দেশে,
সে সব মনের কথা
সে সব প্রাণের ব্যথা
অন্তর-যামিনী তুমি জান সবিশেষে—
তবে মাগো কেন আজ
হেন ভয়ঙ্কর সাজ ?
ভীত চিত্তে এ আশঙ্কা সঞ্চারিলে এসে ?
শক্তিরূপা ! দেহ শক্তি
ভক্তিহীনে দাও ভক্তি
অধীর কোরো না আর শক্তি সমাবেশে ।

সংকীর্তন

১২। (বল) ভেয়ে ভেয়ে মিলবে কবে ?
শুধু বিবাদে কি কাল কাটাবে ?
এক রাজার যে সবাই প্রজা
দণ্ডবিধি সবাই সবে।
[বিধি ভিন্ন নয়—বিধি সবার সমান]।

সবার সমান স্বত্ব সমান স্বার্থ
জেনেও মত্ত ভিন্নভাবে ॥ (ওরে ওরে ও ভাই)
ভিন্ন জনের ভিন্ন রুচি,
এ কথা কয় সব মানবে।
[এত সবাই বুঝে, সবাই জানে]।

ও সেই ভিন্নরে অভিন্ন কোরে
মিলায় যে সেই মানুষ ভবে ॥ (ওরে ওরে ও ভাই)
ভিন্ন ধর্মী ভিন্ন কর্মী
সবাই সমান প্রজা-ভাবে।
[রাজার কাছে নাই ত প্রভেদ]।

শিখ স্বদেশ-ভক্তি অনুরক্তি
সমান শক্তি সবাই পাবে ॥ (ওরে ওরে ও ভাই)
মিলন হলে জন্মভূমির
এ দশা আর কদিন রবে ?
[যদি সবার মনে ঐক্য থাকে]।

রাখে, মত্ত করী বদ্ধ করি
তৃণের মিলে দেখ ভেবে ॥ (ওরে ও ভাই)
মিলনে বিলম্ব হলে
কুফল ফলবে দেখ্‌তে পাবে।
[বিলম্বে হয় কার্য হানি]।
জেনো—আবাদ নইলে সোনার জমি
কাঁটায় কাটায় ভরে যাবে ॥ (ওরে)
অন্ন বিনা শীর্ণ তনু
কেবল তোদের মিল অভাবে।
[ও তাই নিত্য অভাব নিত্য দুঃখ]।
এখন অন্নশূন্য হিন্দুস্থান এই
পূর্ণ যে "হা অন্ন" রবে ॥ (ওরে)
অত্যাচারে নাইকো বিচার
করের ভারে কাতর সবে।
[করভার কি আর সওয়া যায়]।
ও ভাই, হবে কি আর এর প্রতিকার
এ সব যদি সও নীরবে ? (ওরে)

নিজে না মিলিলে কিরে
　　দুখের কথা পরে কবে ?
　　　　[পর কি জানে পরের বেদন]।
মিল্‌লে—যাবে কষ্ট, বিপদ নষ্ট
　　ন্যায়ের রাজ্যে হবেই হবে। (ওরে)
দ্বন্দ্বে বাড়ে নিরানন্দ
　　জেনে কেন ভুলচো তবে ?
　　　　[ঘরে ঘরে বিবাদ কেন] ?
ও ভাই—কয় বিশারদ যাবে বিপদ,
　　ভিন্ন ভাবটি ভুলবে যবে। (ওরে)

ভীমপলশ্রী—একতালা

১৩।

জাগো জাগো বরিশাল
তোমার সম্মুখে আজি পরীক্ষা বিশাল॥
　　প্রাণ দিয়ে হুতাশনে
　　দেখাও জগৎজনে
বিশুদ্ধ কনক-কান্তি—সৌর করজাল।
　　বিশুদ্ধি কালিমা কত
　　হবে এবে পরীক্ষিত
আজি পরীক্ষার দিনে ঘুচাও জঞ্জাল।
　　দেখিব তোমার শক্তি
　　দেশভক্তি অনুরক্তি
দেখিব গৌরব তব রবে কতকাল।
　　বুঝিব দেশের তরে
　　কতটা রুধির ঝরে
মনুষ্যত্বে বরিশাল হবে কি কাঙ্গাল ?
　　নিরখি আরক্ত নেত্র
　　প্রহরীর করে বেত্র
হারাবে প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গে ইহ-পরকাল ?
　　ভুলিওনা কোন ভয়ে
　　থাকিও যাতনা স'য়ে
ঝুলুক বঙ্গের শিরে খর করবাল।

জন্মে মৃত্যু অনিবার্য
মানুষ করিবে কার্য
ভয়ে ভঙ্গ দেয় শুধু—নীচ ফেরুপাল।

পূরবী—আড়াঠেকা
(অস্থায়ী)

১৪। হতাশ হয়োনা প্রাণে অনুচিত নির্যাতনে।
সাহসে হৃদয় বাঁধ কি শঙ্কা নির্দোষ মনে ?
(অন্তরা)
গুর্খা দেখে মূর্খ যত
কি আতঙ্কে অভিভূত
উচ্চশির অবনত
এত শঙ্কা কি কারণে ?
(সঞ্চারী)
যার অঙ্কে জন্ম নিলে
যার শস্যে যার জলে
রবিশশী করজালে
ধরেছ শরীর—
(আভোগ)
তারি ধন তারে দিতে
তারি তরে কষ্ট পেতে
মাটীতে মাটীর দেহ
এত শঙ্কা সমর্পণে ?
(পুনঃ সঞ্চারী)
স্বর্গাদপি গরীয়সী
মুখে বল ঘরে বসি
ভয়ে ম্লান মুখশশী—
দেখিলে বিপদ।
(পুনরাভোগ)
একদিন মৃত্যু হবে,
নিত্য ভবে নাহি রবে—
কাঁপে বক্ষঃ কেন তবে
মাতৃ-নাম সম্বোধনে ?

১৫। ভেইয়া দেশ্‌কা এ কেয়া হাল্‌।
থাক্‌ মিট্টী জৌহর্‌ হোতী সব্‌, জৌহর্‌ হ্যায়্‌ জঞ্জাল্‌।
ঘর ছোড়্‌কে সব্‌ পর্‌কো সেবে, ভাইকো দেৎ ভাগাই।
সাগর্‌ পার সব্‌ ধন্‌ গয়া, আউর্‌ ঘর্‌মে লছমী নাই।
পীতল কাঁসা রহে ক্যায়্‌সা, সোনা চান্দী শেষ্‌।
অব্‌ ইনামেল্‌ গিল্‌টী শীসা, ঘর্‌ ঘর্‌মে প্রবেশ্‌।
পাট্‌ রুই সব্‌ এহী সে জাকর্‌ জাহাজ ভর্‌কে আতে।
দেশ্‌কে আদ্‌মী মূরখ্‌ বন্‌কর্‌, চান্দী দেকর্‌ লেতে।
গৌ শূয়র্‌কে লহুসে শোধিত্‌, চিনি নিমক্‌ খাওয়ে।
সফেদী দেখ্‌কর্‌ মন লল্‌চাতা, হাথ্‌মে মোক্ষ পাওয়ে।
গোশালামে গাওয়ে কিৎনী, কিসীকো এহ ন সুঝে।
টীন্‌ ভরে জো দুধ্‌ বিলাতী উস্‌কো মিঠা বুঝে।
দেশ্‌কে ধন্‌ সব্‌ চৌপট্‌ কর্‌কে, লেতা পর্‌দেশিয়া!
এহাঁকে লোগ সব্‌ ফকির্‌ বন্‌ যায় ন পাওয়ে রূপৈয়া।
বণারসী আউব্‌ শাল্‌ দোশালা, রেশম্‌ পশম্‌ ছোড়ী।
ছীট্‌ পাট্‌ নকলী মখ্‌মল্‌, গোটা মোল্‌হী দেকর্‌ কৌড়ী।
গৌ শূয়রকী চব্বী দেকব্‌, জো বনাইল্‌ বাস।
পেহনে ওহী ভারতবাসী ধরম্‌ কব্‌কে নাশ্‌।
পুণ্যস্থান্‌ এহী আর্যাবর্তমে নহি মিলে কোই চীজ্‌।
আদ্‌মী বাউরা মূরখ্‌ হোকে ছোড়্‌ দিয়া তজ্‌বীজ্‌।
আঁখ্‌কে আগে সবী পড়া হ্যায়্‌ কোই ন পাওয়ে রুখা।
ঘর্‌কী লছমী পর্‌কো দেকর্‌ সব্‌ কোই রহেঁ ভূখা।
দীন্‌ বিশারদ্‌ গণই বিপদ্‌, ভনো দুঃখকো গীত্‌।
হো মতিমান্‌ দেশ্‌কে সন্তান্‌, করো স্বদেশহিত।

স্তোত্র

১৬। জয় জগদীশ হরে, জয় জগদীশ হরে।
মীনরূপ ধরি হরি অবনীতে অবতরি
প্রলয় পয়োধি জলে বেদ ব্রহ্ম উদ্ধারিলে,
বিষম বিদেশী-স্রোতে কে আজি উদ্ধার করে?
জয় জগদীশ হরে॥

এ বিশ্বে বিষম বৃষ্টি ডুবিল যখন সৃষ্টি
সঙ্কটে কমঠ হয়ে ও পিঠে ধরণী লয়ে
রেখেছিলে, রাখ আজি বিদেশী তরঙ্গভরে ॥
জয় জগদীশ হরে।

বরাহ আকার ধরি ভীষণ দশনোপরি
রেখেছিলে এই ভূমি সে যুগে যেমন তুমি
তেমনি ভারতে রাখ দেখা দিয়ে যুগান্তরে ॥
জয় জগদীশ হরে।

অথবা নৃসিংহরূপে হিরণ্যকশিপু ভূপে
ভয়ঙ্কর বেশে নাশি ভীম মূর্তি পরকাশি
যে ভাবে বাঁচালে বিশ্ব, এস সেই মূর্তি ধরে ॥
জয় জগদীশ হরে।

দেশান্তর হতে পণ্য হরিছে দেশের অন্ন,
ভিখারী বামন হয়ে ত্রিপদে ত্রিলোক ছেয়ে
ত্রেতায় রেখেছ অন্ন, সে অন্ন কে আজি হরে' ॥
জয় জগদীশ হরে।

বলদৃপ্ত ক্ষত্র সবে কোদণ্ড টঙ্কার রবে
হয়ে নিজে ভৃগুসুত করেছিলে পরাভূত,
পশু-বলদৃপ্ত-দলে নাশ পশু-শক্তি-হরে ॥
জয় জগদীশ হরে।

কোথা নব দুর্বাদল তনুরুচি সুকোমল
রাক্ষসের অত্যাচার বাড়িয়াছে পুনর্বার
বিনা সে শ্রীরামচন্দ্র কে নাশে রাক্ষসাদিরে ॥
জয় জগদীশ হরে।

দ্বাপরে কর্ষণ তরে করুণা বর্ষণ করে
যে রূপে দর্শন দিলে সেরূপে এস ভূতলে
অন্ন দিতে অন্নহীনে তাই ডাকি হলধরে
জয় জগদীশ হরে।

যেরূপ ধরিয়া হরি জগতের হিংসা হরি'
বুদ্ধ নামে খ্যাত ছিলে সেইরূপে দেখা দিলে
দুর্বল-দলন যাবে প্রবলের পদভরে।
জয় জগদীশ হরে।

কলিযুগে কল্কি হয়ে ত্রাহি দেব ম্লেচ্ছভয়ে
দুর্বলের বল তুমি এ তোমারই লীলাভূমি
দেখা দিবে বিশারদে, আর কত কাল পরে?
জয় জগদীশ হরে।

কামিনীকুমার ভট্টাচার্য—

ভৈরবী—মিশ্রঠুংরি

১৭। সোনার স্বপন-মোহে ভুলিও না ভাই! সাধনা।
এ যে আলেয়ার আলো, মায়া-মরীচিকা, আশ্বাস-ঢাকা ছলনা।
ওদের রুদ্ধ দুয়ারে করি' করাঘাত, পেয়েছ কবে বেদনা;
ওরা বুঝিল কি তব ধর্ম-কাহিনী, বুঝিল কি তব যাতনা?
ওরা ঘৃণা করে মোদের বর্ণ, মোদের আহ্বানে বধির কর্ণ;
তুচ্ছ ফুৎকারে দেয় ভেঙে চুরে, সকল সঞ্চিত কামনা।
না করিলে পান মোদের শোণিত, হয় ওদের চিত্ত ক্ষুব্ধ;
তাই ভুলাইতে চায় মাতৃমন্ত্র, করি আকাশ-কুসুমে লুব্ধ!
ওরা মোদের দৈন্যে করি পরিহাস, কেড়ে নিতে চায় মুখের গ্রাস;
তবু যুক্তকরে ওদের দুয়ারে কেন নিত্য নিস্ফল যাচনা?
এখন আপনার পানে ফিরাও নয়ন, জাগাও আপন শক্তি;
পরের চরণ না করি লেহন, কর আপনার মায়ে ভক্তি।
তবে জাগিবে নবীন রঙ্গে, নবজীবন নববঙ্গে;
বিশ্ব কাঁপায়ে উঠিবে বাজিয়া রুদ্র বিজয়-বাজনা?

জামালপুরে লাঞ্ছিত রমণীদের প্রতি

অহং—একতালা

১৮। আপনার মান রাখিতে জননী আপনি কৃপাণ ধর গো!
পরিহরি' চারু কনকভূষণ, গৈরিক বসন পর গো!

আমরা তোদের কোটী কুসন্তান গিয়াছি ভুলিয়া আত্ম-অভিমান,
করে সব পিশাচে তোদের অপমান, তাও নেহারি' নীরবে সহি গো!
তবু কি গো তোরা আমাদের পানে রহিবি চাহিয়া করুণ নয়নে,
আপনি ছিঁড়িয়া আপন বন্ধনে, আপনার লাজ হর গো।
এলাইয়ে দাও কুটিল কুন্তল, জ্বাল মা! হৃদয়ে প্রতিহিংসানল,
নয়নের কোণে লুকায়ে গরল, মরণে বরণ করিয়া লও;
ঐ শোন বাজে বিধাতার ভেরী, বাঁধ কটীতটে সুশাণিত ছুরী,
দানবদলনী সাজ গো জননী! বাঙালিনী বেশ ছাড় গো!
তোদের তপ্ত শোণিত-পরশে, পিশাচ-পীড়িত ভারতবরষে
জাগুক্ আবার যত কুলাঙ্গার আজিও সুখে ঘুমায়ে রয়।
শুনিয়া তোদের ভৈরব-হুঙ্কার, নিখিল চমকি' উঠুক্ আবার,
বিমল পুণ্যে মোদের দৈন্যে কর মা! ধৌত কর গো!

বিপিনচন্দ্র পাল—

মুলতান—একতালা

১৯। আর সহে না, সহে না, জননী, এ যাতনা আর সহে না;
আর নিশিদিন হয়ে শক্তিহীন পড়ে থাকি, প্রাণে চাহে না।
তুমি মা অভয়া জননী যাহার, কি ভয় কি ভয় এ ভবে তাহার,
দানব-দলনী ত্রিদিব-পালিনী, করাল-কৃপাণী তুমি মা;—
উর মা! আজিকে সে-রূপে পরানে, ডাকি মা কালিকে! ডাকি গো সঘনে,
নয়নে অশনি জাগাও জননী! নহিলে এ ভয় যাবে না।
উর মা বাহুতে, শকতিরূপিনী, উর মা হৃদয়ে ও রণরঙ্গিনী!
রিপুকুল মাঝে, সন্তান ল'য়ে দাঁড়া মা হৃদয়-রমা;—
প্রলয়-হুঙ্কারে, হর-হৃদি হতে উঠিয়ে দাঁড়া মা এ ভারত মাঝে;
শোণিত-তরঙ্গে, মাতি' রণরঙ্গে, মাভৈঃ বাণী আজ শোনা মা!
নৃমুণ্ডমালিনী, তুই মা কল্যাণী, তুই শিবে শিবমনোমোহিনী!
বিনা তোর কৃপা, বিনা তোর কৃপাণ, এ ভারত-বন্ধন ঘুচে না।

মনোমোহন চক্রবর্তী—

বাউলের সুর

২০।

ছেড়ে দাও কাচের চুড়ী বঙ্গনারী,
কভু হাতে আর প'রো না।
জাগ গো ও ভগিনী, ও জননি!
মোহের ঘোরে আর থেকো না!
কাচের মায়াতে ভুলে, শঙ্খ ফেলে,
কলঙ্ক হাতে মেখ না!
তোমরা যে গৃহলক্ষ্মী, ধর্মসাক্ষী,
জগৎ ভরে' আছে জানা;
চটকদার কাচের বালা, ফুকের মালা,
তোমাদের অঙ্গে সাজে না!
নাই-বা থাক্ মনের মতন স্বর্ণভূষণ,
তাতে যে দুঃখ দেখি না;
সিঁথি-সিন্দূর ধরি', বঙ্গনারী
জগতে সতী-শোভনা!
বলিতে লজ্জা করে, প্রাণ বিদরে,
বার লাখের কম হবে না;
পুঁতি কাচ ঝুটা মুক্তায়, এই বাংলায়—
দেয় বিদেশে, কেউ জানে না।
ঐ শোন বঙ্গমাতা, শুধান কথা,—
"উঠ আমার যত কন্যা!
তোরা সব করিলে পণ, মায়ের এ ধন,
বিদেশে উড়ে যাবে না।
আমি যে অভাগিনী, কাঙ্গালিনী,
দুই বেলা অন্ন জোটে না;
কি ছিলাম, কি হইলাম, কোথায় এলাম?
মা যে তোরা ভাবিলি না!"

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়—

২১। এতদিন পরে, জননীরে যবে আজিকে পড়েছে মনে,
মায়ের সন্তান কেউ কোথা আর থাকিস্‌নে নিরজনে।
সবে মিলে তোরা কর্‌ আয়োজন,
—মাতৃপূজার বসা রে বোধন,
দুঃখ দৈন্য ক্লেশ মলিনতা দূর কর্‌ প্রাণপণে,
বেলা গেল বয়ে, মিছে কাজ লয়ে থাকিস্‌নে নিরজনে।
ওই শোন্‌ ওই মায়ের অভাব,
বস্ত্র নাহিক ঘরে,
অন্ন বিহনে শীর্ণ যে তনু
রত্ন হরেছে পরে,
কোটী পুত্র তোরা আছিস্‌, সবাই পেয়েছিস্‌ নবপ্রাণ,
এখন সকলে বল্‌ রে তোরা, কি করিবি মাকে দান?
কি দিয়ে তাঁহার করিবি সজ্জা,
কেমনে হরিবি দীনতা লজ্জা,
সব ত দিচিস্‌ পরকরতলে, কেমনে রাখিবি মান?
এখন সকলে বল্‌ রে তোরা, কি করিবি মাকে দান?

বিদেশী বণিক শতবর্ষ ধরে
যে ধন লয়েছে হরে,
পারিবি কি তাহা কাড়িয়া আনিতে, পারিবি কি দিতে প্রাণ?
পারিবি কি তোরা ঘুচাতে দুঃখ, মায়ের মুখটি ম্লান?
সবে মিলে তবে কর্‌ আয়োজন,
মাতৃপূজার বসা রে বোধন,
একপ্রাণ হয়ে মনে বল লয়ে হয়ে সব আগুয়ান,
হাসিমুখে তোরা অকাতরে কর লক্ষটি শির দান।
থাকুক শিয়রে শাণিত কৃপাণ
লক্ষ ঝঞ্ঝাবাত,
মরণের ভয় শত বিভীষিকা
করিস্‌নে দৃক্‌পাত,
নবীন সাহসে হাতে তুলে ধর্‌ মাতৃজয়-নিশান
বিশ্বসমাজে পরিচয় দে রে তোরা কার সন্তান।

ওই দেখ্ ওই জননী তোদের
কাতর মলিন ক্ষীণা,
দ্বারে দ্বারে ফেরে ভিখারিনী মত
অন্ন-বস্ত্র-হীনা।
শতকোটী তোরা পুত্র যে তাঁর পেয়েছিস্ নবপ্রাণ,
আর কেন বল্ নীরবে শুনিবি মাতৃ-দৈন্ত গান ?

২২

আমি মরণ আজিকে বরণ করিব,
শরণ তবু না চাই,
আমি নয়ন আজিকে দমন করেছি
অশ্রু তাহাতে নাই,
শত বেদনা আমার কামনা আজিকে
লাঞ্ছনা সুখে বহিব,
শরণ কভু না মাগিব !
আজি মঙ্গল নহে সম্বল মোর
সহায় চাহিনা দৈব,
বিপদ বরেছি সম্পদ ফেলি
অশনি মাথায় লইব ;
বৃশ্চিক শত দংশনে রত
যন্ত্রণা তাহে নাই,
বজ্র ধরিতে চাই !
আজি বিশ্বে কারেও করিনাক ভয়
ভয়েরে করেছি জয়,
শাসন-বাঁধন কিছুই মানি না
ঝঞ্ঝা প্রলয় লয় ;
শয়ন শিয়রে কৃপাণ ঝুলিয়ে
মরণ নিঃসংশয়,
কারেও করিনা ভয়।

স্বর্ণকুমারী দেবী—

সুখরাই কানেড়া—ঝাঁপতাল

২৩। শতকণ্ঠে কর গান জননীর পূত নাম,
মায়ের রাখিব মান—লয়েছি এ মহাব্রত।

আর না করিব ভিক্ষা, স্বনির্ভর এই শিক্ষা,
এই মন্ত্র, এই দীক্ষা, এই জপ অবিরত।
সাক্ষী তুমি মহাশূন্য, না লব বিদেশী পণ্য,
ঘুচাব মায়ের দৈন্য,—করিলাম এ শপথ।
পরি ছিন্ন দেশী সাজ, মানি ধন্য ধন্য আজ,
মায়ের দীনতা লাজ হবে দূর-পরাহত।
এই আমাদের ধর্ম, এই জীবনের কর্ম,
এই অস্ত্র, এই বর্ম আমাদের মুক্তি-পথ।
নমোনম বঙ্গভূমি, মোদের জননী তুমি,
তোমার চরণে নমি নরনারী মোরা যত।

বিজয়চন্দ্র মজুমদার—

বিভাস—কাওয়ালী

২৪। যাব না, আর যাব না ভিক্ষা নিতে পরের দো'রে ;
আছে যা অশন-বসন, তাই খাব, তাই থাক্‌ব প'রে।
স্তন্যদুগ্ধ-ধারা তোমার ব্রহ্মপুত্র গঙ্গানদী
ওরই মিষ্ট রসে পুষ্ট মোদের তনু নিরবধি ;
(সেই) সুধা ফেলে ক্ষুধায় মরি প'ড়ে মিছে ধাঁধার ঘোরে।
দাও গো গাছের বাকল তুলে, তাই পরিব হাসিমুখে,
মোরা দুঃখী মোরা সুখী ও মা! তোমার দুখে সুখে।
পরের বসন প'রে এখন লাজ ঢাকিতে লজ্জা করে।
তোমার ভাঁড়ার শূন্য নহে, অন্নপূর্ণা বিশ্বরমা!
(তবু) ঝুলি কাঁধে বেড়াই কেঁদে, জাত্ত গেল—পেট ভরিল না।
মান বাঁচাতে মনের ভুলে অপমানে যাচ্ছি মরে।

প্রমথনাথ দত্ত—

ভূপালী—মিশ্র দাদ্‌রা

২৫। আমরা যা করছি তা করবোই করবো।
আমরা যা বলছি তা বলবোই বলবো।
থাক-না কেন কাঁটাতরু
গিরিগহ্বর, গহন মরু,
যে পথে চলছি আমরা চলবোই চলবো।

যাই বল আর যাই কর,
লাঠিই মার আর অসিই ধর,
মায়ের পীড়ন বুক পেতে আমরা ধরবোই ধরবো।
ছিন্নই কর ভিন্নই কর,
আট কোটী ভাই হবই জড়,
ঝঞ্ঝা তুফান সকলই আমরা তরবোই তরবো।

যতীন্দ্রমোহন বাগচী-

বাউল

২৬। ওরে ক্ষ্যাপা, যদি প্রাণ দিতে চাস্,
এই বেলা তুই দিয়ে দেনা!
ওরে, মানের তরে প্রাণটি দিবার,
এমন সুযোগ আর হবে না।
যখন দু'দিন আগে, দু'দিন পরে,
তফাৎ মাত্র এই;—
তখন অমূল্য এই মানব-জনম
বৃথা দিতে নেই,—
ওরে ক্ষ্যাপা!
মায়ের দেওয়া এ ছার জীবন
দেরে মায়ের তরে;
অমর জীবন পাবি রে ভাই!
জগৎ-মায়ের ঘরে।
কি দিয়েছিস্, লিখবে যখন
পরকালের খাতা,—
(তখন) তোরই দানে হবে আলো
বইয়ের প্রথম পাতা,—
ওরে ক্ষ্যাপা!

শশিকান্ত—

সারি গান।

২৭। জাগ ভারতবাসী রে, কত ঘুমে রবে রে!
বল সবে হ'য়ে এক মন, "বন্দেমাতরম্"।
ভাইরে ভাই! জননী আর জন্মভূমি স্বর্গ হ'তে শ্রেষ্ঠ মানি রে!

এ দু'য়ে ভক্তি নাই যার, নরকে নিবাস তার,
পুরাণে লিখেছেন মুনিগণ।
ভাইরে ভাই! ভারতের ভাগ্যদোষে—ফিরিঙ্গি আইল দেশে রে,
অসার খোসা ভুষি দিয়ে দেশে ধন নিল লুটিয়ে,
অন্নাভাবে মরে প্রজাগণ।
ভাইরে ভাই, হিন্দু আর মুসলমান, এক মায়ের দুইটি সন্তান রে!
একত্র হ'য়ে সবে, মাতৃপূজা কর ভবে, ধন্য হবে মানব-জীবন।
ভাইরে ভাই, ভারতের সুসন্তান! কর সবে অবধান রে!
বিলাতী লবণ, বিলাতী চিনি, অপবিত্র শাস্ত্রে শুনি,
ছুঁইও না ভাই! চিনি আর লবণ। (বন্দেমাতরম্)
ভাইরে ভাই! একটি সুপুত্র হ'লে মা সুখী হন ভূমণ্ডলে রে!
ত্রিশ কোটি সন্তান যাঁর, আজি কি দুর্দশা তাঁর,
দেখ সবে মেলিয়ে নয়ন।
ভাইরে ভাই! কামার, কুমার, জোলা তাঁতী
হায় হায় করে দিবারাতি রে!
ইংরেজী শিক্ষার গুণে, সকলে বিলাতী কিনে,
কি খাইযা রাখিবে জীবন।
ভাইরে ভাই! মেড়ারে মারিলে ঢুব,
সেও ফিরে করে রোষ রে!
আমরা এমন জাতি, খাইয়া ফিরিঙ্গির লাথি,
ধূলা ঝাড়ি' চলে যাই ভবনে!
ভাইরে ভাই! দ্বিজ শশিকান্তে কয়, জাগ সবে এ সময় রে!
পূজিতে মায়ের চরণ, না করিলে প্রাণপণ
কাজ কি রেখে এ ছার জীবন? (বন্দেমাতরম্)।

মুকুন্দ দাস—

টোরি—ঝুলন

২৮। বাবু, বুঝবে কি আর ম'লে?
কাঁধে তোর ভূত চেপেছে একদম্ দফা সাবলে!
খেতে ভাত সোনার থালে,
নাউ সেটিস্‌ফাইড্ টীনের থালে,
তোমার মত মূর্খ কি আর দ্বিতীয়টি মিলে?

পমেটম্ লাইক করিলি দেশী আতর ফেলে,
সাধে কি দেয় রে গালি "ব্রুট্, নন্‌সেন্স, কুলিস্" বলে !
ছিল ধান গোলাভরা,
ইন্দুরে সব কর্‌লে সারা,
চোখের ঐ চশমা জোড়া দেখ্‌না বাবু খুলে !
কুল নিয়েছে, মান নিয়েছে, ধন নিতেছে কলে,
ডু ইউ নো ডিপুটি-বাবু, নাউ হেড-ফিরিঙ্গীর বুটের তলে ?
পাগলের কথা ধর,
এখনো সাম্‌লে চল,
সাহেবী চালটি ছাড়,
যদি সুখ-ইচ্ছা কপালে।
বল মাতরম্ বাজাও ডঙ্কা
জাগুক্ ভাই সকলে,
দেখে মুকুন্দ ডুবে যাক্ রে ভাই
প্রেমময়ীর প্রেম-সলিলে।

'করালী'—

২৯। আছিস্ কোন্ উল্লাসে ?
সদাই বিদেশী জোঁক রক্ত চোষে।
জলে গেলে জলের জোঁকে
ধরে জীবের আশে পাশে ;
এ যে এম্‌নি নচ্ছার জোঁক
জলে স্থলে ধরল ঠেসে।
জোঁকের ভয়ে হ'লি পোকা,
জন্ম নিয়ে বীর-ঔরসে ;
তোদের কাণ্ড হেরি' জগত জুড়ি,
হো হো রবে সবাই হাসে।
অস্থিচর্ম হল রে সার,
রক্ত নাহি রক্তকোষে ;
এখন বাঁচ্‌তে চেলে ফেল্ সে জোঁক
বয়কট্ চূণা মুখে ঘ'সে।
খেতে নাই ঘরে অন্ন,
শুইতে বাঞ্ছা তক্তপোষে ;

তোরা ধনেপ্রাণে গেলি মারা
বিলাসের চুলকনি দোষে।
কল্লালীর পদাবলী
উড়াইও না উপহাসে,
দেখ্‌ছ না, সোনার ভারত হচ্ছে শ্মশান
দুষ্ট জোঁকের শ্বাস-প্রশ্বাসে।

ময়মনসিংহ সুহৃদ-সমিতি—

বাউলের সুর

৩০। পেটের খিদায় হইলে গো মইলাম, উপায় কি করি ?
ওরে, কি দারুণ আকাল পইড়াছে রে, ধান টাকায় হইল দুই পসুরী।
আড়াই কুড়ি টাকা গো দেনা, কর্জ্জহাওলাদ পাওয়া যায় না,
মহাজনে কুরুক দিছে জমী আর বাড়ী,
আবার চৌকিদারী টেক্স গো নিল, থালি লোটা নিলাম করি'।
পাটের টাকায় দিলাম কিনা বিবিরে জার্মানীর গয়না,
বিলাতী ফুকা মতির দানা, আর হাওয়ার চুড়ি।
ওরে, জার্মানীর গয়না কেউ বন্ধক নেয় না রে,—
ভাই রে! ভাইঙ্গা গেছে ঠুইন্‌কা চুড়ি।
মনের দুস্কু কইবো রে কারে, ছাইলা মাইয়া কাইন্দা গো মরে,
পরিবার, হায়, ভাত বেগরে হইছে পাটখড়ি ;
হায় রে, ছাতি ফাইটা যায় রে দেইখা,
ওরে আমি কেন না মরি !
মোমিন বলে, করি গো মানা, ভাতের দুস্কু আর রবে না,
বিলাতী চিজ্‌ কিন্‌বো না আর—কও কসম্‌ করি'।
তবে দেশের টাকা রইবো রে দেশে,
লক্ষ্মী ঘরে আস্‌বে রে ফিরি।

বাউলের সুর

৩১। কিবা হইল ওগো নানি !
বড় আশা দিছিল লাট্‌বাহাদুর কৈরা মেহেরবাণী।
দারগ্‌-গিরি চাকরী দিবে, সাথে বইসা খানা খাইবে,
ওরে * * সাদি দিবে, আমি দেহামু কেরদানী।

হজুরেতে আর্জ্জি দিলাম, দারগ-গিরি না পাইলাম,
ওরে, এত আশা কইরা শেষে, নছিবে হান্‌কী-ধোয়া পানি!
মোমিন বলে,—শোন মিঞা ভাই, হিন্দুর সাথে মিল রে সবাই,
ওরে ঘর-ভাঙ্গাইনা দুস্মন ওরা রে,
ভাই রে! রাইখো ওদের চিনি।
ওদের খালি কথায়ই ফাঁকি,
ওদের চিনাও ভাইরে চিন্‌লা নাকি,
ওরা, বৈরা দিয়া বৈরা মারে, কৈরা চালাকি;
ওরে—মিঞা মশয়, আমরা দুই ভাই,
দেলে খাঁটী রাইখো জানি।

খাম্বাজ—কাহারবা

রাম রহিম না জুদা কর (ভাই) মনটা খাঁটী রাখ জী;
দেশের কথা ভাব ভাই রে! দেশ আমাদের মাতাজী।
হিন্দুমুসলমান, এক মার সন্তান, তফাৎ কেন কর জী।
দুই ভাইয়ে, দু'ঘর বেঁধে একই দেশে বসতি।
কাপড়, জুতা, লবণ, চিনি, ছুরী, কাঁচি বিলাতী।
(মোদের) ভাইরা সকল পায় না খেতে, জোলা, কামার, আর তাঁতী।
টাকায় ছিল মনেক চাল ভাই! এখন বিকায় পসুরী।
এর পরে ভাই, হতে বাকি গাছের তলে বসতি।
দেশের দিকে চাও ফিরে, (ভাই) দেশ লুটিছে বিদেশী।
মোদের টাকা নিয়ে দেয় রে চাবুক, চাপড়, কীল, ঘুঁসি।

নির্ঘণ্ট

যে পৃষ্ঠা-সংখ্যার সঙ্গে তারকা-চিহ্ন (*) ব্যবহৃত হয়েছে সেই পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।